দিলীপকুমার রায়

সম্পাদক
সুধীর চক্রবর্তী

পরিবেশক
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সূচি

প্রস্তাবনা

দিলীপকুমার রায়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর বহুদর্শী বহুভ্রামণিক জীবন আর নানাচারী প্রতিভা সম্পর্কে বাঙ্গালির দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্য নিয়ে প্রস্তুত সংকলন পরিকল্পিত। তাঁর মতো স্বতোচ্ছল চরিত্র ও বিচিত্র অভীপ্সাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব সব দেশেই দুর্লভ। তবে দিলীপকুমারের দীর্ঘ সময়ের প্রবাসজীবন তাঁকে বঙ্গীয় সমাজ-সংস্কৃতির মূলস্রোত থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। দিলীপকুমারের বর্ণময় যাপনকে আশ্রমবাসিক ভক্তিযোগ অনেকের চোখে বৈরাগ্যবিধুর করে দিয়েছে। ফলে তাঁর জীবনব্যাপী সবরকমের কৃতি ও কৃতিত্বকে ছাপিয়ে আমরা মনে রেখেছি বড়জোর গায়ক দিলীপকুমারকে, সে-ও অতি শীর্ণ অর্থে। এই বিদ্বান, বহুভাষাবিদ্, সন্ধিৎসু লেখকের অজস্র বইয়ের খুব সামান্যই এখন প্রাপ্তব্য। দেশব্যাপী নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ পালনের সমারোহময় উৎসবের পাশে তাঁর সহপাঠী ও একদিনের অগ্রজ (জন্ম ২২ জানুয়ারী, ১৮৯৬) দিলীপকুমারের স্মৃতি-বিস্মৃতির মন্দভাগ্য আমাদের আজ ব্যথিতও করে না। এ দেশের অতিসতর্ক প্রচার মাধ্যমগুলির লক্ষ্য এবং সংবাদপত্রগুলির ঝোঁক অধুনা অন্তর্তদন্তের ছলে অসৎ ও পঙ্কিল ভারতবর্ষের যে-উন্মোচনে সদা সচেষ্ট তার পাশে দিলীপকুমারের মতো নির্লোভ, ত্যাগী ও মননশীল মানুষের প্রতি অনভিনিবেশ ও উপেক্ষাই তো সংগত। তাতে অবশ্য সেই বিস্মৃত সত্তার কোনো চিত্তক্ষোভ থাকতে পারে না, কেননা জীবিতকালেই তিনি জানতেন, বিশ্বাসও করতেন, যে, মানুষের জীবনের নিয়ামক হল Vital, aesthetic being বা প্রাণপুরুষ। তারই প্রবর্তনায় চালিত হয়েছে তাঁর আনন্দময় দৈনন্দিন। সাম্প্রতিকের উচ্ছ্বসিত উৎসব, স্মরণ-বরণের দীপালোক, তাঁর পক্ষে খুব প্রেয় ছিল না বোধহয়। সারা জীবনের অন্বেষা ও সংবেদনে তাঁর মধ্যে বারে বারে এসেছে সন্দেহ, সংশয়, দোলাচল ও প্রশ্নমুখরতা কিন্তু আদ্যন্ত তিনি ছিলেন বিশ্বাসী ও ভক্ত। দ্বিধাহীন শমতায় জেনেছিলেন :

> আঁখির লক্ষ্য—তোমার পরম দরশন
> তনুর স্বপ্ন—তোমার অঙ্গ পরশন
> রসনা যে চায় গাহিতে তোমার কীর্তন

এমন সস্মিত ব্যক্তিত্ববিষয়ে আমাদের উদাসীনতা বা অকর্তব্য প্রধানত শোচনার। তবু সময় সুযোগ থাকে, স্বেচ্ছাবৃত আগ্রহে তাঁর সম্পর্কে কলম ধরতে অনেকে এগিয়ে আসেন। এই সংকলন যে শেষ পর্যন্ত একটি স্বস্তিকর অবয়ব নিয়েছে, এখানে থাক তার সানন্দ স্বীকৃতি। সেই স্বীকৃতির অনুষঙ্গে সংকলনটির মূল লক্ষ্যের কথা পাঠকদের জানানো দরকার। নিছক শতবার্ষিক স্মরণকৃত্য কিংবা ঔপলক্ষিক ভাবাবেগের বাইরে আলাদাভাবে সংকলনটি পরিকল্পিত। গত শতাব্দী থেকে এই শতাব্দী পর্যন্ত প্রসারিত একজন জিজ্ঞাসু ও রসান্বেষী মানুষের আত্মবিকাশের ধারাটিকে এখানে আমরা বুঝতে চেয়েছি। ভক্তিআপ্লুত বিচারবিহীন ভাবালুতা ও আর্দ্র পূজাবেদিতে দিলীপকুমারকে

স্থাপিত করার আগ্রহ আমাদের নেই। দ্বন্দ্বে-ছন্দে, রূপে-বর্ণে, প্রত্যয়ে-স্ববিরোধে, প্রশ্নে-প্রতিপ্রশ্নে জর্জরিত অথচ শিল্পসান্নিধ্যে রুচিমান, আদর্শ সন্ধানে চিরচঞ্চল, শরণাগতিতে আস্থাশীল একান্ত আধুনিক সেই মানুষটিকে আমরা উন্মোচিত করতে চাই। সেইজন্যই এ-সংকলনের লেখকদের রচনায় স্মৃতিচারণের পাশাপাশি পাওয়া যাবে বিচারশীল সিদ্ধান্ত, শ্রদ্ধিত সমালোচনা, অবলোকন ও পুনরুদ্ধার। তাঁর ধ্যানতন্ময় যোগব্রতের সঙ্গে অতিপ্রজ লেখনীপ্রবণতা, দেশে দেশে উড়ে চলার সমান্তরালে আত্মমগ্নতার প্রশান্তি, অশ্রান্ত গায়নের মধ্যেও অগণন গানসৃজনের প্রাণবেগসম্পন্ন আততি আমাদের ছুঁয়ে যায়। তাঁর গেরুয়াশোভিত সাধকমূর্তির অভ্যন্তরে সৌন্দর্য ও রূপের পূজারী বিগ্রহটুকু যেন অনুরাগীজনের চোখ না এড়ায়। বিশ্বাসী ভক্তের চিত্তপটে আধুনিক জিজ্ঞাসার দ্যোতনা তাঁকে অনন্য করেছিল একথা আমাদের মনে রাখতে হবে। আসলে শতবর্ষব্যাপী এই বরেণ্য ভারত সন্তান বিষয়ে আমাদের স্মৃতি-বিস্মৃতির ধরণটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে প্রস্তুত রচনাগুলিতে।

দিলীপকুমার রায়ের মতো অবিরত নানাবিষয়ে লেখনী চালনায় দক্ষ প্রতিভা বঙ্গ ভাষায় বেশি মিলবে না, অথচ তাঁর জন্মশতবর্ষের পূত লগ্নে দুটি জিনিসের অভাব দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল। প্রথমত, আজও তাঁর একটি জীবনী লেখা হয় নি, যদিও তাঁর মতো ঘটনাউজ্জ্বল ও বহুসান্নিধ্যধন্য জীবন খুব কম বাঙালির আছে। দ্বিতীয়ত, দিলীপকুমারের বাংলা বইগুলি প্রায় দুষ্প্রাপ্য এবং বহুক্ষেত্রে পুনর্মুদ্রণের ভাগ্যবঞ্চিত, অথচ বিদেশীভাষার তাঁর বই পাওয়া যায়। সম্প্রতি আনন্দ পাবলিশার্স 'দিলীপকুমার রচনাসংগ্রহ' প্রকাশ করে অনুরাগীদের ও বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তাতে 'ভ্রাম্যমাণ', 'সাঙ্গীতিকী', 'দেশে দেশে চলি উড়ে' ও 'স্মৃতিচারণ' এই চারখানি বই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। সমগ্র দৈলীপিরচনা... এটি এক দশমাংশমাত্র। দীর্ঘদিন ধরে দিলীপকুমারের নানাবিধ রচনা গ্রন্থকারে প্রকাশ ও প্রচার করে চলেছেন কলকাতার 'সুরকাব্য ট্রাস্ট' ও তার প্রাণপুরুষ মিলন সেন। শতবর্ষবছরে তাঁদের উদ্‌যোগে দিলীপকুমারপ্রসঙ্গে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী, গানের আসর ও আলোচনাসভাগুলি সচেতন মানুষের নজর কেড়েছে। তাঁদের সাধুবাদ প্রাপ্য। আমাদের সংকলনটি এই সব সামূহিক কাজের পরিপূরক বলে বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নানাবর্গের মান্য লেখকদের অনুভব-বিচার-উন্মোচনের সম্পূরক প্রয়াসরূপে দিলীপকুমারের নিজের দুটি রচনার পুনর্মুদ্রণ এই সংকলনের বিন্যাসের দিক থেকে মূল্যবান, কেননা এতে তাঁর প্রগল্‌ভ রচনাশৈলি, তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্যাবত্তা ও বিশ্বাসের বিশ্ব প্রতিফলিত। নানা উপলক্ষে লেখা একাধিক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রেরিত তাঁর পত্রসম্ভার দিলীপকুমারের মুমুক্ষু, ভাবময় ও শরণাগত মনটিকে যেমন পরিস্ফুট করে তেমনই এইসব ব্যক্তিগত চিঠিতে জেগে থাকে তাঁর ছেলেমানুষী মন, পরিহাসপ্রবণতা এমনকি অসহায় অস্তিত্ব। সব মিলিয়ে গোটা মানুষটি ভারি সম্ভ্রান্ত ও অনুরাগী। সৃষ্টির পদ্মে তাঁর চিত্তভ্রমর সদাচঞ্চল বাসনায় উজ্জীবিত। স্মৃতি-বিস্মৃতির পর্দা সরিয়ে দিলীপকুমার রায়কে আমরা নির্মোহ ভালবাসায় বরণ করি।

দুটি অক্ষমতার কথা উল্লেখ করা উচিত। ঔপন্যাসিক দিলীপকুমার সম্পর্কে কোনো লেখা এখানে যুক্ত করা যায়নি, তারজন্য অজুহাত দেখালে অপরাধের ক্ষালন হবে না। তেমনই অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল তাঁর গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন করা গেল না বলে। তার কারণ অবশ্য তাঁর সব বই চাক্ষুষ করতে না-পারার বাস্তবতা। পশ্চিমবঙ্গের সব কটি প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ঢুঁড়েও সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুত করা যায়নি। এছাড়া সামান্য কিছু মুদ্রণঘটিত ত্রুটি থেকে গেল, তবে তা শুদ্ধিপত্র সংযোজনের মতো মারাত্মক নয়। সংগীত ও সঙ্গীত দুটি বানানই রাখা হয়েছে অনিবার্য কারণে।

সম্পাদক হিসাবে এই সংকলন প্রকৃষ্ট সময়ে প্রকাশ করতে পেরে আমি কৃতার্থ বোধ করছি। দিলীপকুমারের মতো অভিজাতরুচির শীলিত ও শালীন ব্যক্তির সম্পর্কে যথাযথ শ্রদ্ধার্পণ আয়াসসাধ্য। সেই কঠিন কাজ করবার সূত্রে যেসব আনন্দিত অভিজ্ঞতা, উন্নত লেখকদের সংসর্গ এবং নিজেকে কিছুটা শিক্ষিত করার সুযোগ ঘটল তা আমার জীবনের উপচিত উদ্বৃত্ত। আমাদের বিপন্ন সময় ও অস্থির জনচিত্ত দিলীপকুমার প্রসঙ্গে আলোচনা থেকে যদি কিছুটা শুশ্রূষা আর দিশা পায় তবে লেখকদের প্রযত্ন সফল হবে।

স্বীকৃতি

এই সংকলন সফল হয়েছে অনেক রকমের প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সক্রিয় সহায়তায়। যেমন পুণার হরিকৃষ্ণ মন্দিরের নেত্রী ইন্দিরা দেবী ও সাধক শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মতিতে সম্ভব হয়েছে 'সুরভিত স্মৃতি : দাদাজী' লেখাটির প্রকাশ। সাহানা দেবীর পত্রাংশ জুড়ে-জুড়ে যে-রচনাটি নির্মিত সেই পত্রাংশ নির্বাচন ও মুদ্রণ-অনুমতি দিয়েছেন গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়। নীরদবরণের রচনাটি শ্রী অরবিন্দ ভবন প্রকাশিত 'শৃণ্বন্তু' পত্রিকার ফাল্গুন ১৪০২ এবং বৈশাখ ১৪০৩ সংখ্যা থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত। এটি প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন সম্পাদক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য। পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মূল রচনাটি হল্যাণ্ডের রটেনড্যামে ১৯৫৫ সালের ওয়ার্ল্ড মিউজিক ফেসটিভ্যালে পঠিত হয়েছিল। এটি পাওয়া গেছে রাকা সেনের সৌজন্যে।

দিলীপকুমার রায় সম্পর্কে স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবোধ ও মূল্যনির্ধারণের টানে সম্পাদকের অনুরোধে বিশেষভাবে লিখেছেন বর্ষীয়ান বুদ্ধিজীবী অন্নদাশঙ্কর রায়, দিলীপকুমারের সাংগীতিক সান্নিধ্যধন্য গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্‌ ও এ বছরের সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপক অশোক মিত্র, যশস্বী কবি ও অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ, অধ্যাপক-প্রাবন্ধিক অলোক রায় ও সংগীতকার সুমন চট্টোপাধ্যায়। নীলরতন সেনের রচনাটি তাঁর অনুমতিক্রমে 'প্রসঙ্গ : বাংলা ছন্দশিল্প ও ছন্দচিন্তা' বই থেকে গৃহীত হয়েছে। সংকলনের সূচিমুখের কবিতাটি এখনকার অন্যতম প্রধান কবি জয় গোস্বামী রচনা করেছেন দিলীপকুমারের গানের স্মৃতিতে। এঁরা সকলে বাংলার সারস্বত সমাজে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। সম্পাদক এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

সংকলনের মর্যাদা ও সৌষ্ঠব বেড়েছে আলোকচিত্র সম্ভারে অবং নিশিকান্তকৃত একটি প্রচ্ছদচিত্রের অনুলিপিতে। এর মধ্যে 'শেষ বয়সে দিলীপকুমার' চিত্রটি Fragrant Memories বই থেকে নেওয়া। বাকিগুলি দিয়েছেন গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়। দিলীপকুমারের পত্রসম্ভার প্রকাশ সম্ভব হল গোবিন্দগোপাল, অমলেন্দু দাশগুপ্ত ও নীলরতন সেনের সহযোগিতা ও সম্মতিতে। ইন্দিরা দেবীর লেখা এবং পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা দুটি ইংরাজি থেকে অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে শ্রুতি লাহিড়ী (মৈত্র) ও সুমনা রায়চৌধুরী।

সম্পাদককে নানা কাজে সাহায্য করবার জন্য আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য নামগুলি : মলয় প্রামাণিক, অশোক উপাধ্যায়, অভিজিৎ সেন ও বিভাস চক্রবর্তী। মুদ্রণ সৌকর্যের জন্য প্রশংসাভাজন বি. বি. সি. প্রিন্টিং এন্টারপ্রাইজের শিবনাথ ভদ্র। বইটির পরিবেশন ও বিপণনের দায়িত্ব নিয়ে 'পুস্তক বিপণি'র অনুপকুমার মাহিন্দার নিশ্চিন্ত করেছেন।

জয় গোস্বামী

বাঁশি

সুর ধ'রে উঠে যাও মেঘের সীমায়

গলায় যে অগ্নি বাস করে
তার ঝলক ফুঁড়ে দেয় মেঘ

পাহাড় চূড়ায়
মুহূর্তে মুহূর্তে তার বিদ্যুতের ঝুঁটি ঝলসে যায়

পরক্ষণে খাদে নামো
কোন
খাদ
কত
নিচু
তল
না
তাত
না
মাতা, বন্ধু? সেই ভয়াবহ অন্ধকার?
না কি সখাসখী সনে
কুতূহলে
ঘাটে
যাওয়া? কখনো বা বল্লভ দর্শন
পাওয়া যমুনার জলে....যমুনা...র জলে?
কণ্ঠে সে যমুনা আজও তার
জলচঞ্চলতা নিয়ে ধরা প'ড়ে আছে
মুরলী মধুর কোথা বাজে? কঁহী বাজে? কইতে নারি সে কাহিনী
শুধু জানি আমাদের অসূর্যম্পশ্য বাঁশি তুমি
সূর্যে আনো। মুরলিয়া...মুরলিয়া রে!
সুর ধ'রে শীর্ষে ওঠো। সারি রৈন সারি রৈনা সারারাত জেগে
কোথায় কোথায় যাও, 'জাওঁ' নাকি 'যাউঁ'
যেখানে মনোমোহন লচক লচক নৃত্যে তার
বজ্র ঝরাচ্ছেন
চূড়া থেকে চূড়া স্পর্শ ক'রে যায়

'বিনাবঁধু' , তাও অত মিঠে ক'রে যায়
যত ঈশ্বরের দিকে যাও তুমি
আমরা জানি তুমি বলো বাঁশির কথাই
আমরা জানি আমাদের জীবনে যে সব প্রেম
কখনো আসেনি আর কখনো আসবে না
সে সব না আসা প্রেম তুমি ধরো রৌদ্রালোকে, গানে
তোমার মতন কেউ কখনো আসে নি, আমরা জানি
কেবল অন্তরে নয়, বাঁশি স্পষ্ট সজ্ঞানে শুনেছি, তাই মানি

আমারও তো হাতে একটা বাঁশি
লেবুপাতা দিয়ে তৈরী। কাগজে কাগজে
ভোর থেকে বাজিয়ে বেড়াই
শোন বা না শোন তুমি নিঃশর্তে স্বীকার করি
তোমারই মতন আমি আজীবন প্রেম বলতে চাই।

ভাবের এক নতুন জগৎ

সাহানা দেবী

.... আমি 'দিলীপকুমার রায়ের গান' সম্বন্ধে লিখব আগেই স্থির করেছিলাম। রবীন্দ্রসংগীত ও অতুলদার গান, এঁদের দুজনেরই গান সম্বন্ধে আমি তো 'স্মৃতির খেয়া'য় সবই লিখেছি। নতুন ক'রে লিখবার কিছু নেই। তুলনামূলক জিনিস আমি করতে চাই না, তিনজনের গান একেবারেই তিন রকম। কাজেই তুলনা করা চলে না। দিলীপকুমারের গান সম্বন্ধে লিখবার অনেক কিছুই আছে। হয়তো লিখতে আরম্ভ করলে কোথাও তুলনা আপনি চলে আসবে, সে অন্য কথা।

দিলীপ আমার গান আগে কোথাও শুনেছিলেন কিনা তা আমার জানা নেই, তবে সঙ্গীত সম্মিলনীর আসরে আমরা দু'জনেই গেয়েছিলাম, আর কেউ গায়ক ছিলেন না। দিলীপের পাশে বসে সেই আমি প্রথম গান করি, আমার দিক থেকে এইটি বলতে পারি। তিনি আমার গান এর আগে কোথাও শুনেছিলেন কিনা তা আমি জানি না। 'মন্টুদার গান কেন আমাকে মুগ্ধ করে' এর উত্তর—ওরকম ধরণের গান আমি কোথাও আগে শুনিনি। শুনেই মনে হয়েছিল এইরকম গানই তো আমি কোথায় শেখা যায় (শোনা যায়) তাই কত খুঁজেছি, ভেবেছি, শিখতে চেয়েছি। গ্রামোফোনে এক ওস্তাদী গান শুনতে পেতাম। ব্রাহ্মসমাজ তখন খুব strict, জানোই তো। কাজেই তাঁর গান শুনে মনে হয়েছিল এই জিনিসই তো আমি খুঁজছি। তাঁর গানে প্রথম তাঁর অতুলনীয় কণ্ঠমাধুর্য, গাওয়ার লীলায়িত ভঙ্গী, অন্তরের আবেগ, প্রাণ—সব মিলিয়ে যে জিনিস সৃষ্টি করে, সেই জিনিস আমাকে আকর্ষণ করে, মুগ্ধ করে।

ভালো গান অনেক শুনেছি—বাঈজীদের গান রেকর্ডে অনেক শুনেছি, কিন্তু তাঁর গানের মধ্যে এঁদের সব কিছু থাকার মধ্যেও আরো এমন কিছু ছিল, যা আর কোনো বড় গাইয়ের মধ্যে পাইনি, তাঁর গানে যে রসের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব তাকে আরো অনেকখানি সরস করে ও আরো অতুলনীয় রূপ দান করে—এমনটি দেখা যায় না। গানে অন্তরই কাজ করে কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে। তাঁর গানে তাঁর ব্যক্তিত্বও কাজ করত, তাঁর গানে গতিশীলতার যে প্রবেগের স্পর্শ পাওয়া যায়, তা দুর্লভ বলেই আমার মনে হয়। তিনি নিজেও ছিলেন অসম্ভব প্রাণশক্তিপূর্ণ, তাঁর গানে তাঁর সব শক্তির প্রভাবও রূপ পেত, তাই তাঁর গান হয়ে উঠত এত প্রাণোজ্জ্বল, এত ওজসপূর্ণ ভাবে ভরা এক অপূর্ব জিনিস, অসাধারণ জিনিস।

যাইহোক, যা লিখলাম তা তাঁর গান সম্বন্ধে কিছুই নয়। লিখতে লিখতে আপনি বেরিয়ে এল নিজের অনুভূতির কথা। অতুলদার গান আমি আগেও গেয়েছি, কিন্তু যেরকম আসর করে দিলীপ গান গাইতেন সে রকম করে নয়। কোনো বড় gathering

বা বিশেষ কারো বাড়ীতে অনেক লোকের সামনে বসে গেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের আসরেও অনেক গেয়েছি। তাঁর সঙ্গে আমার বাড়ির পরিবারের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি প্রায়ই আমার মামার বাড়ি আসতেন। আমি তখন খুবই ছোট, তখন থেকেই তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন ও আমার গান তাঁর খুবই পছন্দ হয়। অতুলপ্রসাদের গান দিলীপই প্রচার করেন নানা আসরে গেয়ে, যেমন পঙ্কজ মল্লিক করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গান। দ্বিজেন্দ্রলালের গান আমি দিলীপের কাছে শিখি ও তাঁরই আসরে গাই। মনে আছে একটি আসরের কথা, University Institute Hall-এ হয়েছিল, তাইতে আমি 'প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে' তাঁরই শেখানো গাই। সেই গান শুনে সেই আসরে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন 'এরপর এ গান আর আমি গাইব না।' এতই successful তাঁর মনে হয়েছিল আমার সেদিনের গাওয়া গান।

আগে আমাদের এত আসরে গাওয়া ছিল না। রবীন্দ্রনাথও ঠিক গানের আসর করতেন না। তার মধ্যে dramatic কিছু থাকত। 'সঙ্গীত-সম্মিলনী' বা 'সঙ্গীত সংঘ' এই দুটো institution মাঝে মাঝে জলসা করতেন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে। সঙ্গীত-সম্মিলনীর আমি একজন member ছিলাম। ঠিক ছাত্রী নয়। দিলীপই আসর ক'রে গান গাওয়া প্রথম আরম্ভ করেন ও তাই থেকে অনেক কিছু প্রচার হয়।

আমি গান বছর দুই শিখেছিলাম সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে, রবীন্দ্রনাথই তাঁকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে গান শেখাবার জন্যে। তার অনেক পরে আমার বিয়েরও অনেক পরে দিলীপের সংস্রবে এলে তাঁর কাছে তাঁর আসরে গাইবার জন্য এবং তা ছাড়াও এমনিও বহু গান শিখি। উমা আসে তাঁর সংস্রবে আমরা পণ্ডিচেরি চলে আসবার ৯ বছর বাদে যখন তিনি এখান থেকে প্রথমবার কলকাতা যান, তখন (১৯৩৭ সালে)।

...... দিলীপের গান গাওয়া বা তোলা সহজ নয়। অনেকরকম সূক্ষ্ম কারুকার্য, light & shade এর দরকার তার গান গাইতে হ'লে। সে সব একত্রে পাওয়া কঠিন। তোমরা তো সবই বোঝ।

...... গান সম্বন্ধে আমার বলার কথা, অবশ্য শুধু এটা আমার অভিজ্ঞতা, সকলের পক্ষে খাটে কিনা, সকলের জন্য কিনা তা বলতে পারব না। সে এক ভগবানই জানেন। তবে তিনি আমাকে যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এনেছেন তার কথাই শুধু বলব এবং বলতে পারি। আমি মনে করি গান শুধু ভাব, প্রাণ, সুর, লয় গভীরতা ইত্যাদি নয়। এই সবের নিখুঁততা বা সংমিশ্রণে যে জিনিস পাওয়া যায় তা অনেকখানি হলেও তা সব নয়। গানে, প্রত্যেকটি গানে, এ সমস্তকে অতিক্রম ক'রেও আর একটি এমন জিনিস, উপাদান থাকে (সে-উপাদান গঠিতই অন্য উপাদানে) যা প্রকাশের অপেক্ষা রাখে। সেটা কী, সেটার প্রেরণা গায়কের ভিতর থেকেই আসবে ও গায়ক আপনিই পাবে। সেই জিনিস যখন আপনাকে মূর্ত করে তুলবে গানে (আমি অবশ্য ভক্তিরসাত্মক গানের বিষয়েই বলেছি) তখনই আমি যাকে গান বলি সে গান তার পূর্ণ রূপ প্রাপ্ত হয়। গানের আর সব জিনিসে highest perfection সিদ্ধিলাভ করলেও এইটি হচ্ছে সেই জিনিস যে গানের আসল পরিচয়, আসল পদার্থ, আসল রূপ কী তা সামনে এনে উজ্জ্বল রূপে

ধরবে, দেখাবে ও গানের পূর্ণ পরিণতির পথ দেখাবে। তাকে চিনতে হবে, ধরতে হবে, অনুভব করতে হবে সে কী চায় প্রকাশ করতে, তখন তার কাছে open করলে সে-ই প্রকাশ করে সত্যকারের গান কী—কী তার আদর্শ কী তার ধর্ম, কিজন্যে তার সুর, তাল, লয়, প্রাণ, কথা, ভাব, অনুভূতি ইত্যাদির এত সরঞ্জাম। আমি বলি তখনই গান গান হয় (এটা অবশ্য আমার অনুভূতি। সত্য মিথ্যা কতদূর কী তা ভাই বলতে পারব না।)।

...... তোমাদের দিলীপদার গান শুনে মন যেন ভরে না! তাঁর কণ্ঠ সর্বদাই গুনগুনিয়ে ওঠে। ২৫ বছর ধরে ওই কণ্ঠের গান সদাসর্বদা শুনেছি .....তাঁর গান বড় কঠিন। সুরের যে সব আলোছায়ার সূক্ষ্ম কারুকার্য আছে ও তার মধ্যে যে রসের উৎস আছে তাকে ঠিক মতো ধরতে পারা কঠিন—তাই নয় কি?

.... তোমার মন্টুদাকে শ্রীমা নবসঙ্গীত সৃষ্টির দিকে যেতে বলেন তা জানি। তিনি সুরকার ও সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে কী হয়েছিলেন তার তুলনা কি তোমরা আজো খুঁজে পেয়েছো? আমি তো পাইনি। তিনি সম্পূর্ণ নতুন সঙ্গীতজগতই সৃষ্টি করে গেছেন তাঁর শ্রীগুরু, শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণায় কৃপায়। আমায় শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন, 'দিলীপের সাধনা কাব্য ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে।' কাব্যে সাহায্য করেছেন তিনি স্বয়ং এবং সঙ্গীতে শ্রীমা। শ্রীমা কখনো কিছু বলে করতেন না, শুধু প্রেরণা দিতেন। আমি শুধু এইটুকুই জানি। নব বৈশিষ্ট্য নিয়ে সঙ্গীত সৃষ্টি ও অতুলনীয় সুরকার তিনি এইভাবে হয়ে ওঠেন। শ্রীমা শুধু বলেছিলেন (ও প্রেরণা দিতেন) তোমায় নব সঙ্গীত সৃজন করতে হবে। তাঁর দিলীপের গান খুবই পছন্দ ছিল।

তবে শুনেছি এবং এ খবর সত্য যে ছোটবেলায় দিলীপ নাকি একেবারেই গাইতে পারতেন না। তাঁর কত বয়স থেকে তিনি গান গাইতে আরম্ভ করেন তা আমার জানা নেই। আমি ১৯২২ প্রথম তাঁকে দেখি ও তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যাই গয়া কংগ্রেসে। আমার মামা সেবার President ছিলেন এই সভামণ্ডপের আসরে ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে। তাঁর মত কণ্ঠ, তন্ময় হয়ে তাতে বিভোর হয়ে অপূর্ব ভাবের এক নতুন জগৎ সামনে খুলে দিয়ে গান গাওয়া আমি তো আর শুনলাম না।

সুরভিত স্মৃতি : দাদাজী

ইন্দিরা দেবী

ইন্দিরাদেবীর সঙ্গে দাদাজীর দেখা হয় ১৯৪৬ সালের ৮ই অক্টোবর। মধ্যপ্রদেশের একটি কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জমায়েতে ইন্দিরা সভাপতিত্ব করেছিলেন। দাদাজী অলংকৃত করেছিলেন ঐ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির পদটি।

'তুমি কি চাও?', তিনি জানতে চাইলেন.

ইন্দিরা উত্তর দিল, 'আমি চাই আলো, আমি আঁধারে পথের নির্দেশ চাই'।

শ্রীদিলীপকুমার বললেন, 'আমি নিজেও এখনও খুঁজছি, এখনও লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি। শ্রীঅরবিন্দ এবং শ্রীমায়ের শিষ্য আমি নিজেই। আমি কিভাবে তোমায় পথ দেখাব?'

— আমি অনেক বিখ্যাত পুরুষকে দেখেছি। কিন্তু এমন স্পষ্টত নিবেদিতপ্রাণ কাউকে দেখিনি। আমার কাছে এটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আপনার অর্ধেক নিষ্ঠাও যদি আমার থাকে তাহলে আমি ভুল করতে পারি না। আর যদি অনুভবের কথা বলেন তাহলে আমি বলব যে আমার গোপন বিশ্বাস হল ঈশ্বর নিজেও অপরিবর্তনীয় নন। ঔৎকর্ষের স্তর থেকে স্তরান্তবে তাঁর বিচরণ। জানিনা একে আপনি ঈশ্বরনিন্দা বলবেন কিনা। আমাদের বিকাশ হবে একই সঙ্গে—আপনি সাধনার শিখর থেকে শিখরে অমিত গতিতে পৌঁছে যাবেন আর আমার ক্লান্ত চরণ অনুসরণ করবে আপনাকে।

দাদাজী বলেছিলেন, 'ইন্দিরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর যেন তোমায় হতাশ না করি, তোমার বিশ্বাসকে যেন আমি ধ্বংস না করি। এই দিনটা কেবল যে ইন্দিরা দেবীর পক্ষেই স্মরণীয় ছিল তা নয়, বারোবছর বয়স থেকে যে ঈশ্বরকে তিনি খুঁজছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের যে-মন্ত্রকে তিনি গ্রহণ করেছেন—'ঈশ্বরানুভূতিই জীবনের উদ্দেশ্য'—তা এই সময় থেকেই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তিনি আবিষ্ট হলেন নব উদ্যমে, আত্মোৎসর্গের নব প্রেরণায়, একমুখী প্রেরণার দিব্য বিভায়। সাধক দিলীপ রায়, গায়ক, জ্ঞানী, মিস্টিক এবং সন্ধিৎসু দিলীপকুমার রায় প্রকাশ পেলেন। তাঁর সব কাজ, তাঁর লেখা, তাঁর গান, তাঁর অতুলনীয় প্রতিভা নব দীপ্তির ছোঁয়া পেল। কিন্তু অধ্যবসায়ী ইন্দিরার ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর ভুল ধারণা ছিল। তিনি তাই বলেছিলেন :

'অন্তরের আলো বলতে তুমি যদি বুঝে থাক মাদকতাময় শান্তি বা সহজলভ্য কোনো ঐশ্বরিক আশিস যা কিনা প্রায় অবিশ্বাস্য, কিম্বা তোমার লক্ষ্য অভিমুখে পৌঁছে দেওয়ার সূর্যকরোজ্জ্বল পথ, তা হলে কিন্তু ভুল করবে। এ পথ সংকীর্ণ এবং দুরারোহ। প্রতি পদে রয়েছে বাধাবিঘ্ন। এ পথে চলতে গেলে যথেষ্ট শক্তি ও সাহস প্রয়োজন। সবরকম আঘাত প্রত্যাঘাতের জন্য তোমায় প্রস্তুত থাকতে হবে। যে সব প্রিয়জনেরা

আজ তোমায় ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন বা প্রশংসা করেন, তাঁরা খুব তাড়াতাড়িই তোমায় ভুল বুঝবেন। তোমার উদ্দেশ্যকে অবিশ্বাস করবেন, সমালোচনা করবেন, এমনকি সাধারণের অনুসৃত পথকে বর্জন করেছ বলে তোমায় দোষারোপ করবেন। হতাশা আসবে, পিছুটান ফেরাতে চাইবে। সেন্ট জনের ভাষায় যাকে বলা যায় আত্মার অমা রাত (The dark night of the soul)।

— দাদা, আমি সহজ কোনো পথ চাইছি না। প্রার্থনা করি, অন্যদের ভ্রান্ত ধারণা কেন হয়েছে তা বুঝবার শক্তি যেন আমি পাই। আমার প্রতি যাঁরা বিশ্বাস হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমার বিশ্বাস যেন থাকে। আমায় বিনম্র করুন। অন্যকে বিচার করবার বা অস্বীকারের মনোভাব নয়, আমি চাই সব কিছুকে তাদের প্রকৃত স্বরূপে স্বীকার করার মত গ্রহিষ্ণুতা এবং সর্বোপরি প্রেমের শক্তিকে স্বীকার করার ক্ষমতা। সব রকম তুচ্ছতা, মধ্যপন্থী মানসিকতার উর্ধ্বে আমায় উঠতে দিন। নির্বিশেষে সকলকে যেন ভালবাসতে পারি। আসলে আমাদের জীবন তো আমাদের বিষয়ে অন্যদের মতামতের উপর নির্ভরশীল বা ধারাবাহী নয়। ব্যক্তিগত নিষ্ঠা এবং ঐশ্বরিক আশীর্বাদই আমাদের প্রাণিত করে।

এক বিরল সম্পর্কের এই ছিল সূচনা। তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবনের এক বিস্ময়কর অধ্যায়ের শুরু হল এর পর। এ কেবল গুরুশিষ্যের সম্পর্ক ছিল না, কেবল পিতা-কন্যা বা ছাত্রী-শিক্ষকের সম্পর্কও নয়। বরং আরো কিছু। তাঁরা যেন দুই সুহৃদ যাঁদের পথ এক, লক্ষ্য অভিন্ন। যেন তীর্থপথের দুই সহযাত্রী যাঁরা নক্ষত্রলোক-অভিসারী।

চল্লিশটি বছরের মধ্যে ইন্দিরা নয়শ'রও কিছু বেশি গান রচনা করেছিলেন। দাদাজী সেগুলি অনুবাদ করেন। গানগুলিতে সুরারোপ করে তিনি সারা পৃথিবীতে গেয়েছিলেন। একের পর এক সেই আশ্চর্য দিনগুলি কেটেছে যখন দাদাজী গানগুলি গাইতেন, শুধু স্বকণ্ঠে নয়, সমস্ত সত্তাকেই উজাড় করে।

'তোমার ব্যক্তিত্ব এত দৃঢ় যে তোমার পক্ষে কিছু মেনে চলা বা গ্রহণ করা সহজ হবে না', দাদাজী বলেছিলেন।

—আমি জানি যে আমি মাত্রাতিরিক্ত স্বেচ্ছাধীন এবং অহংকারী নারী। আমার লক্ষাধিক ত্রুটি আছে। আমার অহং নত না হলে আমার ইচ্ছাকে ভেঙে টুকরো করে দেবেন। কিন্তু আমায় পরিত্যাগ করবেন না। আমার সব একগুঁয়েমি, সব স্বেচ্ছাচারকে আপনার পথ অনুসরণের কাজে ব্যবহার করব। কখনও হাল ছাড়ব না, কখনও 'না' বলব না।

১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইন্দিরা দেবী সংসারের সম্পর্ক ছিন্ন করে শ্রী অরবিন্দ আশ্রমে চলে আসেন। দাদাজী তাঁকে বলেছিলেন : 'ইন্দিরা, শৈশব থেকে ঈশ্বরকে চেয়েছি। কেবল ঈশ্বর এবং গুরুর কারণেই আমার জীবনধারা। তুমি যদি কেবল ঈশ্বরের জন্যই বাঁচতে পার তবে তুমি এই পথে এসো। অন্যথায় তুমি ফিরে যেও।'

ইন্দিরা উত্তর দিলেন,

'দাদা, আমি ফিরে যাব না। কিন্তু আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি নিঃশর্ত ভালবাসার চাহিদাহীন, অধিকারবোধহীন সে প্রেম। আপনার জীবন্ ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত, আর আমি বেঁচে থাকব আপনার মাঝে ঈশ্বরকে পাব বলে'।

* * * * *

দাদাজী একদিন 'সাবিত্রী' থেকে পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন এই অংশটি :
This world was not built by random bricks of Chance,
A blind God is not our destiny's architect :
A conscious power has drawn the plan of life,
There is a meaning in each curve and line.

ইন্দিরার বিশ্বাস জন্মাচ্ছিল যে ভাগ্য হল প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান। এই আহ্বান ভাগ্যের সম্মুখীন হবার, পরিচিত হবার এবং সম্ভবত ভাগ্যকে কিছুটা রূপান্তরিত করে এমনকি জিতে নেবার জন্যেও। ভাগ্যই কি দাদাজীকে ১৯৪৬ সালের ৮ই অক্টোবর, এই কলেজে এনেছিল? হয়তো বা ভাগ্যই ইন্দিরাকে এনেছিল শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের পদপ্রান্তে, যাঁরা অসীম প্রেম ও মমতায় আবৃত রেখেছিলেন তাকে।

১৯৪৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ছিল শ্রীমায়ের জন্মদিন। ইন্দিরা পণ্ডিচেরিতে তাঁর এক বান্ধবীর সঙ্গে শিশুসুলভ বাজি ধরেছিলেন। বান্ধবীর বক্তব্য ছিল গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় সহায়তা ছাড়া ইন্দিরা একদিনও আশ্রমে থাকতে পারবেন না।

শ্রীঅরবিন্দের উপস্থিতি ইন্দিরাকে উদ্বেল করে তুলেছিল। কিন্তু কেমনভাবে—তা প্রকাশ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না, দাদাজীর বাড়িতে ফিরে আসার পর তিনি বললেন, 'দর্শনের পর আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে না, অনেক বন্ধু এখানে আসেন। আমি গান গাই আর অন্তরের প্রণতি জানাই শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশে। তুমি, বস, ধ্যান কর, বা কেবলমাত্র গান শুনতেও পার।'

— ধ্যান কি তাই তো আমি জানি না!

— শান্ত হয়ে বসে গান শোনো। পরে ধ্যান নিয়ে আলোচনা করব।

হলটি ভারি সুন্দর। বহু মানুষ সেখানে দাদাজীর গান শুনতে এসেছেন। ইন্দিরা দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসলেন। তিনি যখনই চোখ বন্ধ করে আরাম করে বসেছেন মনে হল তুষার নেমে এল তাঁর উপরে। কিন্তু এই তুষার শীতলতার পরিবর্তে নিয়ে এল শান্তি আর স্নিগ্ধ আশিস। আশির বয়ে গেল সেই স্রোত। তাঁর মনে হল তিনি ভেসে যাচ্ছেন। তিনি কিছুই দেখছিলেন না, কিছু শুনছিলেন না। কিন্তু তাঁর অনুভূতি বিমূর্ত অনুভূতি মাত্র ছিল না। ও যেন আপনিই সংঘটিত হচ্ছিল—কোন কারণহীন প্রশান্তি—মন বা বুদ্ধি দিয়ে যার তল পাওয়া যায় না।

চার ঘন্টা পর ইন্দিরা চোখ খুললেন। মাথার উপরে দাদাজীর হাতের আশিস স্পর্শের অনুভব—

— তোমার কি হয়েছে?

— জানি না তো।

বেশ! তুমি ঈশ্বরের কৃপা পেয়েছো। শ্রীঅরবিন্দ আমায় চিঠি দিয়েছেন—'আমরা তাকে শিষ্যারূপে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। সে পরিণত এবং আরো বেশি কিছু'।

শ্রীঅরবিন্দ ইন্দিরার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এত আশ্চর্য সব কথা লিখেছিলেন যে তিনি ভয় পেলেন।

— কি হয়েছিল, দাদাজী?

— হয়েছিল এই যে, তুমি আমার কাছে পথের নির্দেশ চেয়েছিলে। তুমি দাবী করছ যে তুমি আমার কাছে শিখতে চাও। এখানে তুমি এসেই প্রথমে আমাকে খুব অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে দাও। আমি সত্যিই জানি না কি হয়েছে।

দাদাজীর 'আমি জানি না' কথাটুকুর মধ্যে এমন স্বতঃস্ফূর্ত সহজ সুর ছিল যে ইন্দিরা চম্‌কে উঠলেন। এরপরেও অনেক সময় তিনি দাদাজীকে বলতে শুনেছেন, 'আমি অন্যায় করেছি', 'আমি ভুল করেছিলাম', বা 'আমি জানি না।' এইসব বিখ্যাত লোকেদের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার হল তাঁরাও যে মাঝে মাঝে ভুল করতে পারেন এটা স্বীকার করা। দাদাজীর ব্যক্তিত্বের এই বৈশিষ্ট্যটি ছিল সবচেয়ে দামী তাই কেমন সহজ সুরে বলতে পারতেন, 'আমি জানি না'। খ্যাতি আর মহত্ত্ব—এ দুয়ের মধ্যে বিশাল পার্থক্য আছে, আমি বুঝেছিলাম তাঁকে দেখে।

দাদাজী একদিন বলেছিলেন, 'ইন্দিরা, তুমি কবি রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধার কথা জানো। আমার সঙ্গে তাঁর বিতর্কের কথাও জান'। আমি বলেছিলাম, 'আপনার অপূর্ব রচনাগুলি গাইবার সময় তাৎক্ষণিক পরিবর্তনের জন্য গায়ককে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত।' কবি বলেছিলেন, 'না দিলীপ, আমি সে অনুমতি কেবল তোমাকেই দিতে পারি, কারণ তুমি হচ্ছ ব্যতিক্রম। কিন্তু সকলকে দিতে পারি না।'

— আমি ভুল করেছিলাম। কবি নিশ্চিতভাবে সঠিক ছিলেন ঐ বিষয়ে আমার ঐভাবে জোর করবার কোনো অধিকারই ছিল না। আমি পরে ক্ষমা চেয়েছি এবং প্রকাশ্যে বারবারই বলেছিলাম যে আমি ভুল করেছি।

পরের দিন সকালে ইন্দিরা অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে দাদাজীকে ডাকলেন।

'দাদাজী, গুরুদেবকে প্রথম দর্শনের পর আপনার কি ধরণের অনুভূতি বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল?

— 'প্রথমবার কেবল প্রবল আনন্দের অনুভূতি। কিন্তু দ্বিতীয় দর্শন শেষে যখন আমি বাড়ি এসে গান গাইবার পর আমার ঘরে ধ্যানে বসলাম, এক অবর্ণনীয় আশিস আমার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে গেল। কেবল আমার দেহকেই তা ধন্য করল না, চারপাশে..... যেখানে দৃষ্টিপাত করলাম—কেবল পরম আশিস সর্বত্র বিরাজিত। এই গাছ, এই আকাশ, পাখিরা, দেওয়ালগুলি—সব কিছু থেকেই স্বর্গীয় আশিস যেন ঝরে পড়ছে। আমি যেহেতু সন্দেহবাদী ছিলাম, জানতে ইচ্ছে হল ব্যাপারটা প্রকৃতপক্ষে কী।

সহসা আমার ভিতর থেকে একটি কণ্ঠ বলে উঠল : যদি কোনো বন্ধু এখন তোমার কাছে জানতে চায় তোমার ভিতরে কী হচ্ছে, তুমি কী বলবে?

ভিতর থেকে আরো একটি কণ্ঠ উত্তর দিল : মানুষ জীবনে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে, কামনা করে কোন্ জিনিসটি?

প্রথম কণ্ঠ : আলো ও বাতাস।

দ্বিতীয় কণ্ঠ : আমি আমার বন্ধুকে বলব যদি এই পূর্ণ আশিস লাভের মুহূর্তে আমাকে আলো বাতাসহীন নরকেও রাখা হয় আমার তবুও কোনো অভাববোধ থাকবে না। পরম আশীর্বাদে আমি পূর্ণ।

কী আশ্চর্য! দাদাজী এবং ইন্দিরার প্রায় একই অনুভূতি হয়েছিল! কিন্তু তার ধরণটি ছিল পৃথক।

ইন্দিরা বারবার লক্ষ করতেন যে যদিও দাদাজী সব সময় ইন্দিরার বিষয়ে সমস্যা কিছু বলবার এবং লেখার অভ্যাস তৈরি করেছেন, কিন্তু নিজের আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে তিনি কিছুই বলতে চান না,

— আমার দিব্যদর্শন ঘটে না। আমি ধ্যানে এমনকি কোনো টিকটিকিও দেখিনি। শৈশব থেকে আমি ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল, তাঁকে ডাকছি......অথচ অন্যান্য লোকের ক্ষেত্রে কত চমৎকার সব ঘটনা ঘটেছে।

একবার মিরটোলার আশ্রমে গান গাইবার পর আমি কৃষ্ণপ্রেমের গুরু যশোদা মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মা, আমি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গান গাই, এমনকি দেহের প্রতিটি তন্তু তাঁর প্রতি নিবেদন করি—তবুও আমি কিছুই দেখতে পাই না। কেবলমাত্র তাঁর উপস্থিতিকে আমি অনুভব কবি। কিন্তু অনুভব তো আর দর্শন নয়। মা! তুমি বল যে তুমি তাঁকে দাঁড়িয়ে একমনে গান শুনতে দেখেছ।'

যশোদা মা বললেন, 'শুধু যে তাঁকে আমি দেখেছি তাই নয়, তার সঙ্গে কথাও বলেছি'।

— কেন তবে তাঁকে তুমি আমার হয়ে অনুরোধ করনি মা, যাতে আমিও তাঁর দেখা পাই? আমি তাঁর উপস্থিতি অনুভব করি কিন্তু কিছুই দেখতে পাই না, এমনকি তাঁর মাথার চূড়াটুকুও না, অবশ্য যদি সত্যিই তা থেকে থাকে।

যশোদা মা — আমি ঠিক এই কথাটাই তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি।

দাদাজী — তিনি কি বললেন?

যশোদা মা—তিনি বললেন, ওর ব্যাকুলতা যদি মিটে যায় ও আর এভাবে গান গাইবে না।

যদি ইন্দিরাকে কেউ জিজ্ঞেস করে গত চল্লিশটি বছর ধরে সত্যানুসন্ধানের কাজে তিনি সবচেয়ে সাহায্য পেয়েছেন কী থেকে, তিনি উত্তর দিতেন, অবশ্যই দাদাজীর গান। তাঁর দাদাজীকে লেখা শ্রীঅরবিন্দের একটি চিঠির কথা মনে পড়ল। দাদাজীর অভিযোগ ছিল যে সম্ভবত গান গুরুদেবকে আকর্ষণ করে না। তাই তাঁর গানের সময় শ্রীঅরবিন্দ মুদিত চোখে ধ্যানমগ্ন ছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন :

দিলীপ, তোমার এই সন্দেহ সম্পূর্ণ অকারণ। তোমার সঙ্গীতে আমার আগ্রহ নেই এমন হতেই পারে না। বরং আমার আগ্রহ এত প্রবল যে আমার ঘুমের সময়টুকুতেও আমি তোমার 'সরস্বতী' সঙ্গীতটি সংশোধন করতে বসেছিলাম, যাতে অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে গানটি তৈরি থাকে। দিনের অন্য সময়ে আমি গানটি সংশোধনের সময় পাচ্ছিলাম না। একজন আমাকে চিঠিতে প্রশ্ন করেছিলেন এবং তার উত্তরে আমি তাঁকে লিখেছি যে গতকাল তোমার গান অনুভব এবং তাৎপর্যের দিক দিয়ে আমাদের এতদিনের গান শোনার অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে গেছে। সেই ব্যক্তি ঠিকই অনুভব করেছেন যে তোমার এইদিনের গান দিব্যমানসের অবতরণের জন্য মর্ত্যচেতনার উদ্বোধনের পক্ষে অত্যন্ত যথার্থ। অপরূপ সংগীতধারা যে অনুভূতি জাগিয়ে তোলে তা বর্ণনা করতে গেলে ভাষাকে বিবর্ণ, নিষ্প্রাণ মনে হয় এবং কিছু বোঝানও যায় না। যে-বোধ কেবলই মানসিক এবং বাক্যাতীত তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তোমার গান সম্বন্ধে অন্ততঃ আমার এই অনুভূতিই হয়েছে আর এই জন্যই তোমার গান সম্পর্কে কিছু লেখা সবসময়েই আমার কাছে একটু কঠিন মনে হয়।

শ্রীঅরবিন্দ
২৩।৩।৩৩

* * * * *

গুরুর প্রতি ইন্দিরার প্রেম ও ভক্তি দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তা বাড়ছিল মাস থেকে মাসে, বছর থেকে বছরে। প্রতিদিনই তিনি নতুন কিছু লক্ষ করছিলেন। তাঁর বিস্ময়কর চরিত্রের কোনো একটি নতুন দিক প্রতিদিন ইন্দিরার কাছে প্রকাশিত হত। কখনো বদ্ধতা আসত না। ইন্দিরার মনে পড়ত A. E -র চমৎকার কবিতাটি :

We must rise or we must fall
    love can know no middle way,
If the great life do not call
    There is sadness and decay.

সমস্যা হল যে তাঁর সব সময়ে মনে হত ব্যাপারটা সম্পূর্ণ একতরফা হয়ে যাচ্ছে। তিনি সব সময় গ্রহীতার ভূমিকা পালন করছেন। এমনকি স্থূল বা রূঢ় লোকেদের এড়িয়ে চলবার তাঁর যে অভ্যাস সেটাও তিনি ত্যাগ করতে পারছেন না। সম্ভবত অবচেতনের কোথাও আত্মরক্ষার মনোভাব তাঁর রয়ে গেছে।

একটা ব্যাপারে তাঁর খুব আশ্চর্য লাগে। কোনো মানুষের বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্তন সাধন এত কঠিন কেন? অপূর্ব সব আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কেন এই কাঠিন্য? দুটোই অত্যন্ত বাস্তব, অন্তত এই বিষয়ে ইন্দিরা নিশ্চিত ছিলেন। বহিঃপ্রকৃতির অপরিবর্তনীয়তা এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতি কোনো বিষয়েই দ্বৈধ-ভাব ছিল না। ইন্দিরার কাছে মনুষ্য প্রকৃতির এই-বিরোধ, বিশেষত তাঁর নিজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর মনে

হত। যুক্তিনির্ভর মনের এই অনিয়ম তাঁর কাছে আশ্চর্যের মনে হত। তবু এটাই সত্যি। ঐকতান সাধনের মধ্যেই যদি মানুষ তার সব সমস্যার সমাধান খুঁজে পায় তাহলে বহিঃপ্রকৃতি আর অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যেও সমতান থাকা উচিত। মনে হবে প্রভু, আজ্ঞাবহ, নয়। হৃদয় দেবে পথের নির্দেশ সে কিন্তু আবেগবিহ্বল হবে না। এ হল, সেই বিশুদ্ধ হৃদয়, আত্মনিবেদিত, অনুসন্ধিৎসু অনুগামীর সেই হৃদয়ই নির্দেশ দেবে পথের।

শেষ পর্যন্ত একমাত্র সিদ্ধান্ত হল আজ, কাল বা পরশু ইন্দিরাকে আত্মসমর্পণ করতেই হবে। তাহলে আজই নয় কেন? কেন আরো যন্ত্রণা আরো অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অপেক্ষা? নব উৎসাহে, আনন্দে, প্রবল ইচ্ছাশক্তি আর সঙ্কল্পে উজ্জীবিত হয়ে এখনি কেন নয়?

এই সময় ইন্দিরা তাঁর গুরুর সঙ্গে চার বছরেও বেশি সময় ছিলেন। তবু জীবনে সহজ সরল হবার শিক্ষা তাঁর সম্পূর্ণ হয়নি। কারণ পরিবর্তন আসছিল ধীরে, খুব ধীরে, তাই ভেবে তার দীর্ঘশ্বাস পড়ত।

দিলীপকুমার রায়ের আশ্রমজীবন

নীরদবরণ

দুই আলোকসামান্য প্রতিভার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার আমার সৌভাগ্য হয়েছে, একজনের বাণী প্রতিভা, একজন কবিশিল্পী, অন্যজন সুরশিল্পী। দুই প্রতিভাই চরম উৎকর্ষ লাভ করে শ্রীঅরবিন্দের কৃপায় এবং তাঁর অলৌকিক যোগশক্তির প্রেরণায়। আশ্চর্য হয়ে ভাবি কি করে এই মণিকাঞ্চন যোগ ঘটল। কি করে আশ্রম-আকাশে দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের যুগপৎ মিলন ঘটল! বহু বছর পরে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হলেন এবং দুজনেই শেষে বিদায় নিলেন ইহজগতের কাজ শেষ করে।

রূপে, গুণে, গানে, সৃষ্টির আনন্দে আশ্রমের একটি কোণ তিনি মুখর করে রেখেছিলেন। মাঝে মাঝে শীতের হাড় কাঁপানো হাওয়া বয়ে গেলেও তাঁর অফুরন্ত প্রাণশক্তিকে কাবু করতে পারে নি। ত্রিশ দশকের প্রথমদিকে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয় এবং গড়ে ওঠে অহেতুক গভীর স্নেহের সম্পর্ক; ফলে তাঁর গানের আসরে, সাহিত্যচর্চায় যোগদান, সর্বোপরি তাঁর মহৎ এবং মধুর সঙ্গের সংযোগ লাভ আমার প্রাথমিক আশ্রম জীবনের প্রধান অবলম্বন হয়েছে। তিনিই প্রথম শ্রীমায়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিয়ে দেন এবং তারই আনুকূল্যে বোধহয় শ্রীঅরবিন্দের সহজ সান্নিধ্য আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে।

সেই প্রথম যুগের স্মৃতির মধ্যে দীপ্যমান হয়ে রয়েছে দিলীপের কোন পরিচয়টি? তাঁর প্রিয়দর্শন হাস্যমধুর মুখ, তাঁর কাব্যরসোচ্ছল মূর্তি, না তাঁর অপরূপ কণ্ঠ? প্রথম দুইটির উপর যদি কালের যবনিকা পড়ে গিয়ে থাকে, তবুও যন্ত্রের গুণে তাঁর কণ্ঠ তেমনি সঞ্জীবিত হয়ে রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে তাঁর আত্মপরিচয় বোধহয় তাঁর গানে। দিলীপ বলতে গান, গান বলতে দিলীপ—আমাদের এই অভিজ্ঞতা হ'ত, যখন তাঁর দেবদত্ত কণ্ঠের আলাপ শুনতাম। মায়ের অনুমতি নিয়ে তাঁর গানের আসর বসত প্রতি শনিবার তাঁরই বাড়ীতে। বেশির ভাগ সাধক সাধিকা উপস্থিত হতেন এবং উৎসুক হয়ে থাকতেন পরের শনিবারের আশায়। আন্দাজ রাত দশটায় যখন আসর ভাঙত, আমরা যেন এক আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে ঘরে ফিরতাম। স্তিমিত আলো ধূপের গন্ধে তাঁর এবং নিশিকান্ত রচিত মা ও শ্রীঅরবিন্দ এবং অন্যান্য দেবদেবীদের সম্বন্ধে অভীপ্সা ও ভক্তিমূলক গান ও প্রার্থনা, যা আমাদের সাধনার একান্ত অনুকূল, যখন তিনি তন্ময় হয়ে গাইতেন, তাঁর সুরলহরী পাখীর তানের মত—'like a lark ascending'--আমাদের সত্তাকেও যেন উর্ধ্বে তুলে নিয়ে যেত। গানের মাধ্যমে আমাদের সাধনা অনেকখানি সহজ হয়ে উঠত। অনেকে মা এবং শ্রীঅরবিন্দের —শিব কৃষ্ণ ইত্যাদি দেবতার আবির্ভাব অনুভব করতেন। এজন্য দিলীপের গান মায়ের অভিপ্রেত ছিল। এই ধরণের গানকেই বোধহয় শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঠিক গান।

এইরকম গানের আসর মাঝে মাঝে আশ্রমে মায়ের সামনে হ'ত দিনের বেলায়।

একবার ভারী মজার ব্যাপার ঘটে। দিলীপ সাহানা দেবী এবং তাঁর বোনেদের নিয়ে একটি সমবেত গানের আয়োজন করেন। মায়ের সামনে গান। আমরা স্তব্ধ হয়ে শুনছি। হঠাৎ তবলা বেজে উঠেছে আর সঙ্গে সঙ্গে এক মধ্যবয়স্ক সাধক কীর্তনের ভঙ্গিতে নাচতে শুরু করলেন। মা নীরবে তাকিয়ে। অম্বু নামে একজন সাধক নৃত্যরত সাধককে আসর থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। গান আর সেভাবে জমল না। দিলীপ একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে শ্রীঅরবিন্দকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি এই রসভঙ্গের জন্য কোনমতে দায়ী কিনা। শ্রীঅরবিন্দ কৌতুক করে উত্তর দিলেন : যদি কেউ দায়ী হয়ে থাকে, তাহলে বলব অনিলকুমার এবং তার তবলা। তবলার বোল সাধকের দেহে যে স্পন্দন জাগায় তাকে সে নৃত্যরূপ দিতে বাধ্য হয়। এটাই হোল গোলমালের মূল। সাধক ভাবল সে ভাবাবেশে নৃত্য করছে; অম্বু ভাবল সাধক তার মাথাটি এবং অন্যদের পাগুলি বুঝি ভাঙল; অন্যান্য অনেকে ভাবল সাধকের মস্তিষ্ক বিকৃতি; আবার কেউ কেউ মনে করল সে অম্বুকে মেরে ফেলেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি হৈ-চৈ না করে সবাই চুপ করে দেখত, তাহলে নৃত্য আপনি থেমে যেত। মা তাই চেয়েছিলেন।

দুতিন বছর পরে আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন নিশিকান্ত। তাঁর কাব্য প্রতিভার কথা জানতে পেরে দিলীপ তাঁকে আশ্রমভুক্ত করে নেন, মা এবং শ্রীঅরবিন্দের বিশেষ অনুমতি নিয়ে। দিনের পর দিন নিশিকান্ত কবিতা লিখে চলেন, দিলীপ সেগুলি শ্রীঅরবিন্দের কাছে পাঠান, তাঁর মতামত বহন করে তারা ফিরে আসে। কবির পূর্বজীবনের কিছু টুকরাও সেই সঙ্গে পাঠান হয়। দেখা যায় দুই রচনায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। নিশিকান্তের অন্তরে যেন হঠাৎ কোন এক সুপ্ত নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়ে গেল, যেমন হয়েছিল দিলীপের নিজের বেলায়। কবিতা যেন প্লাবনের মত নেমে এল। দিলীপের উৎসাহের আনন্দের অন্ত নেই।

দুজনের মধ্যে জমল বন্ধুত্ব এবং কাব্য নিয়ে চলল তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ছন্দের তত্ত্বালোচনা। দিলীপ মেনে নিলেন নিশিকান্তের অসমান্য প্রতিভা নিখুঁত ছন্দের কান। এবার আরম্ভ হল নানা ধরণের সৃষ্টি। দিলীপ ফরমাস দেন নিশিকান্তকে নূতন ছন্দের ছাঁচে (প্রস্বণী ছন্দ Stress rhythm, তার নাম) গান, কবিতা রচনা করতে, অথবা দ্বিজেন্দ্রলালের কোন কোন গানের অনুকরণে। ফরমাস দিতে দিতেই নিশিকান্ত গান তৈরী করে হাজির, তক্ষুনি দিলীপ সুর দিতে বসে যান আর আমরা শুনি সেসব অপূর্ব সঙ্গীত। 'এই পৃথিবীর পথের পরে' 'জ্বলবার মন্ত্র দিলে মোরে', 'কনকোজ্জ্বল সবিতাবরণী' ইত্যাদি গান আর দিলীপের সুর, এই যুগল মিলনে সংগীতের যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হ'ত তা অনির্বচনীয় এবং অভাবনীয়। শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' কাব্যের ভাষায় বলা যায়:

Music brought down celestial yearnings, song

Held the merged heart absorbed in repturous depths.

শুনেছি তাঁর ভ্রমণকালে একবার আনন্দময়ী মাকে গান শোনাতে দিলীপের খুব ইচ্ছা হয়। আনন্দময়ী মা তখন অসুস্থ। দিলীপ যে ঘরে গান গাইছিলেন তিনি তাঁর পাশের ঘরে শুয়ে। গানের মাঝখানে তিনি হঠাৎ প্রায় আলুথালু বেশে বেরিয়ে এসে সভাস্থ সকলকে উচ্চকণ্ঠে বলেন, 'দেখছ না তোমরা, ঠাকুর এসেছেন!' এমনি ছিল তাঁর গানের আহ্বান শক্তি।

যখন শ্রীঅরবিন্দ দুর্ঘটনা-জনিত কারণে শয্যাশায়ী অবস্থায় দিলীপের তখন একান্ত বাসনা হয় তাঁকে তিনি গান শোনাবেন। দিলীপের কোনও বাসনাই তো গুরু অপূর্ণ রাখেননি; তাই তিনি ও শ্রীমা রাজি হলেন। দিলীপ সাহানা ইত্যাদি এলেন। শ্রীঅরবিন্দের পাশের ঘরে বসে মায়ের সামনে তাঁরা গান করছেন। শ্রীঅরবিন্দের ঘরের দরজা খোলা, যাতে তিনি গান শুনতে পান। সেই দৃশ্যটি এখন আমার স্মৃতিপটে আঁকা। একদিকে মায়ের সামনে দিলীপের আত্মভোলা গান, অন্যদিকে শ্রীঅরবিন্দের একাগ্র শায়িত মূর্তি। তারপর যখন তিনি কলকাতায় যেতেন এবং রেডিওতে গান গাইতেন, তখন তিনি শ্রীঅরবিন্দকে অনুরোধ জানাতেন, যেন তাঁর গান শোনেন।

* * * *

এখন আসি তাঁর পত্রালাপের ইতিহাসে। আর এক অপরূপ অদ্বিতীয় কাহিনী- শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর পত্র বিনিময়। আধ্যাত্মিক ইতিহাসে গুরু শিষ্যে এইরকম পত্রালাপ আর নেই। শুধু কি তাই? অনেকের ধারণা হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দ বুঝি ব্রহ্মে বিলীন হয়ে গেছেন! ইহ জগতের কোন বিষয়ে আর তাঁর সাড়া পাওয়া যাবে না! দিলীপের অজস্র চিঠিপত্রে শ্রীঅরবিন্দের নূতন পরিচয় পেয়ে বিশ্ববাসী চমৎকৃত হল। আবিষ্কার করল শ্রীঅরবিন্দকে, পরব্রহ্মে লীন হয়েও যিনি জগৎকে ভোলেননি এবং জগতের মধ্যে দেখেছেন পরব্রহ্মের প্রকাশ।

চিঠিপত্রের আরম্ভকাল ১৯৩০ সালের কিছু পূর্বে। শ্রীঅরবিন্দ তখন নির্জন বাসে. তবে সাধক সাধিকাদের সঙ্গে পত্র ব্যবহার রেখেছেন। কিন্তু অধিকাংশ পত্রই সাধনা বিষয়ে এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক বস্তুনিষ্ঠ। দিলীপই প্রথম, যিনি এই উর্ধ্বজগৎ থেকে গুরুকে এনে উপস্থিত করলেন বিশ্বের আঙিনায়। ভৌতিক, আধি-ভৌতিক এমন কোন বস্তু নেই, যা তিনি তাঁর গুরুর সঙ্গে আলোচনা করেননি। বিষয়ের বৈচিত্র্যে, ভাবের গৌরবে, অসাধারণ পাণ্ডিত্যে, ভাষার অপূর্ব স্বচ্ছতায়, লঘু হাসির ঝলকে শ্রীঅরবিন্দের এই পত্র-সাহিত্যের সমকক্ষ কিছু আছে কিনা জানি না। মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে।

দিলীপের চিঠির সংখ্যা তাঁর মতে প্রায় চার পাঁচ হাজার এদের মধ্যে অনেকগুলি যদিও তাঁর বইতে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়েছে কিনা সন্দেহ। শুধু তাঁর 'অনামী' বইটি (বোধহয় এখন অপ্রাপ্য) পড়লেই তার যৎসামান্য আন্দাজ পাওয়া যাবে। একদিকে দিলীপের জ্ঞানপিপাসা এবং অন্যদিকে শ্রীঅরবিন্দের জ্ঞানবারিধি! রাসেল, আনাতোল ফ্রান্স, বার্নাড শ', রোম্যা রোলাঁ প্রমুখ য়ুরোপের এবং রবীন্দ্রনাথ, কৃষ্ণপ্রেম, শরৎচন্দ্র, প্রবোধ সেন, ধূর্জটি মুখোপাধ্যায়, সাহেদ সুরাবর্দি, ইত্যাদি এদেশের মনীষীদের মতামত নিয়ে গুরুর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা; তাছাড়া কাব্য, সাহিত্য, ছন্দ, বিজ্ঞান আধ্যাত্মিক বিষয় এবং দিলীপের নিজের ইংরেজী কবিতা, অন্য কবিদের ইংরেজী কবিতা ও গদ্য লেখার অনুবাদ এমনকি শরৎচন্দ্রের গোটা 'অরক্ষণীয়া' বইটির সংশোধন এ সমস্ত কাজ শ্রীঅরবিন্দ অনায়াসে করে গেছেন দিলীপের অনুরোধে। সাধনা বিষয়ে নানা সমস্যা, সন্দেহ, দ্বন্দ্ব, হতাশামূলক অসংখ্য চিঠির উত্তর তো আছেই, আরও আছে শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে ইংরেজী ছন্দের নমুনাস্বরূপ কবিতা রচনা আদায় করা।

শ্রীঅরবিন্দ আমাদের বলেছেন, দিনে রাতে আট-নয় ঘণ্টা ব্যাপী চলত তাঁর চিঠির কাজ। আমার বিশ্বাস তার মধ্যে দু ঘণ্টা অন্ততঃ ব্যয় হ'ত দিলীপের 'পোস্টের' উত্তর দিতে। তাতে আমাদের লাভ হয়েছে প্রচুর। একদিকে গুরুর অসীম জ্ঞানভাণ্ডার থেকে আমরা অজস্র মণিমুক্তা আহরণ করেছি, অন্যদিকে তাঁকে পেয়েছি অতি নিকটে। তিনি হিমালয় শিখর থেকে নেমে এসেছেন যেন আমাদের মাটিতে, আমরাও সাহস করে তাঁকে বহু প্রশ্নে জ্বালাতন করেছি এবং তিনি সহাস্যে সেসব অত্যাচার, আব্দার সহ্য করেছেন। দিলীপ যখন সেসব চিঠি পেয়ে উচ্ছ্বসিত হতেন, তখন আমাদের ডেকে সেগুলি পড়ে শুনাতেন এবং তাঁর বাইরের বন্ধুদের কাছে পাঠাতেন। এইটি লক্ষ করেছি তাঁর বিশেষ গুণ যে কোন ভাল জিনিস তিনি একা উপভোগ করতে পারতেন না।

আগেই বলেছি, এই পত্র বিনিময়ের বিশেষত্ব হল গুরুশিষ্যের মাঝে অত্যন্ত নৈকট্য বোধ। লজ্জার আব্রু, সংকোচের বন্ধন, ভয়ের কম্পন কিছুই ছিল না। গুরুকে যেমন সব দোষ ত্রুটি অপরাধ শিশুর মত খোলা মনে বলা যেত, গুরুও তেমনি মধুর সুরে হাসি ঠাট্টার ফোয়ারায় সব ত্রুটি ধুয়ে দিতেন। গুরুর এই যে স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠ এবং অবাধ স্বাধীনতা দান—এই দুই পরম অবদান দিলীপের চঞ্চল স্বেচ্ছাবিহারী মনকে কঠিন শিকড়ের নিগড়ে বেঁধে রেখেছিল আশ্রমের মাটিতে। তখন মুখে মুখে শোনা যেত, 'দিলীপের সাতখুন মাপ'। দিলীপ তাঁর বইতে *(Sri Aurobindo Came To me)* লিখছেন, 'শ্রীঅরবিন্দ আমার সঙ্গে বন্ধু ও পুত্রের মত ব্যবহার করতেন এবং নীরদের সঙ্গে পুরনো ইয়ারের মত। আমাদের কাছে তাঁর চিঠিগুলি পড়ে মনে হ'ত, পাথর-চাপা ঝরণা যেন বন্ধন মুক্ত হয়ে শতধারে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।' শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে লিখতেন, 'আমি তোমার প্রথম চিঠি পেয়েছি, এবং যেমন বরাবরের মত প্রথমেই তোমরা চিঠির খোঁজ করি, অন্যগুলি পরে পড়ার জন্য রেখে দিই, তেমনি আমার দৈনন্দিন হাঁটা এবং ধ্যান (concentration) সেরে তোমার দ্বিতীয় 'জরুরী' চিঠি কি করে পেলাম না জানি না। রাতের দিকে তোমার তৃতীয় চিঠি পাওয়ার পর আলোচ্য বিষয়টি জানলাম। যদি আগে পে তাম, তবে নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতাম। সারারাত তুমি উত্তরের অপেক্ষায় ছিলে জেনে আমি দুঃখিত।'

বিনা অপরাধে শিষ্যের কাছে গুরু দুঃখ প্রকাশ করছেন এই সম্পর্কের আমরা কি নাম দেব? মহতোমহীয়ান অণোরোণীয়ান বলব না? শ্রীঅরবিন্দের এই নম্রতার (humility) কত দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। মা বলেছেন, 'এখানে আমি কেবল একজনকে জানি যাঁকে বলা যায় নম্রতার পরাকাষ্ঠা—তিনি শ্রীঅরবিন্দ।' শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'God' কবিতায় লিখেছেন :

> **Therefore by that humility**
> **We know that thou art God.**

দিলীপের অভিমানী মন কত তুচ্ছ বিষয়ে কাতর হ'ত। শ্রীঅরবিন্দ তখন তাঁর অভিমান-ভঞ্জন করতেন, নানা উপায়ে। আমায় তিনি লিখেছিলেন : 'আমি চাই না যে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়, নইলে শান্ত করতে আমার প্রচুর সময় ব্যয় করতে হবে।'

দর্শনের সময় শ্রীঅরবিন্দের মুখে হাসির নিদর্শন পেতেন না বলে দিলীপের খেদের

সংগীত সাধক দিলীপকুমার রায়

অন্ত ছিল না। আমাদের কাছে প্রায়ই সেই ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। গুরুকেও তিনি কম উত্যক্ত করেননি। তিনি বলতেন, 'বছরে তিনবার আমরা গুরুর দর্শন পাই, কিন্তু হায় ২।১ মিনিটের জন্য। আমায় একটু সদয় দৃষ্টি দিতেন বটে কিন্তু মুখে কোনও হাসি খুঁজে পেতাম না। তাঁর মৌন গাম্ভীর্যে মন সাড়া দেয় না। চিঠিতে তাঁর এক সুর অথচ দর্শনে তিনি কত দূরে! এই বৈষম্যে আমার ব্যথা পাওয়ার কথা জানতে পেরে তিনি দর্শনের কালে হাসতে চেষ্টা করতেন কিন্তু তাতে আমার মন ভিজত না। তখন তাঁকে লিখলাম, গত দর্শনকালে আমার পশ্চাদানুগামিনী এক সাধিকা প্রায় শপথ করে বলেন, যে আপনি আমায় দেখে হেসেছিলেন, অন্ততপক্ষে আপনার ঠোঁট দুটি বাঁকা হয়েছিল। তাহলে কি আমার নিজের চক্ষুকে অবিশ্বাস করতে হবে শেষ পর্যন্ত? ইত্যাদি ইত্যাদি'...। গুরু উত্তর দিলেন, 'সাধিকা ঠিকই বলেছে আমি নিঃসন্দেহে হেসেছি, তবে সে হাসি প্রশান্ত, Tagore -হাসি নয়, গান্ধীর বালসুলভ হাসিও নয়। এখন তোমায় কথা দিচ্ছি যে ভবিষ্যতে সন্দেহাতীত হাসি হাসব।'

হাসির প্রসঙ্গ যখন এল, তখন এই পত্রালাপের মধ্যে উপভোগ্য হাস্যরসের কিছু দৃষ্টান্ত দিই। অনেকের ধারণা শ্রীঅরবিন্দ মহামৌন গম্ভীর ঋষি। সেদিন এক বিদগ্ধ সাহিত্যিক এবং সুরসিক আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'শ্রীঅরবিন্দকে আমরা মস্ত দার্শনিক, কবি, যোগী বলে জানি, কিন্তু কই, কোথাও তাঁর হাস্যরসের পরিচয় তো পাইনি, যেমন পাই রবীন্দ্রনাথে!' আমি খুব যে অবাক হলাম, তা নয়, কেননা এই অজ্ঞ অভিযোগ আগেও অনেকের কাছে শুনেছি। তাঁকে আমি প্রত্যুত্তরে *Sir Aurobindo's Humour* বইটি উপহার দিলাম. তাঁর ভুল নিমেষে ধূলিসাৎ হল তো বটেই তদুপরি তিনি বললেন, 'এটা সাধারণের জানা উচিত।' আমাদের চিঠিতে শ্রীঅরবিন্দের নির্মল, উদার হাসির প্রাচুর্য চমক ও গমক দেখে সাহস করে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই হাসির উপবন আপনার উত্তুঙ্গ নির্জন বাসরে কি করে সম্ভব হল? উত্তরে তিনি শুধু লিখলেন, 'রসো বৈ সঃ।' যাই হোক আগেই বলেছি দিলীপই আমাদের মধ্যে প্রথম, যিনি এই 'রসো বৈ সঃ'- এর উপবনের চিত্ত-বিমোহন নির্যাস লাভ করেন এবং আমাদেরও লাভের পথ সুগম করেন। তিনি বলেছেন, 'আশ্রমে আমি প্রায়ই শুনতাম শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পুরাকালের যুবক সঙ্গীদের সঙ্গে কিরকম রসিকতা করতেন, আমার প্রাণটা মাঝে মাঝে ছটফট করত তাঁর এই দিকটার পরিচয় পেতে। একদিন অভাব পূর্ণ হল; চলল তাঁর সঙ্গে অবাধ সহজ স্বচ্ছন্দ পত্রাবলী। প্রথম চিঠিটাই উল্লেখ করি, ১৯৩২ সালে লেখা। আমার মাথায় দারুণ আঘাত লেগেছে শুনে শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন, 'তোমার ঘরের দরজার উপরের কাঠে চোট লেগে মাথায় আঘাত পেয়েছ? দুঃখের কথা বটে, কিন্তু মনে রেখো আমাদের এঞ্জিনীয়ার যিনি এই দরজা তৈরী করেছেন তিনি ভুলে গেছেন যে দরজা নির্মাণ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান বিজ্ঞানসম্মত নির্ভুল হলেও, লোকগুলি এক মাপের নয় এবং তাদের সেই দরজা দিয়ে যাতায়াত করতে হবে। তুমি যদি দরজাটিকে রাসেলের বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বহির্বস্তু হিসাবে দেখ, তাহলে এতে তোমার আনন্দ পাওয়া উচিত এবং তাতে কোন ত্রুটি খুঁজে পাবে না। কিন্তু যখন কতকগুলি অবান্তর ব্যক্তিগত (Subjective) বিচার বিবেচনা নিয়ে আস, যেমন লোকের দরজা সম্বন্ধে নানা দাবি দাওয়া, চোট লেগে মাথার যন্ত্রণা ইত্যাদি

তখনই আসবে নানা আপত্তি। যাই হোক, দর্শন যাই বলুক, মা এঞ্জিনীয়ারকে বলে দেবেন কি করতে হবে (দার্শনিক উপদেশ নয়, বাস্তব উপদেশ)। তবে সান্ত্বনা স্বরূপ তোমায় বলতে পারি কি, যে, আমাদের লিলিপুট এঞ্জিনীয়ার (তিনি ছিলেন বামনাকৃতি) তাঁর নিজের আকারে সব জিনিস মেপেছেন? ভুলে গেছেন যে আশ্রমে অনেক উচ্চ এবং বিস্তৃতস্কন্ধ রয়েছে?...'

এই চিঠি পড়ে দিলীপ হেসে খুন। জমাট তুষার-গাম্ভীর্য গলে গেল হঠাৎ, দিলীপের অভীপ্সা পূর্ণ হল। তারপর থেকে বইতে লাগল শীতল স্নিগ্ধ হাসির মুক্তধারা এবং দিলীপের তৃষ্ণার্ত প্রাণ সেই ঝরণাধারা পান করে ও তাতে স্নান করে পরিতৃপ্ত হল। তিনি একদিন লিখলেন, 'ও গুরু, আমি ইদানীং ধ্যান করতে পারছি না, পর্বতপ্রমাণ প্রুফের অনুগ্রহে। কিন্তু শীগ্‌গির পাহাড়ী বাবার মত ধ্যান শুরু করে দেব। সতর্ক হোন।' গুরু ঝটিতি উত্তর পাঠালেন, 'পর্বতপ্রমাণ প্রুফের পরে পর্বতপ্রমাণ ধ্যান এবং তার শীর্ষে বাবা-স্বরূপ তুমি আসীন? বেশ, সেই দৃশ্য দর্শনার্থে আমি তৈরী।'

* * * *

আর একখানা চিঠি উদ্ধৃত করে এই রস-পর্বের সমাপ্তি টানি। দিলীপ লিখছেন, 'ও গুরু যেহেতু আমি বহুদিন যাবৎ মধ্যাকাশে ঝুলছি অথচ কোন জায়গায় নামতেই হবে, আপনি যদি অনুমোদন করেন, তাহলে আমার দীর্ঘ রোগগ্রস্ত সত্তার নিরাময়ের জন্য এই কঠোর ব্যবস্থা-পত্র করছি:

এক নম্বর: আমি চা ত্যাগ করব; চা আমি ভালবাসি।

দুই নম্বর: চীজ (cheese) ছেড়ে দেব; চীজ পছন্দ করি।

তিন নম্বর: সুস্বাস্থ্য খাবার খাব না; মাঝে মাঝে উপোস করব।

চার নম্বর: মাথায় তেল ব্যবহার করব না; মাথা মুড়াব।

পাঁচ নম্বর: বালিশ ছাড়া শোব, শুধু একটি কম্বল পেতে।

ছয় নম্বর: মশারি ছাড়া শোব; এটাই হবে ভয়ানক কঠিন। কারণ আমি কোনদিনই মশার ভনভনানিকে ঘুমপাড়ানী মাসীর গান বলে অভ্যর্থনা করতে পারিনি। কেবল বিশ্বাস করুন, যদিও আমার প্রস্তাবটি পার্লামেন্টবিগর্হিত ভাষায় পেশ করছি, যে আমার প্রাণ সত্যি ভারাক্রান্ত এবং অশ্রুজল, কারণ মুক্তির কোন হ্রস্ব পথ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। সুতরাং এই অবস্থায় মা এবং আপনি আমার প্রস্তাব অনুমোদন কিংবা সংশোধন করবেন, আশা করি।'

চিঠির তারিখ সেপ্টেম্বর ১৪, ১৯৩৫। শ্রীঅরবিন্দ অবিলম্বে উত্তর দিলেন, 'তোমার প্রস্তাবের লম্বা ফর্দ দেখে আমার চক্ষু স্থির। উপোস? এতে আমার বিশ্বাস নেই, যদিও আমি স্বয়ং উপোস করেছি। পরে তুমি সত্যি রাক্ষসের মত খেতে আরম্ভ করবে। মুণ্ডিত মস্তক? সর্বনাশ! এর ফল কি হবে ভেবে দেখেছ? ২৪শে নভেম্বর দর্শনের সময় তোমার চেহারা দেখে আমার সৌন্দর্য-প্রিয় মন নিদারুণ আঘাত পাবে। সে কথা না হয় বাদই দিলাম, যদিও সে আঘাত থেকে আমার সেরে উঠা দুষ্কর হবে, কিন্তু কুমারিকা অন্তরীপ থেকে হিমালয় অবধি যে তুমুল হৈ-চৈ পড়ে যাবে! তুমি এমন এক অভিনব উপায়ে প্রসিদ্ধি লাভ করবে যার তুলনায় তোমার পুরনো কীর্তিগুলি মনে হবে অতি ম্লান আর

যখন তুমি খ্যাতি এবং অহং থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ সেই মুহূর্তে! না, না, এই সমস্ত আধাআধি ব্যবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক। মশারী ছাড়া শোবে? তার অর্থ অনিদ্রা—যা অনাহারের সগোত্র, শুধু যে তোমার দৃষ্টি ক্ষীণ হবে তা নয়, তুমি নিজেও হবে দুর্বল, অধিকন্তু বিষণ্ণ, ফ্যাকাশে ও ভীতিজনক—তোমার সে উৎকট অতিমানসবিভীষিকা থেকেও ভয়ঙ্কর! না এবং আবার না। অন্য প্রস্তাবগুলি মায়ের কাছে উপস্থিত করতেই মা কোন কৃপাকটাক্ষ করলেন না।'

তারপরে চলল শ্রীঅরবিন্দের লম্বা ব্যাখ্যা; প্রকৃত কৃচ্ছ্রসাধন কি, তার প্রয়োজন ইত্যাদি 'লঘু গুরু' স্টাইলে একটি চমৎকার চিঠি।

আর একটি ছোট লিপি: দেওয়াসের (Dewas) মহারাজ একবার দিলীপকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করেন। গুরুদেব দিলীপকে লিখলেন: 'আশা করি তোমার ডিনার ভোজন আমার প্রথম মারাঠী রান্না আস্বাদনের অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়নি। কোন কারণে আমার ডিনার তৈরী হয়নি দেখে আমার এক প্রতিবেশী মারাঠী অধ্যাপক তাঁর বাড়ী থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসেন। আমি একগ্রাস মুখে দিই, মাত্র একগ্রাস! হায় ভগবান! মুখের ভিতরে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠলেও এমন মহাবিপ্লবজনক হ'ত না। গোটা লণ্ডন শহরকে তীব্র যন্ত্রণাদায়ক দাবানলে ধ্বংস করে ফেলার মত অবস্থা!'

এই সমস্ত চিঠি যখন দিলীপ আমাদের কাছে পড়ে শুনাতেন, তখন আমাদের কি হাসি! এই প্রসঙ্গে দিলীপ আমায় একবার বলেন, 'নীরদ, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে এরকম গুরু পেয়েছি আমরা।'

এখন মানুষ দিলীপ রায় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতেই হয়, কেননা সঙ্গীত, কাব্য, পাণ্ডিত্য ছাড়াও অনেকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন শুধু গুণে, তাঁর অগণিত গুণগ্রাহী বন্ধুগণ এ বিষয়ে সোচ্চার হয়েছেন। প্রথমেই আকৃষ্ট করে তাঁর প্রিয়দর্শন কান্তি, হাস্যোজ্জ্বল মুখ এবং ভদ্র ব্যবহার। তিনি যে সাধারণ মানুষদের অনেক উচ্চস্তরে বাস করতেন, তা এক পলকে বোঝা যেত, অথচ কাউকে তিনি উপেক্ষা করতেন না। যেখানেই সামান্য গুণের সন্ধান পেয়েছেন, তিনি সেই গুণের সমাদর করেছেন এবং সাহায্য করেছেন সাফল্যমণ্ডিত হতে। নিশিকান্তের উদাহরণ আগেই উল্লেখ করেছি; অবশ্য তিনি ছিলেন জাত কবি। কিন্তু আমরা কয়েকজন কবিতা লিখতে শিখলাম, সাহিত্যানুরাগী হলাম তাঁরই শিক্ষায়। তিনি হঠাৎ একদিন বললেন, তোমাদের ছন্দ শেখাব। তখন তিনি ছন্দ চর্চায় মশগুল। সাহানা, জ্যোর্তিমালা, আমি এবং অন্য দু'এক জনকে নিয়ে পাঠ শুরু হল। কিছুটা ছন্দ-জ্ঞান হতেই বললেন, কবিতা লেখ। সর্বনাশ! জীবনে এক পংক্তি কবিতা লিখেছি কিনা সন্দেহ। আবার সেসব কবিতা গুরুর কাছে তিনি পেশ করতেন। তাঁর প্রীতিপূর্ণ উৎসাহে এবং গুরুর প্রেরণা শক্তিতে অনেক কসরতের পর সত্যি কবিতার উৎস খুলে গেল এবং যেসব কবিতা আমাদের কলম দিয়ে বের হতে লাগল, সেগুলি হয়ে গেল প্রায় 'গুরু মারা বিদ্যা' অর্থাৎ মিস্টিক কবিতা। দিলীপ সেসব কবিতার কোন রসই আস্বাদন করতে পারতেন না, যার জন্য Yeats-এর চেয়ে A.E. -র কবিতা তাঁকে বেশি দোলা দিত। অবস্থা যখন এরকম, তখন স্বয়ং শ্রীগুরু এসে আমাদের হাল ধরলেন, কিন্তু প্রথম হাতেখড়ি দানের কৃতিত্ব দিলীপেরই

প্রাপ্য।

বাইরের জগতেও যেখানে কবি ও লেখকদের মধ্যে প্রতিশ্রুতির সন্ধান পেয়েছেন, সেখানেই তাঁর প্রসারিত হস্তের দান বর্ষিত হয়েছে। বুদ্ধদেবের কবিতা 'বন্দীর বন্দনা' শ্রীঅরবিন্দের প্রশংসা-লাভে ধন্য হয়েছে তাঁরই দৌলতে। হারীন্দ্রনাথ আশ্রমে স্থান পেলেন এবং শ্রীঅরবিন্দের শক্তিতে অদ্ভুত কবিতা রচনা করলেন, তারও মূলে দিলীপ। আর বাড়াবার প্রয়োজন নেই।

একবার ঠিক হল আমরা কয়েকজন মিলে লেক-এ বেড়াতে যাব এবং সেখানে রন্ধন ও ভোজন হবে। নিশিকান্ত রসুয়ে। লেক আশ্রম থেকে ৭/৮ মাইল দূরে। সন্ধ্যা বেলায় ট্রেনে রওনা হলাম এবং পৌঁছেই চারিদিকে ঘুরতে লাগলাম। অপূর্ব দৃশ্য! উপরে এক ফালি চাঁদ, নীচে নীরব নিস্তব্ধ বনানী, শান্ত বিশাল হ্রদ, পাখীর কূজন, অজানা ফুলের সুবাস আমাদের কবিমনকে মুগ্ধ করল—স্মরণ করিয়ে দিল কবি Yeats-এর 'Lake Isle of Innisfree'. কবিতার কথা। কেবল আসল-কবি নিশিকান্ত তরিতরকারি ইত্যাদি নিয়ে ডাকবাংলোয় রান্নায় মেতে গেলেন। তিনি যে ভোজন-বিলাসী এখবর সুবিদিত। ঘন্টা দুয়েক পর যখন ডাক পড়ল, দেখি, এলাহি কাণ্ড! কবি নিশিকান্তের স্বহস্ত-রচিত প্রত্যেকটি পদ যেন তার এক একটি চমৎকার কবিতা! ভূরিভোজনান্তে অবস্থা কাহিল। অজগরের মত আমরা অনড়! প্রায় একঘন্টা বিশ্রাম করে রওনা হলাম পদব্রজে, কারণ তখন গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। হেলে দুলে গানেগল্পে কচ্ছপগমনে মাঝপথে এসে আর পা চলে না। একটি মাঠে আবার বিশ্রাম। তারপর মন্থর গতিতে স্ব স্ব ডেরায় আশ্রয় এবং নির্দোষ নিদ্রা। দিলীপের এই একটি সঙ্গ অবিস্মরণীয়! আশ্চর্যের বিষয়, অতি রাজসিক ভোগের পর ফিরে এসেই নিশিকান্ত হ্রদের উপরে যে দুচারটি মিস্টিক কবিতা লিখলেন তার উচ্চ প্রশংসা করলেন শ্রীঅরবিন্দ। নিশিকান্তের এই রকম অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় পরেও পেয়েছি। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, কি অলৌকিক উপায়ে এটা সম্ভব হ'ত। আমার ধারণা, রাজসিক বিলাসের পর মানুষের চেতনা নিম্নমুখীই হয়। কিন্তু নিশিকান্তের বেলায় দেখি তার বিপরীত। না হলে তাঁর পক্ষে এত উচ্চাঙ্গের কবিতা লেখা সম্ভব হয় কি করে? অথবা, জাপানীদের চিন্তাকেন্দ্র যেমন পাকস্থলীতে নিশিকান্তের প্রেরণাস্থলও কি তাই, এবং সেই কারণেই কি তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় বর্ণাঢ্য চিত্রের প্রাচুর্য? ছন্দের ধ্বনির তরঙ্গ আমাদের solar plexsus -এ গিয়ে সোজা আঘাত করে?

*   *   *   *

এবারে দিলীপের কাব্যচর্চা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একথা অবিদিত নয় যে শ্রীঅরবিন্দের যোগ-শক্তির স্পর্শে নিশিকান্তের মত দিলীপেরও কাব্য প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছে। তবে নিশিকান্ত ছিলেন জন্মকবি এবং শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে তিনি রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি পেয়েছেন, যদিও আশ্রম যুগের কাব্যের সঙ্গে তখনকার কবিতার কোন তুলনাই হয় না। কিন্তু দিলীপের বেলায় তার বিপরীত। তিনি কবি তো ছিলেন না, ছন্দও জানতেন না। তিনি বলছেন: 'আমি যখন আশ্রমে আসি, গুরুদেব এবং মা বললেন যে, যোগশক্তির দ্বারা অনেক কিছু অঘটন

ঘটে, যেমন, রাতারাতি নিখুঁত ছন্দজ্ঞান লাভ করা যায়। শুনে আমি উৎফুল্ল হলাম এবং প্রার্থনা করতে লাগলাম যেন আমি কবি হতে পারি।' গুরুর শক্তিতে এবং তাঁর নিজের আন্তরিক প্রয়াসে তিনি ছান্দসিক ও কবিখ্যাতি লাভ করেন। সেই অলৌকিক পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত বিস্মিত করে।

বাংলা ছন্দে পারদর্শিতা অর্জন করে তাঁর অভিলাষ হল ইংরেজীতে কবিতা রচনা করা এবং ইংরেজী ছন্দে ব্যুৎপত্তি অর্জন করা। তিনি গুরুর শরণাপন্ন হলেন। এবার শুধু যোগ-শক্তি নয়, গুরুর অসাধারণ ছন্দ-জ্ঞান দিলীপকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলল, ইংরেজী ছন্দে কাব্য রচনায় সিদ্ধকাম হ'তে সাহায্য করল। একেবারে ছন্দের অ আ থেকে তিনি পাঠ শুরু করেন। মজার এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে শ্রীঅরবিন্দ ছন্দের দৃষ্টান্ত স্বরূপ পলকে নানা প্রকার কবিতা রচনা করে দিলীপকে পাঠাতেন এবং সেই নমুনাকবিতাগুলিও কবিতা হিসাবে কত সুন্দর হ'ত তা বলার অপক্ষা রাখে না। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে দিলীপ যখন ইংরেজী ছন্দের নানা বৈচিত্র্য বাংলা ছন্দে আরোপের চেষ্টা করলেন, তখন শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্য নিজে বাংলা ছন্দের অনুরূপ ছোট ছোট ইংরেজী কবিতা লিখে পাঠাতেন। 'তারপর' দিলীপ বলছেন, 'নিশিকান্ত যখন এলেন, তাঁর সাহায্যে দিনের পর দিন ইংরেজী ছন্দের অনুকরণে বাংলা ছন্দ রচনা করে আমরা দুজনে পাঠাতাম। শ্রীঅরবিন্দ আবার সেই ছন্দে ইংরেজী কবিতা লিখে দিতেন। একবার নিশিকান্ত একটি বাংলা কবিতা লিখলেন ইংরেজীর হ্রস্ব হ্রস্ব দীর্ঘ। হ্রস্ব হ্রস্ব দীর্ঘ... দীর্ঘ হ্রস্ব হ্রস্ব। দীর্ঘ ইত্যাদি এই ছন্দের দোলায়। শ্রীঅরবিন্দ তার অনুসরণে লিখলেন:

To the hill-tops of silence from over the infinite sea
Golden he came.... ইত্যাদি।

মাঝে মাঝে তিনি বলতেন যে, নিশিকান্তের ছন্দের দোলা ইংরেজীতে আনা কঠিন। দুঃখের বিষয় আমি এখানে দৃষ্টান্তগুলি উল্লেখ করতে পারলাম না। নিশিকান্তকে কাব্য-সহচর পেয়ে দিলীপের যে কত সুবিধা এবং উপকার হয়েছিল এবং নিশিকান্ত যে কত বড় কবি ছিলেন তার একটা নমুনা পাওয়া যেত। কিন্তু সর্বোপরি দিলীপ প্রশ্ন তুলেছেন: 'শ্রীঅরবিন্দ কি কারণে এতখানি অনুরাগ দেখালেন এবং তাঁর অমূল্য সময় ব্যয় করলেন, শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই নয় আরও দুচারজন যাঁরা কাব্যচর্চা করেছেন তাঁদের ক্ষেত্রেও; অথচ এর চেয়ে ঢের বেশি আপাতগুরুতর বিষয়ে তিনি কোনমতে সাড়া দেননি। এর কোন সুদস্তুর নেই। যেমন, প্রমথ চৌধুরী *The Golden Book of Tagore* সঙ্কলনকালে শ্রীঅরবিন্দের কাছে একটি রচনা প্রার্থী হন। আমি তাঁকে কত অনুনয় বিনয় করলাম, কিন্তু টলাতে পারলাম না। তিনি উত্তর দিলেন, 'প্রমথ চৌধুরী আমার কাছে যা চাইছেন তা পূর্ণ করা আমার মনের দিক থেকে অসম্ভব। তুমি জান যে আমি নিয়ম করেছি যে কোন কিছু প্রকাশের উদ্দেশ্যে লিখব না, প্রেস মঞ্চ এবং জনসাধারণের কাছ থেকে আমি স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হয়েছি।' এ নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের সহানুভূতির অভাববশত নয়, কেননা, একবার যখন আমি রবীন্দ্রনাথকে কোন প্রসঙ্গে আক্রমণ করতে উদ্যত হই, তিনি প্রায় মায়ের মত কোমল সুরে আমাকে নিরস্ত করেন এবং বলেন,

... 'আমাদের একই গন্তব্য স্থল, তবে রবীন্দ্রনাথ চলেছেন তাঁর নিজস্ব পথে। আশা করি তাঁকে কেউ আঘাত দেবে না। তাছাড়া, তাঁর দীর্ঘ জীবন কেটেছে অতি উজ্জ্বলভাবে— তাঁর অস্তরবিও যাতে শান্তিতে এবং সুষ্ঠুরূপে বিদায় নেয়—এই আমার ইচ্ছা।'

এখন কেউ কেউ জানতে চাইবেন দিলীপের আধ্যাত্মিক জীবন অর্থাৎ সাধনার কথা। এ পর্যন্ত যা বলেছি তাকে বলা যায় সাধনার বহিরঙ্গের কথা, সাধনার অন্তরঙ্গ কথা অর্থাৎ যাকে বলা যায় অন্তর্জীবন, সে সম্বন্ধে কিছু বলার আমার কোন অধিকার নেই। কেননা প্রত্যেকের সাধনার জীবন অত্যন্ত ব্যক্তিগত এবং গুহ্য। সেই কারণেই আমি মায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিনি, যেহেতু তিনিই আমাদের সাধনার গুরু। তাছাড়া দিলীপ সম্বন্ধে আমার এই কাহিনী প্রধানতঃ নিজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। এখানে তাঁর সাধনা সম্বন্ধে যৎসামান্য যা আমি জেনেছি, দেখেছি এবং তাঁর বইতে পড়েছি, তারই কিছু আভাস দেব।

প্রথমতঃ, পূর্বে উল্লেখ করেছি তাঁর গান, কবিতা, কথাবার্তার ভিতর দিয়ে ফুটে উঠত তাঁর আত্মার স্পর্শ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে অবিশ্বাস ও সংশয়ের (doubt) দোলায় দুলেছেন তার পরিচয়ও বিরল নয়। বস্তুতঃ আমরা দুইজনেই এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগেছি এবং দুজনেই সমব্যথী। অবশ্য দিলীপের সাগর-প্রমাণ বিক্ষোভের সঙ্গে আমার নদী-প্রমাণ ক্ষোভের তুলনা হয় না। এই সংশয় যাকে মা বিষ নামে অভিহিত করেছেন, সেটাই ছিল দিলীপের বিপুল বাধা। অন্যদিকে তিনি ছিলেন ভয়ানক অভিমানী। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় 'Spoilt child'। কোন্ তুচ্ছ জিনিস যে 'পলকেতে হয় অতিকায়' (দিলীপের নিজের কবিতা) বলা শক্ত ছিল। এই সম্পর্কে তাঁর *Sri Aurobindo Came to Me* বইতে তিনি লিখছেন, তাঁর প্রথম গুরুতর 'আক্রমণ' আসে ১৯৩০ সালে যখন হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, বরং তিনি অনুমান করলেন বলাই ঠিক, —মা যেন তাঁর প্রতি উদাসীন। মা তাঁর যোগে সাফল্য সম্বন্ধে যেন হতাশ হয়েছেন। তিনি ঠিক করলেন, গান্ধীর দণ্ডী লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেবেন। তিনি নিজেই স্বীকার করলেন যে এটা নেহাৎ পাগলের মত্ততা, তবুও তিনি তাঁকে বরণ করে নিলেন। গুরুর লম্বা চিঠি তাঁকে নিরস্ত করল, বিশেষ করে তাঁর শেষ লাইনটি: 'মন ভাবে, প্রাণ হা-হুতাশ করে কিন্তু আত্মা জানে এবং অনুভব করে যে ভগবান আছেন।'

'এই বাক্যটি পড়ে আমি আনন্দে শিহরে উঠলাম এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলাম,' লিখছেন দিলীপ।

এই রকম বহু 'আক্রমণ' তাঁকে বিপর্যস্ত করেছে। আর একবার যখন তিনি প্রায় চলে যাবার উপক্রম করছেন, তখন গুরু নিক্ষেপ করলেন ব্রহ্মাস্ত্র, 'তোমার উপর ভগবানের এবং মায়ের ও আমার অধিকার। আমরা আমাদের অকৃপণ স্নেহ ও যত্ন ঢেলে দিয়েছি। তোমায় আমি আমার পুত্র এবং বন্ধুর মত পোষণ করেছি। তোমার যোগের উন্নতিকল্পে ও তোমার নানা গুণের বিকাশ উপলক্ষে অকুণ্ঠভাবে আমার শক্তি ব্যয় করেছি। আমাদের অধিকার আছে তোমাকে আমাদেরই একান্ত বলে ধরে রাখতে।'

আর একবার আক্রমণ করলেন তিনি এই অভিযোগ জানিয়ে যে গুরুর পক্ষে

আমাদের মত সাধারণ লোকের কষ্ট, বাধা বিপত্তি, সন্দেহ ইত্যাদি বোঝা সহজ নয়। গুরু বড় বড় ডাক্তারের মত দামী ওষুধের ফর্দ দেন, ভুলে যান রোগী কপর্দকহীন,— ইত্যাদি ইত্যাদি....। উত্তরে গুরু যে চিঠি লিখলেন, তা একখানি মহার্ঘ সম্পদ: 'আমি কখনও বলিনি যে সংশয়মুক্ত হওয়া সহজ...আমি যদি মানুষের কঠিন বাধা বিপত্তির কথা না জানতাম এবং সেগুলো সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করতাম, তাহলে কি করে বছরের পর বছর তোমার সংশয় সম্বন্ধে ধৈর্য করে যুক্তি তর্ক করেছি? এতখানি সময় ব্যয় করে, তোমাকে বুঝতে চেষ্টা করেছি যুক্তি দিয়ে, আমার দীর্ঘ এবং নিঃসংশয় অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানের আলো দান করে? এই সমস্ত চিঠিগুলি প্রতিরাত্রে তোমায় লিখছি কেন? তোমার সংশয় এবং কঠিন বাধার প্রতি আমি সহানুভূতিশীল নই বলে? এই যে মেয়েগুলি কথায় কথায় অনশন ধর্মঘট গ্রহণ করে এবং প্রতিপদে আত্মহত্যার ভয় দেখায়, তাদের কেন সহ্য করি এবং সান্ত্বনাপূর্ণ ও উৎসাহজনক চিঠি লিখি? কেন সাধকদের ঝগড়া, হাতাহাতি, উপদ্রব, অবাধ্যতা, নিন্দা, কঠিন সমালোচনা সহ্য করি? কেন ক, খ-এর মত লোকদের প্রতি এতখানি ধৈর্য দেখিয়েছি? মনুষ্যপ্রকৃতির বাধাবিঘ্ন সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান ও সহানভূতি নেই বলে? সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে যে শ্রদ্ধা চাই এবং সংশয় বর্জনীয়—এই কথা জোর দিয়ে বলি সেই জন্য, কিন্তু কোন্ সত্যাশ্রয়ী গুরু তা করবে না?' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই একটি মাত্র চিঠিতেই একদিকে দিলীপ এবং অন্যান্য শিষ্যদের প্রকৃতি ও অন্যদিকে তাদের মঙ্গলার্থে গুরুর অসাধারণ সহ্যশক্তি, রাগদ্বেষদ্বন্দ্বহীন কৃপার শীতল ও নির্মল অভিব্যক্তি চমৎকার! এমনও দেখা গেছে যে দিলীপ একান্ত অসহিষ্ণু হয়ে গান বাজনা কবিতা রচনা ইত্যাদি ত্যাগ করে হঠাৎ তাঁর দরজা জানালা বন্ধ করে নির্জনতা ব্রত গ্রহণ করেছেন। বাড়ীর দরজায় নোটিশ 'No visitor'

আমরা পরস্পরে বলাবলি করি, 'আবার বৈরাগ্য!'

'গান বাজনা ইত্যাদি করে যদি ভগবান লাভ হত, তাহলে আমার এই দুর্দশা কেন?'—এই তাঁর যুক্তি। কঠোর তপস্যা করে ভগবানকে যথাশীঘ্র পাওয়ার জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি' যে তাঁর পরধর্ম এটা তিনি বুঝতেন না। যিনি প্রকৃতিতে সদানন্দ পুরুষ, বৈরাগ্য তাঁকে মানাবে কেন? তপস্যার শেষে যখন আশুফললাভের কোনও লক্ষণ দেখা যেত না, তখন তিনি বলতেন, 'গান বাজনা করলেই আমি ভাল থাকি, মাঝে মাঝে কেন যে ভূতে পায়!' শ্রীঅরবিন্দও তাঁকে বহুবার একথা বলেছেন; আরও বলেছেন যে তাঁর সত্তার কোথাও বৈরাগ্যের প্রতি একটা টান আছে, সেটি মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। তেমনি আছে বৈষ্ণব পন্থার প্রতি আকর্ষণ যে কারণে তিনি গেরুয়া রঙের কাপড়চোপড় রুদ্রাক্ষের মালাও পরতেন। কৃষ্ণের প্রতি তাঁর টান বোধহয় এই একই কারণে।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে বলেছিলেন, এমনকি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যে, তিনি যদি গুরুর নির্দেশানুসারে চলেন গুরুই তাঁকে কৃষ্ণলাভ করিয়ে দেবেন।

এমনি করে ভেসে চলেছিল আমাদের দিনগুলি এই সহজ সাধনায় বা Sunlit Path-এ। হঠাৎ নেমে এল ঘন অন্ধকার! শ্রীঅরবিন্দ মধ্যরাত্রে নিজের ঘরে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেললেন। বজ্রপাতের মত আমাদের পৃথিবীর শিরায় শিরায় বয়ে গেল প্রবল শিহরণ। দিলীপের আসর ভেঙে গেল, আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম; সর্বোপরি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পত্র বিনিময় বন্ধ হয়ে গেল যা ছিল দিলীপের সাধনার প্রধান অবলম্বন। যাই হোক ধীরে ধীরে সকলে আঘাত সামলে নিল। প্রায় মাস খানেক পরে শ্রীঅরবিন্দ যখন কিছুটা সুস্থ হলেন এবং তাঁর সেবকদের সঙ্গে প্রত্যেকদিন অল্পসময়ের জন্য কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন, তখন তাঁর বিরাট সান্নিধ্য, স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর এবং নির্মল ও বিদগ্ধ হাস্য-কৌতুক পরিবেশন একটি পরম আশীর্বাদের মত এল। আনন্দে বিস্ময়ে আমরা অভিভূত হলাম। গুরুর নৈর্ব্যক্তিক সংযত ইংরেজী কথাবার্তা ও হাস্যরস আমি বিলিয়ে দিতাম দিলীপের সকাল বেলার চা-এর টেবিলে। তিনি এবং অন্যান্য কয়েকজন বন্ধু আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকতেন। বকুলগাছের ছায়া-সুরভিত তাঁর প্রশস্ত বারান্দায় বসত বৈঠক, কি হাসির ছড়া! রাস্তার লোকজন অবাক হয়ে শুনত, আশ্রমে রটনা হয়ে গিয়েছিল আমাদের এই রসের আলাপন। দিলীপ আমায় এবং সকলকে প্রতিদানে আপ্যায়িত করতেন হল্যান্ডের উৎকৃষ্ট চীজ, দার্জিলিং-এর চা এবং অন্যান্য অনুপান দিয়ে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে সেই পরম আনন্দময় দিনের কথাবার্তাগুলি আমি লিখে রাখতে পারিনি আমার কাজের চাপে। যদি বলি যে, এটাও ছিল আমাদের সাধনার অঙ্গ, হয়তো অনেকে আপত্তি তুলবেন। কিন্তু 'তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে'—গুরুকে নিয়েই তো আমাদের এত উচ্ছলতা।

এই হাসির হাটও আস্তে আস্তে ভেঙে গেল। দিলীপের সৃষ্টি ও সাধনা এগিয়ে চলে। আমি অবসর মত তাঁর গানের আসরে উপস্থিত হতাম, কিন্তু সেই অপূর্ব সরসতা যেন আর পেতাম না। কারণ, হয় আমার ভিতরে কোন পরিবর্তন নয়তো গুরুর বাহ্য অন্তরঙ্গতা হারিয়ে দিলীপের অন্তরে পরিবর্তন—কোন্‌টা জানি না। তবে সাধারণ পত্রালাপ বন্ধ হলেও কয়েক মাস পরে শ্রীঅরবিন্দ যে দু'এক জনের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম করেছিলেন, দিলীপ তাদের মধ্যে একজন। তিনি মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন এবং উত্তরও পেতেন, কিন্তু পূর্বের তুলনায় সেগুলি আর কতটুকু। তাদের পরিসরই বা কতখানি? পরে শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টি হ্রাসের দরুণ সে উত্তরও আসত অন্যের মুখে ও হস্তাক্ষরে। আমার বিশ্বাস এতে দিলীপ যথেষ্ট মানসিক কষ্ট ভোগ করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের স্পর্শ লাভ না হলে তাঁর চলত না; সেই উদ্দেশ্যে একবার তিনি শ্রীঅরবিন্দের অনুমতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রায় একঘন্টাকাল তাঁদের কথাবার্তা চলে। ১৯২৪ সালের পরে এই দ্বিতীয়বার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে তাঁর কাব্যপাঠ করে শোনান। মুগ্ধ ও উচ্ছ্বসিত হয়ে এমনকি নূতন জীবন নিয়ে দিলীপ ফিরে আসেন। এইভাবে তিনি কোন না কোন সূত্রে যোগাযোগ রেখেছিলেন। কিন্তু যা যায় তা আর ফিরে আসেন না। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বিরল হয়ে ওঠে। কেবল কাজের সূত্রে যখন ডাক পড়ত, আমি গিয়ে উপস্থিত হতাম। শুনতাম তিনি সর্বদা ব্যস্ত। তাঁর বাড়ীতে প্রায়ই অতিথি সমাগত হত। তাঁর অজস্র প্রাণশক্তি নানাদিকে ব্যয় করেও যথেষ্ট উদ্বৃত্ত

থাকত। একটি মজার ঘটনা মনে পড়ছে। দিলীপ তাঁর বন্ধুবান্ধব বেষ্টিত হয়ে গল্প করছেন। তাঁদের মধ্যে একজন সদ্যাগত যুবক সাহিত্যিক, দিলীপের বিশেষ ভক্ত, কিন্তু ভক্তের স্বাস্থ্য নড়বড়ে। ভক্তটি গুরুর কাছে প্রেরণা চেয়েছেন যাতে তার সাহিত্যিক উন্নতি হয়। গুরু তাঁর সম্বন্ধে কিছু তথ্য যোগাড় করে আনতে আমায় পাঠালেন, দিলীপের কাছে। দিলীপ তথ্য সরবরাহ করলেন, কিন্তু হেসে বললেন, 'নীরদ, গুরুকে বলো, তিনি যেন শক্তি দেন তার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সাহিত্যের জন্য নয়।' পরের বার গিয়ে শুনলাম সাহিত্যিক বেশ উৎসাহ সহকারে রান্না-বান্না করছে। গুরু শুনে সকৌতুকে বললেন, 'তাহলে তো আমার শক্তি ঠিক দিকেই কাজ করছে!' এই খবর শুনে দিলীপের এবং অন্যদের কি হাসি!

ইতিমধ্যে তিনি রমণ আশ্রম, রামদাসের আশ্রম দেখে আসেন; গানের উদ্দেশ্যে এবং আশ্রমের সাহায্যকল্পে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলকাতায়ও যাওয়া আসা করেন এবং সর্বদা শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পত্রযোগাযোগ রাখেন। আবার আশ্রমে ফিরে এসে পূর্ণোদ্যমে চালান তাঁর শিল্পচর্চা। তাঁর অজস্র প্রাণশক্তি প্রবাহিত হ'ত অতিথিদের সঙ্গে কথাবার্তায়, গানে, সাহিত্যে, কবিতা রচনা ইত্যাদি বহুমুখী কর্মধারায়। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন অবশ্য তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রথম এবং প্রধান পাঠক। 'সাবিত্রী' কাব্য যখন প্রকাশিত হল, দিলীপের কবি-হৃদয় আনন্দে মাতোয়ারা হল, একটি সম্পূর্ণ পর্ব তিনি ছন্দে অনুবাদই করে ফেললেন। গুরু সেটি শুনে বললেন, 'চমৎকার'! তাঁর ইংরেজী কবিতাগুলি শুনেও বলতেন যে, তাঁর খুব উন্নতি হচ্ছে। সুতরাং তাঁর অন্তরে দুঃখ যতই থাক, বাইরের সৃজনী শক্তির আনন্দ ছিল অপ্রতিহত। মাঝে মাঝে কোন সামান্য অজুহাতে তাঁর সেই অবচেতন অভিমান প্রায় এটম বোমার মত ফেটে পড়ত। তখন গুরুকে সেই বিস্ফোরণের দাহ শীতল করতে বেশ বেগ পেতে হ'ত। চিঠির পর চিঠি পাঠিয়ে তবে তিনি নিস্তার পেতেন। দিলীপের বই থেকে এই বিস্ফোরণের একটি নিদর্শন সংক্ষিপ্ত আকারে দিচ্ছি। গত যুদ্ধের সময় বাইরের অনেক সাধক সাধিকা যখন তাদের সন্তানসন্ততিসহ আশ্রমে এলেন, মা তাদের আশ্রয় দিতে বাধ্য হলেন। ফলে আশ্রমের পুরনো চেহারাই বদলে গেল। শিক্ষাদীক্ষা, শরীর চর্চা, খেলাধুলা, ইত্যাদির আয়োজন উপলক্ষে মাকে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হ'ল সেগুলির পিছনে। মা *Bulletin of Physical Education* নামে একটি অতি মনোরম কাগজ বের করলেন এবং শ্রীঅরবিন্দ তাতে শরীর চর্চার ও সেই প্রসঙ্গে খেলাধুলার উপকারিতা সম্বন্ধে অনবদ্য ভাষায় অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখলেন। কি কারণে হঠাৎ দিলীপের মতিভ্রম হল; তিনি অত্যন্ত উষ্মা সহকারে মায়ের বিরুদ্ধে শ্রীঅরবিন্দের কাছে নালিশ পাঠালেন। দিলীপের নিজের কথায় : 'আমি বরাবর খেলাধূলার ভক্ত হয়েও কি করে এমন মতিচ্ছন্ন হলাম জানি না। মায়ের কাছে আমি সর্বতোভাবে এত ঋণী, যিনি আমার প্রতি ভুলেও কটুবাক্য ব্যবহার করেননি, যিনি করুণার মাতৃমূর্তি তাঁর সম্বন্ধেই কঠোরনিয়মপালিকা, পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ইত্যাদি মিথ্যা অভিযোগ করে লম্বা লম্বা চিঠি পাঠালাম শ্রীঅরবিন্দের কাছে। কি করে এটা সম্ভব হল? নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাব আমায় বিভ্রান্ত করেছে। মায়ের বিরুদ্ধে নালিশ আমি বহু করেছি কিন্তু এবার যেন

সব মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। আসলে যতই ছেলেদের এবং খেলোয়াড়দের দিকে মায়ের আকর্ষণ বাড়বে ততই আমাদের মত বয়স্কদের এবং (যারা খেলোয়াড় নয়, তাদের) অ-খেলোয়াড়দের প্রতি তাঁর আকর্ষণ কমতে থাকবে—এই ছিল আমার এবং অন্যান্যদের ভয়। আমি তাদের মুখপাত্র হয়ে এমন বোকামি করে বসলাম! কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তাঁর স্বভাব-শান্ত সুরে কোথায় কোথায় আমার ভুল হয়েছে দেখিয়ে দিলেন, বারো পৃষ্ঠা লম্বা চিঠি পাঠিয়ে আমার সমস্ত কুযুক্তি তিনি খণ্ডন করলেন এবং দেখালেন, মায়ের সম্বন্ধে আমার অভিযোগ কেমন অসার। শুধু যুক্তির বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তিই নয়, আমার উগ্রতা, হঠকারিতা, ইত্যাদি বদস্বভাব তাঁর করুণাধারায় ধুইয়ে দিয়ে আবার আমায় কাছে টেনে আনলেন। তাঁর লম্বা চিঠি শেষ করলেন হৃদয়দ্রাবী অমৃত বর্ষণ করে: 'তুমি বরাবরই গুরুবাদে বিশ্বাস করে এসেছ। তাই তোমায় বলছি গুরুর উপর বিশ্বাস রাখো এবং ভগবানের উপর নির্ভর করো সিদ্ধির জন্য। আমার অবিচল ভালবাসা ও স্নেহ, মায়ের স্নেহ ও দিব্য শুভেচ্ছা দয়া দাক্ষিণ্যের উপর বিশ্বাস রাখো। সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়াও। তোমার সাধনার লক্ষ্য এবং যিনি তাঁর স্পর্শে সর্বসিদ্ধি ও সর্বতুষ্টি দান করেন., সেই সর্বানন্দময় ঈশ্বরের অভিমুখে অধ্যবসায় সহকারে এগিয়ে যাও।'

দিলীপ বলছেন যে, 'গুরু এত বছর ধরে যতগুলি চিঠি তাঁকে লিখেছেন, সেগুলির মধ্যে খেলাধূলার সম্বন্ধে তাঁর সাম্প্রতিক তিন চারখানা চিঠির সুর অতুলনীয়, অপরূপ নম্রতার পরাকাষ্ঠা।'

এই সময়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে—দিলীপকে ইন্দিরার গুরুকরণ। ইন্দিরা দিলীপের বাড়িতে অতিথি হয়ে আসেন এবং ক্রমশ তাঁর একান্ত অনুরক্ত হয়ে পড়েন; এমনকি তাঁকে শিষ্যা হিসাবে গ্রহণ করবার জন্য দিলীপকে প্রায় জোর-জবরদস্তি করেন। দিলীপ সে আবেদন গুরুর কাছে নিবেদন করেন এবং বলেন যে, তাঁর নিজের গুরু হবার কোন ইচ্ছা নেই কিন্তু ইন্দিরা নাছোড়বান্দা। একমাত্র গুরুই এই সংকট থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে পারেন; অন্ততঃপক্ষে গুরুর মতামত তিনি জানতে চান। বিস্ময়ের কথা যে গুরু বিনা দ্বিধায় সম্মতি দিলেন। দিলীপ অবাক, আমরাও তাই। সন্দেহ ভঞ্জন করবার জন্য দিলীপ আবার গুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন। একই উত্তর, স্পষ্ট জবাব: ইন্দিরাকে শিষ্যা হিসাবে গ্রহণ করো, আমার আশীর্বাদ রইল। অগত্যা দিলীপ গুরু হলেন। সেই শিষ্যার যখন ১৯৪৯ সালে অসুখে মরণাপন্ন অবস্থা, মা ও গুরুর অনুমতি নিয়ে তিনি ডিসেম্বরে ইন্দিরাকে দেখতে গেলেন। ইন্দিরা শয্যাশায়ী, পাশ-ফেরা পর্যন্ত কঠিন। রক্তবমি চলেছে অনেকদিন ধরে। এক কথায় বাঁচার কোন আশা নেই। বড় বড় ডাক্তার রায় দিয়েছেন। রোগী সমস্ত চিকিৎসা বন্ধ করে দিয়ে শ্রীঅরবিন্দের শরণ নিয়েছেন। তিনি যদি বাঁচান তো বাঁচবেন। দিলীপ পৌঁছনো-মাত্র শ্রীঅরবিন্দকে ঘন ঘন পত্র ও টেলিগ্রাম করে তাঁর সংকটজনক অবস্থা জানাতে লাগলেন। আশ্চর্য এবং অবিশ্বাস্যভাবে ইন্দিরা ধীরে ধীরে সেরে উঠলেন। দিলীপের সংশয়ী মন স্বীকার করল যে গুরুর শক্তি মস্ত miracle ঘটিয়েছে। যে দিলীপের সঙ্গে ১৯৩৪/৩৫ সালের দিকে আমার ঘোরতর

তর্ক হয় যোগশক্তির রোগ সারাবার ক্ষমতা নিয়ে, সেই অবিশ্বাসী দিলীপ স্বচক্ষে প্রমাণ পেলেন যে যোগশক্তি নেহাৎ 'কল্পনা কথন' নয়। এই ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে আমার Twelve Years with Sri Aurobindo বই-এ। শ্রীঅরবিন্দের যত্ন, উৎকণ্ঠা, আগ্রহ দেখে আমি নিজে বিস্মিত হয়েছি। খবর আসতে যখন দেরী হ'ত, তিনি যেন একটু অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা করতেন খবর আসেনি? কেন? খবর না এলে আমি রোগ সারাব কি করে?

এই হল দিলীপের সাধনার বহির্জীবনের মোটামুটি একটি ছবি শ্রীঅরবিন্দের দুর্ঘটনার অন্তবর্তী সময়ে; বাইরের দিক দিয়ে গান, লেখা, লোকজন বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে কথাবার্তা, মাঝে মাঝে কলকাতা ও অন্যান্য জায়গায় ভ্রমণ—এইভাবে চলছিল প্রফুল্ল হাস্যমুখর দিনগুলি। ইতিমধ্যে নিয়তি অলক্ষ্যে কি নির্মম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কেউ জানত না, আভাসেও নয়। ১৯৫০ সালের শেষের দিকে শ্রীঅরবিন্দ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুখ ক্রমশ গুরুতর রূপ ধারণ করে। সেই সময় দিলীপ বাইরে ভ্রমণে, তাঁকে খবর দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠেনি। ডিসেম্বর মাসে যখন শ্রীঅরবিন্দ মহসমাধি লাভ করলেন, দিলীপ কাশীতে অরবিন্দ বসুর কাছে সেই সংবাদ শুনতে পেয়ে এরোপ্লেনে তাড়াতাড়ি আশ্রমে ফিরে আসেন বোধহয় সমাধি লাভের দ্বিতীয় দিনে। তখন শ্রীঅরবিন্দের মহানিদ্রামগ্ন স্বর্ণাভ দেহলাবণ্য দর্শন মানসে দলে দলে আপামরজনসাধারণের সমাগম হচ্ছে। হঠাৎ দিলীপ ঢুকলেন। নিস্তব্ধ কক্ষ তাঁর রুদ্ধ কণ্ঠের অব্যক্ত ক্রন্দনে কেঁপে উঠল যেন। কোনমতে নিজেকে সংযত করলেন, দুতিন মিনিট নীরবে তাকিয়ে চলে গেলেন।

কতকটা শান্ত হয়ে তিনি নীচে নেমে গেলেন এবং আমায় ডেকে পাঠালেন। সেই সময়ে আমরা শ্রীঅরবিন্দের ঘরে পাহারায় নিযুক্ত। মায়ের অনুমতি নিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। তিনি একটি খাটের উপর বসে, আমার অপেক্ষায়। যেতেই তিনি আমার মুখে শ্রীঅরবিন্দের শেষ অবস্থার ঘটনা শুনলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে যেন নিজেকে সামলে নিয়ে চোখের জলে আমায় বললেন, মাত্র দুটি কথা, 'নীরদ, তুমি জান না আমি কি হারিয়েছি।' তাঁর এরকম বিচলিত অবস্থা আগে কখনও আমি দেখিনি।

তিনি তাঁর স্বভাবনিয়ত কর্মে উৎসাহকল্পে একবার বাইরে গেলেন এবং আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করলেন। এখন তাঁর ইচ্ছা হল গুরুর সেবা হিসাবে আমেরিকায় যাবেন। মা অনুমতি দিলেন। আমায় মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'দিলীপ একা যাবে, ইন্দিরা যাবে না? দিলীপকে ছাড়া ইন্দিরা বাঁচবে না।' দিলীপ ইন্দিরাকে সঙ্গে নিলেন।

তারপর যখন তিনি আমেরিকা থেকে ফিরে এলেন, উৎসাহ ভরে সাধনায়, সাহিত্যে, সংগীতে নিযুক্ত হলেন কিন্তু আশ্রমজীবনের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মেলাতে পারলে না। কোথায় যেন ছন্দপতন হয়ে গেল। গরমিল কোথায় হয়েছিল আমি এখনও জানি না, কারণ তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে হতে গুরুর তিরোধানের পর সূত্র প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হঠাৎ একদিন খবর পেলাম তিনি আশ্রম

ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। শুনে স্তম্ভিত হলাম, অথচ মনে হল আমার কিছুই করণীয় নেই। তদুপরি আমি নিজেও আমার মানসিক বিপর্যয় থেকে তখন পর্যন্ত নিষ্কৃতি পাইনি। পরে অনেক গবেষণা করে আমি যে সিদ্ধান্তে এসেছি তা হল, গুরুর দৈহিক অভাব-বোধ তিনি ভুলতে পারেননি, চেষ্টা করেছেন তিনি অতি নিষ্ঠার সঙ্গে কিন্তু ভাঙা-হৃদয় জোড়া লাগেনি।

নীরদ, তুমি জানো না আমি কি হারিয়েছি— এই যে বুকফাটা ক্রন্দন তিনি চেপে রেখেছিলেন, ভুলতে চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু সময়ে অসময়ে, কারণে অকারণে অন্তর্দাহ অসহ্য হত, গুরু থাকলে তাঁর সেই দাহকে উপশম করতেন। তাই একদিন তিনি মর্মান্তিকভাবে বুঝলেন, 'কৃষ্ণ বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।'

এর পরে তিনি পুণায় গিয়ে হরিকৃষ্ণ মন্দির স্থাপন করেন এবং একনিষ্ঠ সাধনায় এবং বিবিধ সৃষ্টিকার্যে অনলস জীবন অতিবাহিত করেছেন দীর্ঘকালব্যাপী একথা অনেকেই জানেন। তাঁর 'magnificent vital' (মায়ের উক্তি) বিধিদত্ত। দিলীপের বৈশিষ্ট্য হল এক কথায় প্রাণের অজস্রতা। শুনেছি একবার তাঁর কেমন ধারণা হয় যে তিনি বেশিদিন বাঁচবেন না এবং আশ্রমে তাঁর বিশেষ বন্ধু নলিনী সরকারকে সে অমূলক ভাবটি জানান। নলিনী সরকার মায়ের কাছে চিন্তিত হয়ে খবর পাঠালেন, মা কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে থেকে বলেন, না এখনও অনেক বছর বাঁচবে। কার্যতঃ তাই ফলেছে। নলিনী সরকার সেই শুভ-সংবাদই দিলীপের কাছে পাঠালেন। দিলীপ তা পড়ে দুহাত কপালে তুলে মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম করেন। আরও শুনেছি যে মায়ের গুরুতর অসুখের খবর শুনে দিলীপ অত্যন্ত বিচলিত হন এবং তাঁর খোঁজ খবর নেন। মা সেঠে উঠে নলিনীকান্ত গুপ্তকে বলেন, 'দিলীপ আমার কাছে এসেছিল।' অর্থাৎ বাইরে বিচ্ছিন্ন হলেও অন্তরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি। আমাদের কাছে মাঝে মাঝে তিনি চিঠি লিখতেন। তাঁর খুব সাধ ছিল একবার সমাধি প্রণাম করতে আসবেন কিন্তু হয়ে ওঠেনি। যাই হোক, মর্ত্যধামে তাঁর স্বীয় কর্তব্য শেষ করে তিনি পুনরায় গুরুর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন— এই আমার বিশ্বাস।

পরে আমরা শুনেছি যে শেষ বয়সে তিনি যেমন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন, তেমনি শ্রবণ শক্তি এবং প্রাণমাতানো কণ্ঠের যাদু। শরীরও স্থূলাকার ধারণ করে। একদিন তিনি শুনলেন যে, শ্রীঅরবিন্দের Relics নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বোম্বে সহরে। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হলেন পুণা থেকে বোম্বে যাবার উদ্দেশ্যে। তাঁর সঙ্গী ও শিষ্যদের নিয়ে অসুস্থ শরীরে উপস্থিত হলেন। যখন Relics পৌঁছল তিনি আকুল হয়ে দুহাত বাড়িয়ে গুরুর পূতঃ Relics গ্রহণ করলেন। তাঁর অকুণ্ঠভক্তি-শ্রদ্ধা অঝোর ধারায় চোখের জলে তাঁকে ধৌত করে দেয়। কেউ কেউ বলেন, পুণ্যলগ্নে তিনি গুরুর দর্শন লাভ করেন এবং তার ফলস্বরূপ সমাধিস্থ হয়ে পড়েন এবং ধীরে ধীরে তাঁর প্রাণবায়ু গুরুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

দিলীপকুমার জন্মশতবর্ষ

অন্নদাশঙ্কর রায়

দিলীপকুমার রায়ের উপন্যাস 'মনের পরশ' বিলেত সম্বন্ধে লেখা। বিলেত যাওয়ার আগে আমি সে বই আগ্রহের সঙ্গে পড়েছিলুম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। তবে তাঁর গানের প্রশংসা শুনেছিলুম। বিলেতে বসে আমি 'তারুণ্য' লিখি। সে বই কলকাতায় প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালে। একদিন দেখি 'কালিকলম' পত্রিকায় তার সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন দিলীপকুমার রায়। তিনি আমার লেখার প্রশংসাই করেছেন। বোধ হয় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে আমি নাকি একদেশদর্শী। কারণ আমি সন্ন্যাসীদের বিপক্ষে।

দেশে ফিরে আসার পর শুনি তিনি পণ্ডিচেরি চলে গেছেন ও সেখানে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে বাস করছেন। এমন একজন সংগীতসাধক তথা সাহিত্যরসিক বাংলাদেশ ছেড়ে পণ্ডিচেরি চলে গিয়ে আশ্রমবাস করছেন এটা বাংলাদেশের পক্ষে দুর্ভাগ্য। তাঁর উচিত ছিল কলকাতায় থেকে বিয়ে থা করে সংসারী হওয়া, সঙ্গে সঙ্গে সংগীতের ও সাহিত্যের সাধনা করা। আমার মনের কথা মনে চেপে রাখি। তাঁকে জানবার উপলক্ষ পাইনা।

একদিন হঠাৎ এক চিঠি আসে দক্ষিণ ভারতের ভেলোর জেল থেকে। লিখেছেন সরলা দেবী, আমার পুরাতন বান্ধবী। একদা তিনি চিঠিতে দিলীপকুমারের গানের প্রশংসা করেছিলেন। সরলাদেবী গান্ধীজির লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। তখন তাঁকে ওড়িশায় কারাবন্দী না করে বহুদূরে ভেলোরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে আমাকে চিঠি লিখে খবরটা দেন। আমার মনে হল তিনি সুদূর প্রবাসে থেকে চেনাজানা মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন না, তাই বিমর্যভাবে দিন কাটাচ্ছেন। আমি তখন দিলীপকুমারকে চিঠি লিখি ও সরলাকে দেখতে যেতে অনুরোধ করি যাতে তাঁর কারাবাস একটু কম কষ্টকর হয়। চিঠিতে অবশ্য আমি তাঁর সমালোচনার জন্য ধন্যবাদ দিয়েছিলুম। নিজের লেখার কথা কিছু বলেছিলুম। তিনি তার উত্তরে লেখেন যে ব্যক্তিগণ কারণে-আশ্রম ত্যাগ করা সম্ভব নয়।

এমনি করে শুরু হয়ে যায় আমাদের পত্র বিনিময় যা সেই ১৯৩০ সাল থেকে তাঁর প্রয়াণের প্রাক্‌কাল পর্যন্ত বহমান থাকে। তিনি যখন চিঠি লিখতেন তখন চিঠির সঙ্গে থাকত শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রের প্রতিলিপি। শ্রীঅরবিন্দের মতামতের সঙ্গেও আমার পরিচয় ঘটে। একবার খুব মজা হয়। দিলীপকুমার আমার কোনও একটি কবিতার বিরুদ্ধে কিছু লেখেন। তার উত্তরে আমি একটি কবিতা লিখে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশ করি। আমার সেই কবিতাটি এই রকম—

মনের কথা মনের মতন করে
কইব আমার মনের মতনকে

কবি হবার নাই দুরাশা ওরে
সার মেনেছি সত্য কথনকে ...
সবার মাঝে না যদি হই বড়
একটি হিয়ার শ্রদ্ধা যেন লভি
প্রিয়ার কাছে হইলে প্রিয়তর
হলেম আমি যা হতে চাই সবি।

আমার এই কবিতাটি পড়ে দিলীপকুমার শ্রীঅরবিন্দের কাছে চিঠি লিখে নালিশ করেন। শ্রীঅরবিন্দ দিলীপকুমারকে চিঠি লিখে আমার পক্ষে দুকথা বলেন। ক্রমে ক্রমে দিলীপকুমারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আত্মীয়তায় পরিণত হয়। আমি তাঁকে 'দাদা' বলে সম্বোধন করি ও 'তুমি' বলতে আরম্ভ করি।

আমি প্রায়ই লিখতুম যে তোমার বিয়ে করা উচিত, তা না হলে তুমি সম্পূর্ণ মানুষ হতে পারবে না। ইতিমধ্যে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমি সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠেছিলাম। দিলীপদা আত্মপক্ষ সমর্থন করতেন। তিনি বলতেন যে নারীর প্রেম তিনি পেয়েছেন। সুতরাং তিনি অসম্পূর্ণ নন। 'দু'ধারা' বলে তাঁর একটি নভেল তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন। আমি তার একটি সমালোচনা লিখে 'মুক্তধারা' বলে একটি নতুন মাসিক পত্রিকায় পাঠিয়েছিলুম। কিন্তু সেই পত্রিকাটি আদৌ প্রকাশিত হয় না। লেখাটিও হারিয়ে যায়।

দিলীপদা মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়তেন গান গেয়ে আশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে। সেই সূত্রে কলকাতায় আসতেন। কিন্তু আমার তো বদলির চাকরি। কখনও ওঁর সঙ্গে দেখা হয় না। অবশেষে ১৯৩৭ সালে আমি যখন রাজশাহীর জেলা শাসক তখন শুনি রাজশাহী শহরের আষাঢ়ে ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠান যোগ দিতে তিনি আসছেন। আমার অনুরোধে তিনি আমার বাসভবনেই অতিথি হন। সেই প্রথম তাঁকে আমরা দেখি ও তিনিও আমাদের দেখেন। লীলা তাঁর যত্ন নেন। তিনি একাই এসেছিলেন। পরনে গৈরিক, কিন্তু সিল্কের গৈরিক ধুতিপাঞ্জাবি। তাঁর আহার্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, তিনি যে কোনও খাবার খেতে পারেন, যে কোনও বিছানায় শুতে পারেন, কেবল একটি বিষয়ে তিনি এখনও খুঁতখুঁত করেন, সেটি টয়লেট। আমি তাঁকে আশ্বাস দিলুম, আমাদের বাড়ির টয়লেট একেবারে আধুনিক।

আষাঢ়ে ক্লাবের অনুষ্ঠানে তিনি একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। সেটি সাহিত্য সম্পর্কীয়। পরে তিনি নানা স্থানে গান করেন। আমি তাঁর সঙ্গে যাইনে। খুবই জনপ্রিয় মানুষ। খুব কম সময়ই আমাদের ওখানে থাকেন।

বেশ কয়েক বছর পরে কী একটা কাজে কলকাতায় এসেছি। শুনি দিলীপদাও ওখানে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে তিনি আমাকে ধরে নিয়ে যান এক সাহেব সন্ন্যাসীকে দেখতে। তাঁর নাম কৃষ্ণপ্রেম। পূর্বাশ্রমের নাম—যতদূর মনে পড়ে—রোনাল্ড নিকসন। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধে জঙ্গী বিমানের চালক ছিলেন। পরে লখনৌ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে এসে সেখানকার ভাইস-চ্যান্সেলার জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর স্ত্রীর কাছে মাতৃস্নেহ পান। সেই ভদ্রমহিলার নাম আমার মনে পড়ছে না। তাঁর ভক্তরা বলত

'যশোদা মাই'। নিকসন হয়ে যান যশোদা মাইয়ের পুত্র কৃষ্ণ। চাকরি ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে হিমালয়ে আলমোড়ার কাছে যশোদা মাই স্থাপিত আশ্রমে আশ্রয় নেন। সেইখানেই তিনি বৈষ্ণব মতে গোপালের সেবাপুজো করেন। তাঁকে আর ইংরেজ বলে চিনতে পারা যায় না। দিলীপদা আমাকে যখন নিয়ে যান কলকাতার কোন এক ভদ্রলোকের বাড়িতে তখন দেখি এক মুণ্ডিতমস্তক শ্বেতাঙ্গ সাধু বেশ কয়েকজন অভ্যাগতের সঙ্গে বাংলায় তত্ত্ব আলোচনা করছেন। দিলীপদা তাঁর সঙ্গে ভিড়ে যান। পথে যাওয়ার সময় আমাকে বলেন কৃষ্ণপ্রেম একজন বিরাট পণ্ডিত। পরে আমি তাঁর 'গীতা'র সম্বন্ধে লেখা ইংরেজি বই কিনেছিলুম। তিনি মনেপ্রাণে ভারতীয় হয়ে গিয়েছিলেন। দিলীপদার সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর বন্ধুত্ব।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর যুদ্ধবিরোধী কার্যকলাপ শ্রীঅরবিন্দের পছন্দ হচ্ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন ইংরেজ-ফরাসী মিত্রপক্ষের জয়। সুতরাং তাদের সঙ্গে সহযোগিতাই ছিল তাঁর পলিসি। আমি ছিলুম গান্ধীজির সমর্থক। সুতরাং দিলীপদার সঙ্গে আমরা তর্কবিতর্ক ছিল পত্রাবলির বিষয়। পার্টিশনের পরে দিলীপদা রীতিমত গান্ধীবিরোধী হয়ে ওঠেন। অথচ গান্ধীজি তাঁকে ভালোবাসতেন ও তাঁর গান ভালোবাসতেন। দেশের দুর্দশা দেখে দিলীপদা কষ্ট পাচ্ছিলেন। দিলীপদার ধারণা এর জন্য গান্ধীজিই দায়ী। দিলীপদার সঙ্গে আমার দূরত্ব বেড়ে যায়।

শ্রীঅরবিন্দের প্রয়াণের পর একদিন কলকাতায় দেখি দিলীপদা উপস্থিত। তিনি পণ্ডিচেরি ছেড়ে চলে এসেছেন। বলেন, 'এখন থেকে আমি ট্রাডিশনাল বৈষ্ণব। আমরা অদ্বৈত প্রভুর বংশধর।' আমি অবাক হই। তিনি শুধু পণ্ডিচেরি ছেড়েছেন তা নয়, শ্রীঅরবিন্দের যোগমার্গও ছেড়েছেন। এখন তাঁর প্রিয় পাঠ্য 'গীতা' নয়, 'শ্রীমদ্‌ভাগবত'। 'ভাগবত' থেকে তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন ও আমাকে পাঠিয়ে দেন। থাকেন পুণায়। সেখানে তাঁর শিষ্যা ইন্দিরা দেবী একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার নাম হরিকৃষ্ণ মন্দির। সেখানে বিগ্রহ রেখে সেবাপুজো হয়। দিলীপদা আমাকে পাঠিয়ে দেন ইন্দিরা দেবীর 'মীরার ভজন'। সেসব ইন্দিরা দেবী কী জানি কেমন করে মীরার কাছ থেকে পেয়েছেন। তার মানে মীরা এখনও অশরীরীভাবে জীবিত। আর ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে তাঁর অলৌকিক ভাবে যোগাযোগ। এখন আমি যদি এটা বিশ্বাস না করি তাহলে দিলীপদা ক্ষুণ্ণ হন।

আমার কলকাতায় বদলি হয়ে আসার পরে এক সময় দিলীপদা আমাকে নিয়ে যান আনন্দময়ী মায়ের দর্শনে। তিনি তখন তাঁর এক ভক্তের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। পথে যেতে যেতে দিলীপদা বলেন, সারা ভারতে যে সাত আটজন সত্যিকার সাধুসন্ত আছেন আনন্দময়ী মা তাঁদের একজন। সাধুসন্তদের সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। কে সত্যিকার কে সত্যিকার নন তা বুঝবার মতো যোগ্যতা আমার ছিল না। গেলুম দিলীপদার সঙ্গে। মার কাছে তিনি আমার পরিচয় দিলেন, মা আমাকে তাঁর পরিচয় দিলেন। দিলীপদার সঙ্গে তাঁর যে কথাবার্তা হল তা আমি শুনলুম। কতককথা তিনি আপনমনেই বললেন। কী জানি কেন আমার প্রত্যয় হল সেসব কথা তাঁর অন্তরের উপলব্ধির কথা। শেখানো কথা বা শোনা কথা নয়। তিনি সত্যিই কিছু পেয়েছেন।

দিলীপদার সৌজন্যেই আমার কৃষ্ণপ্রেম দর্শন ঘটেছিল। তাঁর সৌজন্যেই ঘটল আমার আনন্দময়ী দর্শন। তারপর বহুদিন তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ছিল না। আমি তো তখন অসময়ে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনে বাস করছি। চিঠিপত্র পাই, চিঠিপত্র লিখি। তিনি থাকেন পুণায়, কদাচিৎ কলকাতায় আসেন, আমি খবর পাইনে। একবার পারিবারিক কারণে আমি স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় এসেছিলুম। আকস্মিক কারণে পায়ের হাড় ভেঙে তিনি জখম হন। চিকিৎসার খাতিরে কলকাতায় থেকে যেতে হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইংরেজিতে কিছু লিখেছিলেন। সেটা পুণা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। তাঁরা তাঁকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করেন। সে উপলক্ষে আমরা দুজনে পুণা যাই।

একদিন সন্ধ্যাবেলা হরিকৃষ্ণ মন্দিরে গিয়ে ভক্তদের সঙ্গে বসে দাদাজির গান শুনি। দিদিজির সঙ্গেও আলাপ হয়। এইরূপ ভক্ত সমাবেশ প্রত্যেকদিনই হয়। ভজনকীর্তন হয় প্রত্যেকদিন। নানা জাতের স্ত্রীপুরুষ সন্ধ্যাবেলা নীরব হয়ে শ্রবণ করেন। মনে হল দিলীপদা অধ্যাত্ম মার্গে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন। তিনি ভাষণ দেন না, তত্ত্বকথা বলেন না, গান শোনান। কোনোটি তাঁর নিজের, কোনোটি অপর কোনও সাধকের। এর কিছুকাল পরে দিলীপকুমার সদলবলে কলকাতায় আসেন, শ্রীযুক্ত মিলন সেনের অতিথি হন। কয়েকদিন ধরে প্রত্যেক সন্ধ্যায় ভজনকীর্তনের আসর বসে। আমরাও যাই। আরও অনেকে যান। আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনি। ইংরেজি বাংলা সংস্কৃত ভাষায় ভক্তিমূলক গীতি বা দেশপ্রেমের গান, বিশেষত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের।

দিলীপদার বই লেখাও সমানে চলতে থাকে। কখনও বাংলায়, কখনও ইংরেজিতে। তাঁর শেষ প্রকাশিত উপন্যাস 'পতিতা ও পতিতপাবন', তাতে তিনি একটি অসামান্য বালকের সংগীত প্রতিভার কাহিনী লিখেছেন। এমন দরদের সঙ্গে যেন তিনি সেই বালকটিকে পুত্রের মতো ভালবাসতেন। বইটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। সেইটে আমি তাঁকে জানিয়েছিলুম। এর পর তিনি অল্পদিনই জীবিত ছিলেন। যাওয়ার আগে জানিয়েছিলেন যে তিনি আরও একটি উপন্যাস লিখছেন, সেটি আমাকে উৎসর্গ করা হবে। সে উপন্যাস আজ পর্যন্ত ছাপার অক্ষরে বেরোয়নি।

তবে আমি তাঁকে আমার একটি বই উৎসর্গ করেছিলুম অনেকদিন আগে। তাতে ছিল আমার এই কবিতাটি :

তোমায় বলেছি পলাতক, বলে হেসেছি কত।
নিয়তি, আমার নিয়তি!
তুমি তো পালালে সংসার হতে সুসংযত
নিয়তি, আমার নিয়তি!

দিলীপদা মৃত্যুর অল্পদিন আগেও আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। তিনি নাকি মাঝেমাঝে আমাকে স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর আর একটি স্বপ্নের কথাও আমাকে লিখেছিলেন। সেটি শ্রীরাধার স্বপ্ন। রাধারাণী তাঁকে দর্শন দিয়ে কৃপা করেন। এর আগে কখনও তিনি রাধার নাম করেননি, করতেন শুধু কৃষ্ণের নাম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে রাধা আগে, তারপরে কৃষ্ণ। রাধার প্রেমই হচ্ছে 'সাধ্য শিরোমণি।' বলেছিলেন রায় রামানন্দ,

শ্রীচৈতন্যদেবকে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই গৌরীয় বৈষ্ণব অর্থাৎ গৌরাঙ্গের ভক্ত। কিন্তু দিলীপদার চিঠিপত্রে কখনও গৌরাঙ্গের উল্লেখ থাকত না, কিংবা চৈতন্যচরিতামৃতের। তিনি অদ্বৈতের বংশধর। তিনি গৌর নিতাই সম্বন্ধে নীরব কেন! তিনি কৃষ্ণের ভক্ত হলেও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার কিংবা তার কোনও শ্লোকের উল্লেখ করতেন না। আমি আগেই বলেছি, তাঁর প্রিয় সাধ্য ছিল শ্রীমদ্‌ভাগবত। তাই বলে গোপীদের কথাও তিনি কখনও লিখতেন না। ভাগবতের মতে ভক্তিই শুদ্ধাভক্তি। গোপীদের বদলে তিনি যাঁর নাম করতেন তিনি মীরা। মীরার ভজন তাঁর প্রিয় ছিল। সেই ভজন আমারও প্রিয়, আমাদের সকলের প্রিয়। দিলীপদার কণ্ঠে মীরার ভজন আমরা কলকাতার শ্রীমিলন সেনের ভবনে বহুবার শুনেছি। বড় দরদের সঙ্গে তিনি গাইতেন। বেশ বোঝা যেত তিনি একজন সত্যিকার ভক্ত। ভগবানকে পাওয়ার জন্যে তাঁর হৃদয়ে গভীর ব্যাকুলতা ছিল। শেষ বয়সে তাঁকে দেখেও মনে হতো তিনি একজন মরমিয়া সাধক।

তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে আমি শুনেছিলুম যে তিনি ছিলেন একজন সংগীতরসিক পুরুষ। সংগীত তাঁর প্রাণ। সেইজন্যে কেমব্রিজে পড়াশুনা শেষ না করে ইউরোপে তিনি কণ্ঠস্বরের তালিম নিয়েছিলেন। দেশে ফিরে এসে বেনারস লখনৌ প্রভৃতি স্থানে বিখ্যাত ওস্তাদ ও বাইজীদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন।

সেই সময় শোনা যেত তাঁর গানের সাথী ছিলেন সাহানা দেবী। তিনিও একজন আত্মনিবেদিত গায়িকা। তাঁরও প্রাণ ছিল সংগীত। দিলীপকুমারের মতো তিনিও চলে যান পণ্ডিচেরিতে। কিন্তু কে আগে কে পরে তা আমি জানতুম না। অনেক সময় আমার মনে হতো দিলীপকুমারের উচিত ছিল তাঁকে বিয়ে করা। কিন্তু তখন জানতুম না যে সাহানা দেবীর আগে একবার বিয়ে হয়েছিল এবং সে বিয়ে ভেঙে যায়। প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে সাহানা দেবীর 'আত্মজীবনী' আমার হাতে আসে। তাতেই প্রথম পড়ি তিনি চিত্তরঞ্জন দাশ পরিবারের কন্যা। রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে তিনি গুরুদেবকে মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর নৃত্যেরও প্রতিভা ছিল। কাশীর একটি বড় পরিবারে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। সেখানে তাঁকে গাইতে বা নাচতে দেওয়া হতো না। তাঁর শ্বশুরবাড়ির কেউ এসব বিদ্যার সমঝদার ছিলেন না। তাঁর কাছে যা মহামূল্যবান তাঁদের কাছে তা মূল্যহীন। স্বামীর ভালোবাসার কথা তিনি উল্লেখ করেন নি। সম্ভবত ওটা তিনি পাননি। ওটা ছিল arranged marriage। সাহানা দেবী অসুখ নিয়ে পালিয়ে আসেন। জানা গেল তাঁর যক্ষ্মা হয়েছে। শান্তিনিকেতনে গিয়ে তিনি গুরুদেবের শরণাপন্ন হন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনেই থাকতে বললেন। থাকলে তিনি সংগীত ভবনে কাজ পেতেন। গুরুদেব তাঁকে একথাও বললেন যে তিনি তাঁকে সারিয়ে দেবেন। কিন্তু কী জানি কেন, সাহানা দেবী শান্তিনিকেতন থেকে চলে গেলেন পণ্ডিচেরি। সেইখানে গিয়ে শরণ নিলেন মাদারের। গান যাঁর প্রাণের জিনিস পণ্ডিচেরি তাঁর স্থান নয়। তবে সেইখানে ছিলেন তাঁর পুরাতন গানের সাথী দিলীপকুমার। দুজনে মিলে গান করতে পারতেন। করতেনও। সেটা দিলীপদার মুখে শুনেছি। তিনি একবার কথা প্রসঙ্গে বলেওছিলেন, 'সাহানাকে যে আমি ভালোবাসি'—সবটা মনে পড়ছে না। যা জানিনে তা নিয়ে আমার কিছু বলা উচিত নয়। তবে আমার মনে হয়, ওঁদের দুজনের মধ্যে একটা গভীর প্রেমের সম্পর্ক

ছিল। সেটা অশরীরী প্রেম। যাকে বলে Platonic love। দিলীপদাকে আমি যতদূর জানি, বিবাহবন্ধন তাঁর জন্য নয়। তিনি চির পলাতক। আর একনিষ্ঠতাও তাঁর হৃদয়ে ছিল কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ তাঁর নভেল 'দু'ধারা' থেকে তাই মনে হয়। একজনকে বিয়ে করা মানে আর সব মেয়েকে হারানো। দিলীপদাকে কে না চাইত বিয়ে করতে। অমন একজন বিবাহযোগ্য সুপুরুষ সেকালে আর কে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বাদে! তারপর দিলীপদা ছিলেন ভবঘুরে। পণ্ডিচেরিতে থাকতেই তিনি সারা ভারত ঘুরতেন ও চাঁদা চাইতেন আশ্রমের জন্যে। পুণায় থাকতে তিনি বেরিয়ে পড়তেন বিশ্ব ভ্রমণে। এমন মানুষের পক্ষে বৌ না থাকাই ভালো। থাকলে রসভঙ্গ হয়। তিনি নিজেকে বলেছেন 'তীর্থঙ্কর'। তিনি সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন মনীষীর।

পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যখন মারা যান তখন দিলীপদার বয়স খুব কম। মাতা সুরবালা আগেই প্রয়াত হয়েছিলেন। অনাথ ভাইবোনের ভার পড়েছিল যাঁর ওপরে তাঁর নামটি আমি ভুলে যাচ্ছি, প্রসাদ বা এরকম কিছু হবে। বোন মায়ার বিয়ে হয়ে যায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ভবশঙ্করের সঙ্গে। তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী দিলীপদা। যতদূর জানি পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে দান করেন। এটাও একপ্রকার সন্ন্যাস। তবে সন্ন্যাস দীক্ষা তিনি গ্রহণ করেননি। মুক্ত মনে তিনি বার্ট্রাণ্ড রাসেল, রোমা রলাঁ, প্রমুখ মনীষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পত্রবিনিময় করেন। রাসেলের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি বহুবার মিলিত হন। শরৎচন্দ্র তাঁকে মন্টু বলে ডাকতেন। একসঙ্গে তাঁরা দিল্লি ও বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। শেষ বয়সে গান্ধীজিকে তিনি গান শুনিয়েছিলেন। সেটা গান্ধীজিরই অনুরোধে। ইংরেজিতে তাঁর একখানি বইয়ের নাম 'Among the Great'! তবে তাঁর কাছে গ্রেটদের মধ্যেও গ্রেটেস্ট ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর পরেই মাদার। বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে থাকার দরুণ সমসাময়িক সাহিত্যিক ও সংগীতসাধকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে যায়। বলতে গেলে বাংলা দেশ তাঁকে হারায়। তিনচারজন একান্ত অনুরাগী ছাড়া আর কারও সঙ্গে ও তাঁর পত্রালাপ থাকে না। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর পূর্বসূরীও কেউ থাকেন না। কী জানি কেন দ্বিজেন্দ্রলাল প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষে, তাঁর লেখা আর প্রকাশিত হয় না। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স আর তাঁর বই প্রকাশ করেন না। কোম্পানি নিজেই উঠে যাওয়ার মতো।

শুনছি আনন্দ পাবলিশার্স থেকে তাঁর রচনাবলির একটি সংকলন বেরোবে। আমার কাছে লেখা তাঁর চিঠিগুলিও একজন চেয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা সেগুলি প্রকাশ করা। কিন্তু সেই চিঠিগুলি উদ্ধার করা শক্ত।

দিলীপদা মানুষটির মূল্যায়ন করা আমার সাধ্য নয়। এই পর্যন্ত বলতে পারি, তিনি ছিলেন অনন্য। তাঁর মতো দ্বিতীয়টি দেখিনি। তিনি সাংসারিক উন্নতি করতে চাইলে তাঁর সামনে সমস্ত পথ খোলা ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্ররূপে তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই সুবিধা ভোগ করতেন। চাকরি করা তাঁর ধাতে সইত না। উকিল-ব্যারিস্টার হয়ে অতুলপ্রসাদের মতো তিনি সফল হতেন না। আর সাহিত্যে যে পয়সা হয় না তা কে না জানে। বাজার চলতি উপন্যাস লেখার মতো মানুষ তিনি নন। গান গেয়ে

ওস্তাদদের মতো জীবিকা অর্জন দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের পৌত্র ও ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্রের পক্ষে অশোভন। তবে কি তাঁর বন্ধু সুভাষচন্দ্রের মতো রাজনীতি নিয়ে থাকা? না, তেমন মানুষও তিনি নন। কলকাতায় থাকলে সম্ভবত তিনি এখানে ওখানে গান গেয়ে বেড়াতেন। কিন্তু কতকাল? সেই সূত্রে অর্থ উপার্জন তাঁর নীতি নয়। আমার মনে হয় তাঁর সামনে দুটি মাত্র বিকল্প ছিল। একটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়ে আশ্রমিক হওয়া, অপরটি শ্রীঅরবিন্দের কাছে গিয়ে পন্ডিচেরিতে থাকা। গ্রেটদের প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ ছিল। আর আশ্রম ছাড়া তাঁকে আশ্রয় দেবে কে! শেষ বয়সেও তাঁকে আশ্রয় নিতে হলো ইন্দিরা দেবীর হরিকৃষ্ণ মন্দির নামক আশ্রমে। ততদিনে তিনি নিজেই তাঁর ভক্তদের কাছে গ্রেট হয়েছিলেন।

দিলীপকুমার গানে, প্রাণে ও প্রেমে

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

তাঁর সঙ্গে আমার একাত্মতা, নিবিড় অন্তরের যোগ বোধহয় মাটির টানে। সে-মাটি দেশমাতৃকা, একই নদীয়ার সন্তান আমরা দুজনেই, উভয়েই কৃষ্ণনাগরিক। বয়সে আমার চেয়ে তিনি বিশ বছরের জ্যেষ্ঠ হলেও বয়স্যের মতো একান্ত আপন বন্ধু ব'লে কণ্ঠলগ্ন ক'রে নিয়েছিলেন প্রথম দিনের দর্শনেই। গিয়েছিলাম অবশ্য তাঁর অতুলনীয় কণ্ঠের অসামান্য লাবণ্যে মুগ্ধ হয়েই। তখন তাঁকে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে মন-প্রাণ সব যেন সঁপে দিয়েছি নিজেরই অগাচরে। পরে সামনা-সামনি গিয়ে দেখলাম তাঁর ভুবনভোলানো হাসিমাখানো কন্দর্পকান্তি গৈরিকমণ্ডিত দিব্য রূপ।

সেই দিনটি আজও স্পষ্ট মনে আছে, যখন কলকাতায় ছুটে গিয়েছি তাঁর সাক্ষাৎ দর্শনের তীব্র লালসায় কৃষ্ণনগর থেকে। তখন কৃষ্ণনগর কলেজে তৃতীয় বর্ষে আমি পাঠরত। একদিন হঠাৎ শুনলাম রেডিওতে দিলীপ রায় গান গাইবেন সেদিন রাত্রে। তখনও ঘরে ঘরে এমন রেডিওর প্রচলন হয়নি, দু'একজন বর্ধিষ্ণু অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে রেডিও এসেছে, বিশেষ ক'রে মফস্বল শহরে। পাড়ার পরিচিত রমেন রায়ের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম, অনুরোধ জানালাম রেডিওটা খুলে দিতে। ভেসে এল কী এক অশ্রুতপূর্ব কিন্নরকণ্ঠের সুরের ঐশ্বর্য ও ভাবের মাধুর্যে ওতপ্রোত আশ্চর্য গান। গাইছিলেন তিনি : 'নূপুরকী ঝঙ্কার, ঝনক ঝনক ঝঙ্কার।' সেই ঝঙ্কার 'কানের ভিতর দিয়া' একেবারে 'মরম পশিল' এবং 'আকুল করিল মোর প্রাণ'। সারা রাত ঘুম হ'ল না। শুধু সেই সুরের গুঞ্জন যেন অনুরণিত হতে থাকল নিজের সমগ্র সত্তায়।

গান-পাগল ছিলাম শৈশব থেকেই। তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন মধুকণ্ঠ আমারই সম্পর্কিত মামা, হরেন চট্টোপাধ্যায়, যিনি ছিলেন দিলীপকুমারের একান্ত স্নেহধন্য সুহৃদ ও সাক্‌রেদ। সে-আমলে হরেনমামা ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, হিমাংশু দত্তের ও দিলীপকুমারের গানের একমাত্র অদ্বিতীয় গায়ক এবং সেই সঙ্গে মীরা, কবীর প্রভৃতির হিন্দী ভজনেরও অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী। অজস্র রেকর্ডে তিনি গ্রামোফোনে এ সব গান গেয়েছিলেন বছরের পর বছর, রেডিওরও নিয়মিত প্রতিষ্ঠিত শিল্পী ছিলেন। দিলীপকুমারই তাঁকে কৃষ্ণনগর থেকে নিয়ে গিয়ে প্রথম গ্রামোফোনে রেকর্ড করান, একটি অতুলপ্রসাদের গান 'কে যেন আমাকে বারে বারে চায়' একপিঠে, অন্যপিঠে মীরার প্রসিদ্ধ ভজনের বঙ্গানুবাদ 'আমায় চাকর রাখো গো'। সে-সব এক ইতিহাস। আবার দীর্ঘ নয় বৎসর পরে ১৯৩৭ সালে দিলীপকুমার যখন পণ্ডিচেরি থেকে প্রথম কলকাতায় আসেন, তখন কলিকাতার গায়কমহলে সুপ্রতিষ্ঠিত বন্ধু হরেনকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সে-রকম কণ্ঠলাবণ্য ও গীতিনৈপুণ্য কারুর আছে কিনা যে তাঁর গান গাইতে পারবে

অনায়াসে। হরেন তখন তাঁকে নিজের সব চেয়ে প্রিয় ছাত্রী প্রতিভাময়ী উমা বসুর (হাসি) কাছে নিয়ে যান এবং দিলীপকুমার স্তম্ভিত হয়ে যান তাঁর গান শুনে ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিজের গান শেখাতে আরম্ভ করেন দিনের পর দিন এবং বছরে বছরে পণ্ডিচেরি থেকে কলকাতায় আসতে আরম্ভ করেন শুধু তাঁরই টানে। তাঁরই অনিন্দ্য কণ্ঠের আকর্ষণে। কিন্তু পাঁচ বছরের বেশি দিলীপকুমার তাকে কাছে পাননি। ১৯৪২-এ তার অকালমৃত্যু ছিনিয়ে নিয়ে যায় এই অসাধারণ প্রতিভাময়ী তরুণী শিল্পীকে তাঁর কাছ থেকে। তবে ঐ সামান্য কয় বৎসরে গ্রামোফোনে দিলীপকুমারের যে সব 'রূপে বর্ণে ছন্দে' অসামান্য গান সে 'আলোকে-আনন্দে' গেয়ে রেখে গিয়েছেন, তাই তাঁকে এক অমর শিল্পীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী তাঁর গান শুনে যথার্থই বলেছিলেন 'She is the nightingale of Bengal.'। আরও আশ্চর্যের কথা, যে-২২শে জানুয়ারী দিলীপকুমারের জন্মদিন, সেই ২২শে জানুয়ারীই তাঁরও জন্মদিন ১৯২৪ সালে এবং সেই ২২শে জানুয়ারীই তাঁর মৃত্যুদিনও ১৯৪২ সালে। দিলীপকুমারের জীবনের সঙ্গে কী এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে যেন তিনি আবদ্ধ ছিলেন এবং স্বল্পকালের জন্য তাঁর জীবনকে গানের আলোকে উদ্ভাসিত করেই যেন তিনি কোথায় মিলিয়ে গেলেন!

আমিও সেই হরেনমামারই শরণ নিলাম তাঁর সঙ্গে পরিচিত হ'বার জন্য। তিনি খোঁজ নিয়ে বললেন, 'মন্টু তো ক'দিনের জন্য মায়ার কাছে গিয়েছে ব্যারাকপুরে, ফিরলে তোকে নিয়ে যাব একদিন।' তখন জানতাম না দ্বিজেন্দ্রলালের এই দুটি মাত্র সন্তান, মন্টু ও মায়া, যাঁদের রেখে অকালে দেহত্যাগ ক'রে চলে যান তাঁদের মা সুরবালা, যিনি ছিলেন তখনকার দিনের প্রখ্যাত চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের আদরিণী পরমা সুন্দরী কন্যা। মাতৃহারা এই দুটি নাবালক ও নাবালিকা পুত্র-কন্যাকে দ্বিজেন্দ্রলাল একাধারে পিতা ও মাতার স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন এবং কেউ তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় বলতেন : 'এটি আমার যথা, আর এটি আমার সর্বস্ব।' যথার্থই এই দুটি নয়নমণি জীবনের একমাত্র আলো হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিপত্নীক দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে। দুজনকেই তিনি গানবাজনায় উৎসাহিত করেছিলেন, পুত্রকে বালক বয়স থেকেই সাহিত্যচর্চায়, সংস্কৃত শিক্ষায় দীক্ষা দিয়েছিলেন। কন্যা মায়াকে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁকে পরিহাস করে অনেকে Surrender-not ব'লে অভিহিত করতেন, তাঁরই একমাত্র পুত্র ভবশঙ্করের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। সুরেন্দ্রনাথের ব্যারাকপুরে একটি প্রাসাদোপম বাড়ী ছিল, যেখানে গিয়ে তিনি মাঝে মাঝে থাকতেন। দাদা দীর্ঘকাল পরে পণ্ডিচেরি থেকে ফিরে আসায় তাঁকে বোন ও ভগ্নীপতি তাঁদের ব্যারাকপুরে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছেন একান্তে তাঁর সঙ্গ ও সাহচর্য লাভের আশায়। সঙ্গে আছে তাঁদের একমাত্র কন্যা এষা, যে বর্তমানে পণ্ডিচেরিবাসিনী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সাধিকা।

অধীর অপেক্ষায় আমার দিন কাটছে কবে তিনি ফিরবেন ব্যারাকপুর থেকে, হরেনমামার সঙ্গে কাছে খবর পাব ও সঙ্গে সঙ্গে দেখা করতে যাব বলে। ইতিমধ্যে আমার এক জ্যেঠতুতো দাদা আমাকে নিয়ে গেলেন একদিন সন্ধ্যায় নিউ এম্পায়ারে

উদয়শঙ্করের নাচ দেখবার জন্য। তখন হরেন ঘোষ নামে এক ভদ্রলোক ইমপ্রেসারিও রূপে উদয়শঙ্করের নাচের ব্যবস্থা করছিলেন দেশ জুড়ে এবং কলকাতা তাই নিয়ে তোলপাড়। ওপরে গ্যালারিতে বসে দাদার সঙ্গে নাচ দেখার প্রতীক্ষায় আছি। এমন সময় দাদা নীচের দিকে তাকিয়ে বললেন : ঐ তো দিলীপ রায় এসেছেন, বোধহয় নাচ দেখবেন। আমিও লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, দাদা চিনিয়ে দেওয়াতে, গৈরিক বস্ত্রে শোভিত মাথায় টুপি একটি উজ্জ্বল মূর্তি একেবারে সামনের দিকে এসে বসলেন। আমার তো তখন হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে চলেছে, নাচ দেখা মাথায় উঠেছে, শুধু লক্ষ রাখছি ঐ গেরুয়াপরা মূর্তিটির দিকে। কী ক'রে তাঁকে ধরা যায় কেবল এই ভাবছি। নাচ শেষ হওয়ার পর drop scene পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়ি-কি-মরি ক'রে ছুটলাম উপর থেকে নীচের দিকে। সেখানে রুদ্ধশ্বাসে গিয়ে পৌঁছুতেই দেখি তিনি ধীরপদক্ষেপে বেরিয়ে আসছেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে প্রণাম করে বললাম হরেনমামার সঙ্গে তাঁর কাছে যাবার জন্য ক'দিন ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, তিনি ছিলেন না, ব্যারাকপুরে চলে গিয়েছিলেন। বললেন : 'হ্যাঁ। কোন্ হরেন? হরেন ঘোষ?' আমি বললাম : 'না, হরেন চাটুজ্যে'। তখন বললেন : 'বেশ তো তার সঙ্গে একদিন চলে এসো। তবে তুমি গান শুনতে যখন এত আগ্রহী, তখন তো আসর করতে হয়। দেখি কোথাও আসর হলে তোমায় বলব।'

পরদিনই ছুটলাম হরেনমামার কাছে। তিনি তখনও জানতেন না ব্যারাকপুর থেকে তাঁর ফেরার কথা। আমার সঙ্গে আকস্মিক দেখা হয়ে যাওয়ার বিবরণ শুনে খুশি হয়ে বললেন : 'চল্ আজ বিকেলেই যাওয়া যাবে ৩৪, থিয়েটার রোডে, ওর মেজমামার বাড়ীতে। যেখানে ও আছে।' এই মেজমামাকে সবাই তকুমামা বলে ডাকতেন, ভাল নাম বোধহয় খগেন মজুমদার ছিল। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী মন্দার মামীমা পিতৃমাতৃহীন এই ভাগ্নেটিকে নিজেদের কাছে রেখে অপত্যস্নেহে প্রতিপালন করেছিলেন! পরবর্তীকালে মন্টুদার মুখে গল্প শুনেছি এই মামীমার সম্বন্ধে, কী স্নেহশীলা তিনি ছিলেন এবং তাঁর উপর কী অত্যাচারই না তিনি করেছেন। রাত দুপুরে পাঁচ সাতজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হাজির হয়েছেন এবং তখনই তাঁদের রেঁধে-বেড়ে খাওয়াবার ফরমাশ করেছেন। হয় তো তাঁর 'স্মৃতিচারণ'-য়ে এ সব কথা লিখেও গিয়েছেন।

প্রাক্-পণ্ডিচেরি যুগে এই ৩৪, থিয়েটার রোডেই ছিল দিলীপকুমারের আবাসস্থল। মনে পড়ে দীর্ঘ দশ বছর পরে যখন আবার কলকাতায় এলেন তারও অনেক পরে যখন ইতিমধ্যে সে বাড়ী বিক্রী হয়ে হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছে তবু একদিন হাঁটতে হাঁটতে সেই বাড়ীতে গিয়ে তিনি ঢুকে পড়েছিলেন গেটের দারোয়ানের নিষেধ উপেক্ষা ক'রে। তারাও অবাক, ঐ গৈরিকধারী এ বাড়ীতে কার বা কিসের সন্ধানে? এসবই ছিল তাঁর টান এই মামার বাড়ীর উপর, যেখানে কত গানের আসর বসিয়েছেন, ওস্তাদদের আহ্বান ক'রে আনিয়েছেন জমজমাট আড্ডা দিয়েছেন বন্ধু সুভাষ, সত্যেন বোস, অমিয় সান্যালদের নিয়ে।

সেই বাড়ীতেই হরেনমামা আমাকে নিয়ে গেলেন এক সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করাতে। বাইরে ঘরে বসেছি, ভিতর থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। হরেনমামা

ভিতরে ঢুকে গেলেন, একটু পরে আমাকেও ডেকে নিয়ে গেলেন, দেখলাম মন্টুদা তাঁর এক মাসতুতো বোনকে তখন গান শেখাচ্ছেন, 'এ জীবনে পুরিল না সাধ ভালোবাসি' এবং আর একটি গান 'রমা বাম করে অসি অফুট নলিনী দক্ষিণে রহে ধরি।' গান শেখানো শেষ হ'লে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করালেন হরেনমামা এবং আমি তাঁর গানের বিশেষ ভক্ত জেনে ব'লেন পরদিন কা'র বাড়ীতে তাঁর গান আছে, সেখানে যেন শুনতে যাই। তখন কলকাতায় প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় কারুর না কারুর বাড়ীতে তাঁর গান লেগেই থাকত এবং দলে দলে সংগীতপিপাসু ও সংগীতরসিকেরা ছুটতেন তাঁর গান শুনে বিভোর হ'তে। সে যেন এক প্লাবন বইয়ে দিয়ে যেতেন যে-কদিন কলকাতায় থাকতেন। ডাক পড়ত তাঁর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, আবার রামকৃষ্ণ মিশন প্রমুখ নানা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেও। মনে পড়ে একবার সরস্বতী পূজার সময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছি হার্ডিঞ্জ, হিন্দু, মেডিক্যাল কলেজ, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি নানা ছাত্রাবাসে, যেখানে গানের জলসা পূজার অঙ্গবিশেষ ছিল তখন এবং প্রতিযোগিতাও চলত কে কত ভাল গায়ককে তাদের আসরে এনে হাজির করতে পারবে তাই নিয়ে।

স্নেহের প্রশ্রয় পেলাম তাঁর কাছ থেকে প্রথম দিন থেকেই। তারপর প্রায় প্রতিদিনই বলে দিতেন তাঁর কোথায় গান হবে, সেখানে যেতে এবং শেষে বলতেন তাঁর কাছেই চলে আসতে, সঙ্গে ক'রে নিজেই নিয়ে যেতেন সস্নেহে তাঁর পাশটিতে বসিয়ে। আমি তখন নিঃশব্দ শ্রোতা, শুধু তন্ময় হয়ে শুনি ও যতটা পারি আত্মসাৎ করি, তাঁর গাইবার অতুলনীয় রীতি ও প্রকৃতি। তখন তাঁর দুটি মাত্র রেকর্ড বেরিয়েছে, 'জ্বলবার মন্ত্র দিলে মোরে', 'এই পৃথিবীর পথের পরে' এবং 'সেই বৃন্দাবনের লীলা-অভিরাম'। বেরুবামাত্রেই সে যেন এক বিস্ফোরণ, বাংলা গানে এক নব যুগের সূচনার বিঘোষণ। সেই দুটি রেকর্ড সংগ্রহ ক'রে বাজিয়ে বাজিয়ে প্রাণপণে নিজের অক্ষম কণ্ঠে তুলবার জন্য সচেষ্ট আছি তখন। পণ্ডিচেরি যাবার আগে তিনি মাত্র একখানি রেকর্ড রেখে গিয়েছিলেন : 'রাঙা জবা কে দিল তার পায়ে' এবং তাতেই বাজার মাৎ। উল্‌টো পিঠে ছিল তাঁর পিতৃদেবের লেখা একটি কীর্তনাঙ্গ গান : 'ছিল বসি সে কুসুম-কাননে'। মুগ্ধ হয়ে শুনতাম তখন এই দুটি গান এবং আশ্চর্য হতাম তার দীর্ঘায়িত তানকর্তবে, যা ছিল বাংলা গানে একরকম অকল্পনীয় এবং অশ্রুতপূর্ব। এখন বুঝি যে বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করার, হিন্দুস্থানী গানের সমকক্ষ ক'রে তোলার যে-ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তাতে বাংলা গানের এই দুটি বিশিষ্ট রীতিকেই তিনি প্রধানত অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন, একটি টপ্পা অপরটি কীর্তন এবং হয়তো নিজের অগোচরেই তাঁর প্রথম রেকর্ডে এরই স্বাক্ষর তিনি রেখে গিয়েছেন। পরবর্তীকালে অতুলপ্রসাদের গানে লক্ষ্ণৌর ঠুংরির আমেজ পেয়ে এবং নজরুলের গানে গজলের চটুল হিল্লোলের আমদানী দেখে তিনি উল্লসিত হয়ে তাঁদের গানের প্রচারেও আত্মনিয়োগ করেন ও তা জনপ্রিয় করে তোলেন নিজে গেয়ে ও সাহানা, হরেন ইত্যাদি তাঁর অনুগত শিল্পীদের দিয়ে গাইয়ে, রেকর্ড করিয়ে। সাহানার সঙ্গে একত্রে তিনি অতুলপ্রসাদের গানের স্বরলিপিও প্রকাশ করেন 'কাকলি' এই নাম দিয়ে তাঁর গানকে জনপ্রিয় করার জন্য। বাংলাগানের ক্ষেত্রে তাঁর এসব অবদানের কথা দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙালী জাতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত আজ।

রেকর্ড থেকে আমার নকলনবিশির উদ্দাম স্পৃহা ও ঐকান্তিক অনুরাগের কথা তখনও তিনি জানেন না। হারমোনিয়াম বাজাতেও জানি না, সেভাবে গানের কোনও অনুশীলনের সুযোগও হয়নি কোনদিন, আপন মনে গুন্‌গুন্‌ ক'রে খালি গলায় সুর ভাঁজবার অপচেষ্টা তখন সদাসর্বদা লেগে থাকত। সেইভাবেই আগে তুলেছি হরেনমামার অনেক গান, যখনই যা শুনতাম ও ভাল লাগত। দিলীপকুমারেরও এবার পণ্ডিচেরি থেকে প্রত্যাগমনের পর প্রকাশিত রেকর্ড দুটি শোনা মাত্রই প্রাণপণে তা নিজের গলায় তুলে নেবার জন্য তখন আমি সচেষ্ট। হরেনমামা তা জানতেন এবং আমাকে উৎসাহিতও করতেন নিজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে দিয়ে আমরা গানের সঙ্গে এবং কৌতুকে মৃদু মৃদু হাসতেন, তারিফও করতেন আমার নকল করবার ক্ষমতার। দিলীপকুমার এসব কিছু জানতেন না শুধু তাঁর গানের একজন উৎসাহী শ্রোতা ও অদম্য অনুরাগী বলেই জানতেন আমাকে এতকাল সেই ১৯৩৭ থেকে (যখন তিনি প্রথম ফিরে এলেন পণ্ডিচেরি থেকে) ১৯৪১ পর্যন্ত এই চার বৎসর। কিন্তু তারপরই হঠাৎ একদিন ধরা পড়ে গেলাম।

দিনটি আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। ভুলবারও উপায় নেই আর একটি কারণে। সেই দিনটিতেই রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ, ২২শে শ্রাবণ, সম্ভবত ইংরাজি তারিখ ৭ই আগস্ট ১৯৪১, রাখীপূর্ণিমার দিন। সেদিনও সন্ধ্যায় তাঁর এক জায়গায় গান গাওয়ার কথা, আমাকে তাঁর কাছে চলে আসতে বলেছেন বিকেলেই, তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন সেখানে। হরেনমামাও গিয়ে উপস্থিত। আর এদিকে সেদিনই দ্বিপ্রহরে মধ্যাহ্ন-দীপ্তিতেই রবির অস্তগমন। চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে, শোকে মুহ্যমান সমগ্র জাতি, বিশেষ ক'রে বঙ্গবাসীরা।

যা হোক্ আনন্দ-উৎসব তো সবই বন্ধ সেদিন, তাই গানের আসর বসার প্রশ্নই ওঠে না। সারা কলকাতা তখন ছুটছে জোড়াসাঁকোর পথে, নিমতলা শ্মশান ঘাটে। দিলীপকুমার যেতেই এই দুঃসংবাদ দিলেন এবং অনেকক্ষণ কেবল রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই নানা কথাবার্তা বললেন। সকালে জোড়াসাঁকোয় গিয়েছিলেন মুমূর্ষু কবিসম্রাটের শেষ দর্শনের জন্য। সেখানে অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সঙ্গে দেখার কথাও সব বললেন। সেদিন সন্ধ্যায় চুপচাপ বসে এই সব গল্প চলছে, আর তো কিছু করার নেই। হঠাৎ তিনি আমার দিকে ফিরে বলে উঠলেন : 'হ্যাঁ গোবিন্দ! তুমি পড়াশোনায় এত ভাল, গান করতে পারো না?' সঙ্গে সঙ্গে হরেনমামা বলে উঠলেন : 'মন্টু! তাও তুমি জানোনা, ও তোমার গান যা নকল করে, শুনলে চম্‌কে উঠবে।' শোনা মাত্র তিনি ধরে বসলেন, 'এক্ষুনি শোনাও দেখি তোমার গান'। আমার তো তখন হৃৎকম্প, কী গাইব তাঁর সামনে তাঁরই গান, হারমোনিয়াম বাজাতেও জানিনা, আপন মনে গাই, এ কী বিড়ম্বনা! হরেনমামাই হারমোনিয়াম ধরলেন, বললেন : 'শুনিয়ে দে আজ মন্টুকে ওরই বৃন্দাবনের লীলা-অভিরাম।' দুরু দুরু বক্ষে সুরু তো করলাম। সেবার তিনি উঠেছিলেন হরিশ মুখার্জি রোডে তাঁর খুড়তুতো ভাই শচীন্দ্রলাল রায়েদের বাড়ীতে। দোতলায় বসে গল্প-গান চলছিল, হঠাৎ আমি 'বৃন্দাবন-লীলা' গান ধরাতে একতলার রন্ধনশালা থেকে বাড়ীর সব মেয়েরা ছুটে এসেছেন। ভেবেছেন দিলীপকুমারই বুঝি তাঁর বিখ্যাত গানটি ধরেছেন আবার। গান শেষ হতেই দিলীপকুমার হেসে বলে উঠলেন : 'হ্যাঁ রে! একি আমি গাইছি

না তুই গাইছিস্? আমারই তো ভুল হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছিনা! এরকম family likeness বংশগত সাদৃশ্য ঘটল কি করে তোর সঙ্গে আমার গলার?' আমি তো লজ্জায় অধোবদন, কোথায় তাঁর গলা আর কোথায় আমার! এছাড়া শিক্ষা-দীক্ষা, তালিমও কিছুমাত্র নেই আমার গান-বাজনায়। আর তখন গলা রীতিমত বেসুরো, তারপর তিনিই শেখালেন গলা সাধার পদ্ধতি, দেশী-বিদেশী প্রক্রিয়া, কেনালেন জোর ক'রে হারমোনিয়াম। বললেন : 'তোর ধ্রুপদের গলা, ভাল ক'রে ধ্রুপদ শেখা উচিত'। বললাম : 'আপনি তো এখানে থাকেন না, কার কাছে কোথায় গিয়ে শিখব?' সেই থেকে যখনই কলকাতায় আসেন আমাকে নিয়ে সস্নেহে গান শেখাতে বসেন।

তাঁর রক্তেই ছিল এই গান। বংশানুক্রমে তা সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর মধ্যে। পিতামহ দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদের অনুরাগী শিল্পী। পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল উত্তরাধিকার সূত্রে সেই সংগীতের সম্পদ লাভ করেছিলেন সহজেই এবং তার সঙ্গে নিজে কবি ও নাট্যকার হওয়ায় বাংলা গান রচনা ও তাতে সুর দেওয়ায় তিনি মেতে ওঠেন। বিদেশে যাওয়ার ফলে য়ুরোপীয় সংগীতধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং ওদের গানের ওজস্, বলিষ্ঠতা, কোরাসে একত্র গাওয়ার রীতি প্রভৃতি তিনি বাংলা গানেও প্রবর্তন করতে প্রয়াসী হ'ন। বাংলা গানের একজন অদ্বিতীয় গীতিকার ও সুরকার হিসাবে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন তিনি তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে মাত্র সামান্য কিছু গানে। তা-ই তাঁকে অমর করে রাখবে, বাংলা গান যতদিন থাকবে। পিতার ধ্রুপদরীতির সঙ্গে ভাইয়ের এক শ্যালক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রেরণায় টপ্পা ও খেয়ালের ধারা তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে তাঁর গানকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে এবং এক অনন্য মহিমায় মণ্ডিত করে।

পুত্র দিলীপকুমার পিতামহের মতই ওস্তাদি হিন্দুস্থানী গানের একান্ত অনুরাগী হয়ে ওঠেন শৈশব থেকেই। পিতার বাংলা গান তাঁকে বিশেষ আকৃষ্ট করত না। পুত্রের এই ঔদাসীন্যে ক্ষুব্ধ হয়ে পিতা মন্তব্য করেছিলেন : 'বয়সে হ'লে একদিন বুঝবি কী জিনিস আমি রেখে গেলাম।' পিতার পরলোক গমনের পর কিশোর পুত্র ধীরে ধীরে তাঁর এই মন্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে থাকেন যত বয়স বাড়ে। কিন্তু সেই সঙ্গেই তাঁর ঝোঁক চেপে যায় বাংলা গানকে হিন্দুস্থানী ক্লাসিকাল গানের সমকক্ষ ক'রে তুলতে, সুরের বিস্তারে বৈচিত্র্যে তান-কর্তবে। সারা ভারতে ভ্রাম্যমাণ এই গান-পাগল তরুণটি তখনকার সব শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ, এমনকি বাইজিদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছেন তাদের প্রত্যেকের গানের বৈশিষ্ট্য শুনে শুনে আয়ত্ত করার জন্য। কিন্তু নিছক একজন ওস্তাদ গাইয়ে হয়ে ওঠা তাঁর লক্ষ্য ছিল না, যা তিনি অনায়াসেই সেই আপন অসাধারণ কণ্ঠসুষমা ও গীতিপ্রতিভায় হতে পারতেন। তাঁর ধ্যান-জ্ঞান তখন বাংলা গান এবং তার মধ্যে এই সব মীড়, গমক, তান, মুড়কি ইত্যাদি এনে কী ক'রে সৌন্দর্যের নানা বৈচিত্র্যে ভরে তোলা যায় তারই ভাবনায় তিনি আকুল, সমর্পিতপ্রাণ। সুরের পাখায় ভর ক'রে কথা হবে সুদূর নীল নভে উধাও, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। একমাত্র বাংলা গানেই কথা ও সুরের এই নিবিড় রাখীবন্ধন সম্ভবপর ব'লে তিনি মনে করতেন এবং এখানে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন বাংলার একান্ত নিজস্ব গীতরীতি, কীর্তন থেকে, যেখানে মহাজন-পদাবলী বিচিত্র ছন্দে, তালে,

সুরে, আখরে এক অনির্বচনীয় রস সৃষ্টি করতে সক্ষম, যা অন্য কোন গানেই কোথাও দেখা যায় না।

কিন্তু প্রতিভা চিরদিনই একক পদসঞ্চারী, তাই তিনি নিজস্ব পথ কেটেই চলেন, যে-পথে সকলে চলতে রাজী নয়, শঙ্কা-সন্দেহে সমাকুল, সমালোচনায় সরব। দিলীপকুমারের সাংগীতিক জীবনের পরম দুর্ভাগ্য তিনি তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার জন্য দু'দিক থেকেই জাত খোয়ালেন, অপাংক্তেয় হয়ে রইলেন। ক্লাসিকাল গায়করা তাঁর প্রতি অত্যন্ত বিরূপ যে তিনি ঠিক পাকা খেয়াল বা ঠুংরির নিজস্ব ধারায় কখনও গান করেন না, যদিও ইচ্ছা করলেই গাইতে পারেন এবং অসাধারণ গায়ক বা ওস্তাদরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিতও করতে পারেন। আবার ওদিকে বাংলা গানের অনুরাগীরা তাঁর উপর খড়গহস্ত, একান্ত বিমুখ যে এত বেশি কারুকার্যের কেন ভার চাপানো সাদামাটা বাংলার গীতধারার উপর? তাই তাঁর বাংলা গান কোনদিনই জনপ্রিয় হল না। কারণ তার রূপায়ণ যত্র তত্র যে-কোন গায়ক-গায়িকার পক্ষে সম্ভব নয়। ক্লাসিকাল গানের চর্চা যাঁরা করেছেন একমাত্র তারই ভিত্তিতে তাঁদের কণ্ঠে দিলীপকুমারের গান ফুটিয়ে তোলা সম্ভব, আবার তা সত্ত্বেও তাঁর নিজস্ব গায়কি, গীতরীতি আয়ত্ত করা আর এক অসম্ভব ব্যাপার। সেখানে এসে পড়ে রূপ ছাড়া তাঁর গানের ভাবের ব্যাপার, বলতে গেলে যা তাঁর গানের প্রাণ।

দিলীপকুমারের গানে তাই সব সময় লক্ষ করা যায় 'রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে অঙ্গ' আবার 'ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে ছাড়া', এক হিসাবে যা বাংলা গান মাত্রেরই মূল কথা, প্রাণের মন্ত্র। কিন্তু দিলীপকুমার চেয়েছেন রূপের মধ্যে অলঙ্করণ ঐশ্বর্য আর ভাবের মধ্যে ফোটাতে চেয়েছেন আন্তরিকতার মাধুর্য। এইখানে তিনি ব্যতিক্রমী, অন্যান্য বাংলা গীতিকার-সুরকার থেকে আলাদা। গানের মূল জিনিস ছিল তাঁর কাছে ভাব বা অনুভূতি, যা তার প্রাণ, হৃদয় থেকে উৎসারিত। পিতা দ্বিজেন্দ্রলালের কাছ থেকেই এই ভাব বা প্রাণের দীক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন, যে-দ্বিজেন্দ্রলাল কয়েকটি ছত্রে গানের প্রাণ-ভোমরার কথা ব্যক্ত ক'রে গিয়েছেন অনবদ্য ভঙ্গীতে :

হোক্ না শুদ্ধ স্বরের ভঙ্গী
হোক্ না শুদ্ধ তান ও লয়,
গানের সঙ্গে নেইকো প্রাণ যার
তাহার সে-গান গানই নয়।

দিলীপকুমারও তাই বলতেন 'I sing what I feel'! মন্তব্যটি তিনি করেছিলেন মনে পড়ে একদিন সংগীত সমালোচক বন্ধু ধূর্জটিপ্রসাদকে লক্ষ্য করে একটু বিরক্ত হয়েই, যখন বন্ধু তাঁর গানের আসরে প্রায়ই অনুরোধ করেন : 'মন্টু! এ-সব কী গাইছ, একটা বাঘা গান গাও, শুনে মন-প্রাণ ভরপুর ক'রে ফিরে যাই।' মন্টু তার এই বারম্বার অনুরোধে উত্ত্যক্ত হয়ে শেষে বলেন : 'দেখো ধূর্জটি! আমি যখনই যেখানে গান গাইতে যাই, তুমি কেবলই ঐ এক অনুরোধ করো বার বার, বাঘা গান গাও। আমি আমার অনুভবকেই প্রকাশ করি গানে, সুরের ফুলঝুরি ফোটানো বা তালের কসরৎ দেখানো আমার লক্ষ্য নয়।'

তেমনি তাঁর আর এক বন্ধু বিশিষ্ট ভাস্কর ও শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর একটি মন্তব্যের কথা মজা ক'রে শোনাতেন দিলীপকুমার। দেবীপ্রসাদ তখন মাদ্রাজে। দিলীপকুমারও সেখানে এসেছেন পণ্ডিচেরি থেকে। বসেছে গানের আসর, খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন সংগীতরসিক ও বিশিষ্ট বোদ্ধা দেবীপ্রসাদ প্রাণ ভরে গান শুনবেন ব'লে। দিলীপকুমার গেয়ে চলেছেন ভজনের পর ভজন আপন অনবদ্য ভঙ্গীতে। শেষে দেবীপ্রসাদ আর থাকতে না পেরে তাঁকে বলে বসলেন : 'এ সব কী গাইছেন দিলীপবাবু! আমি তো জানি আপনি কত বড় শিল্পী, একটা ঠুংরি শুনিয়ে দেন, শুনে মশ্‌গুল্‌ল্‌ হয়ে বাড়ী যাই'। দিলীপকুমার তখন আর কী করেন, 'ইত্‌না তো করো হে স্বামী' বলে একটি ভজন ঠুংরির নানা কারুকার্য ক'রে শোনালেন তাঁকে। শুনে দেবীপ্রসাদ বললেন : 'এ তো ঠুংরি হ'লনা দিলীপবাবু! আপনি তো সেই ভজনই গাইলেন, এমন ক'রে ঠকালেন আমাকে।' গল্পটি ব'লে উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়তেন দিলীপকুমার, দেবীপ্রসাদের মশ্‌গুল্‌ হওয়া হ'লনার বর্ণনা দিয়ে।

মশ্‌গুল হ'তেন দিলীপকুমার ভাবে। এমন তন্ময় হয়ে যেতেন গান ধরামাত্র, সুর ছোঁওয়া মাত্র যেন তিনি এক অন্য মানুষ। পারিপার্শ্বিক সব কিছু এই পার্থিব লোকের যেন লুপ্ত হয়ে যেত তাঁর কাছে তখনকার মতো, আর তিনি জেগে উঠতেন এক ভাবলোকে এবং তাকেই যেন প্রকাশ ক'রে চলতেন অশ্রান্তভাবে সুরে ও কথায়। শুনতে শুনতে শ্রোতারা হয় তো ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। সময় দীর্ঘায়িত হচ্ছে দেখে বাড়ী ফেরার জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন, সে-সব দিকে তাঁর কোনও লক্ষ্যই নেই, আপন মনে গেয়েই চলেছেন কখনও সুর, কখনও কথাকে পল্লবিত ক'রে। স্বয়ং কবি ছিলেন ব'লে গাইতে গাইতে কথাকেও নানাভাবে ভেঙ্গে গড়ে বিস্তৃত করে যেতেন, কীর্তনে যাকে আখর বলা হয় সেই রীতিতে। তাঁর বিখ্যাত গান 'বৃন্দাবনের লীলা অভিরামে' এর সামান্য নমুনা তিনি রেকর্ডে রেখে গিয়েছেন 'ওরা জানেনা, তাই মানে না' ইত্যাদির মধ্য দিয়ে।

কথা ও সুরের সুষম সমাহারেই গানের পূর্ণাঙ্গ রূপ ফুটে ওঠে। কথার মধ্যে যেখানে যে ভাবটি প্রকাশিত ঠিক তারই অনুরূপ সুর বসিয়ে তাকে প্রকাশ করার মধ্যে সুরকারের যথার্থ কৃতিত্ব। এই blending, এই মেলবন্ধনেই ছিলেন আশ্চর্য দক্ষ দিলীপকুমার। রবীন্দ্রনাথের গানেও এইটি বিশেষভাবে লক্ষ করার বিষয় যে যেখানে যেমনটি কথা ঠিক তারই অনুরূপ সুর। দিলীপকুমারের আরও কৃতিত্ব ও চমৎকারিতা এইখানে যে একসুর থেকে হঠাৎ অন্য এক সুরে চলে গিয়ে আবার কেমন আশ্চর্যভাবে মিলিয়ে দেন মূল সুরে, অথচ কোথাও এতটুকু বিসদৃশ বা বেখাপ্পা মনে হয় না কখনও। মূলে হয়তো কীর্তনের সুর কিন্তু 'নিশি কর ভোর' এই লাইনে লাগালেন ভৈরোঁর ছোঁয়াচ। আবার হিন্দী একটি গান ভজনের সুরে আরম্ভ করলেন অথচ 'অব সাঁঝ-ভঈ'তে এনে ফেললেন পুরোপুরি পূরবীর সুর. শেষে অবলীলাক্রমে ফিরে গেলেন মূল সুরে। একঘেয়েমি তিনি একেবারেই দেখতে পারতেন না কী সুরে, কী তালে। তাই সুর থেকে সুরান্তরে, তাল থেকে তালান্তরে তাঁর গানের অবিরাম আন্দোলন। সুস্থিতি নেই যেন কোথাও, অবিরাম গতি, বাঁকে বাঁকে নব নব বিস্ময়ের চমকপ্রদ বিন্যাস। রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন এক শান্ত সুস্থিতির মহিমা, ব্রহ্মোপাসনার স্থির ধীর গাম্ভীর্য, দিলীপকুমারের

গানে ঠিক তার বিপরীত রূপ, সদা অশান্ত, আরাধ্য সেই চির চঞ্চল চপলচরণ মন মোহনেরই অনুরূপ যেন এই আরাধনা। তাঁর গানে প্রেমের তরঙ্গ, সুরের ঢেউয়ের যেন বিরাম নেই। তাঁর গান জনপ্রিয় না হওয়ার এটিও একটি কারণ বলে আমার মনে হয়। কোনো বাঁধা ছকের মধ্যে তাকে আবদ্ধ করা যায়না, নিয়ন্ত্রিত একটি অনড় কাঠামোর মধ্যে তার সঞ্চরণ সম্ভব নয়। তাই স্বরলিপি দেখে তাঁর গান আয়ত্ত করা বা তার নিজস্ব রূপ ফুটিয়ে তোলা যায় না।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের স্বরলিপি যখন তিনি প্রথম প্রকাশ করেন ১৩৩১ বঙ্গাব্দে, তখন তার ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন :

'স্বরলিপি দেখে গান শিক্ষা সম্বন্ধে আমার একটা কথা বলবার আছে। সেটা এই যে কোনও গানের মধ্যে রসসঞ্চার কর্ত্তে হলে শুষ্ক হুবহু অনুকরণে হয় না। কোনও গানকে প্রাণে মূর্ত্ত করে তুলতে হ'লে তাকে নিজের সৌন্দর্য-অনুভূতি অনুসারে একটু আধটু বদলে নিতেই হয়। একজন গায়ক একটি গান যেভাবে গান করেন তাঁর বন্ধু বা শিষ্য কখনই ঠিক সেভাবে গাইতে পারেন না। এটা বাঞ্ছনীয়ও নয়। এ ছাড়া একটা গান কোনও গায়কই সব সময়ে হুবহু একভাবে গেয়ে থাকেন না। এই কথাটি মনে রাখলে স্বরলিপি দৃষ্টে কোনও গানকে নিজের সৌন্দর্যবোধ দিয়ে একটু আধটু পরিবর্ত্তিত করে নেওয়ার সুবিধা হবে বলে মনে হয়। নৈলে কোনও গানকে হুবহু নকল করার চেষ্টার মতন বিড়ম্বনা আর্টে অল্পই আছে। য়ুরোপীয় গান অনেকটা এ হুবহু নকল ব'লে তার মধ্যে গায়কের নিজের individuality বা ব্যক্তিত্ব ফোটাবার ক্ষমতাও আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতের চেয়ে অনেক কম। স্বরলিপি তৈরি করার এই একটা বিপদ আছে যে তাতে গানের আদ্যন্তকে একেবারে ধরাকাটের মধ্যে ফেলার সম্ভাবনা বড় বেড়ে যায়, যেমন য়ুরোপীয় গানে হয়েছে। এই আশঙ্কার কথা মনে করেই এ সাবধান-বাক্য প্রয়োগ করা দরকার মনে কর্লাম।'

তাঁর এই সব মন্তব্য থেকে একটা কথা সুস্পষ্ট যে তিনি গানকে সর্বদা মুক্ত রাখতে চেয়েছেন। strait jacket-এ আবদ্ধ করতে চাননি এবং শিল্পী বা গায়ককে অবাধ স্বাধীনতা দিতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সেখানেই আপত্তি। তাঁর আশঙ্কা সকলকে এরকম স্বাধীনতা দিলে তাঁর গানের ওপর তারা স্টীম-রোলার চালিয়ে দিয়ে মূল রূপটিই চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দেবে, যার ফলে তাঁর গানের আসল রূপই হারিয়ে যাবে বা চাপা পড়ে যাবে। অবশ্য দিলীপকুমারের মতো প্রতিভাবান শিল্পীকে এ স্বাধীনতা দিতে তাঁর তত আপত্তি ছিল না, যদিও কুণ্ঠা নিশ্চয়ই ছিল। তা না হলে দিলীপকুমারের তাঁর একটি বিখ্যাত গান 'হে ক্ষণিকের অতিথি' একটু ভৈরবীর অলঙ্করণ সহযোগে তাঁকে গেয়ে শোনালে তিনি তার তারিফ করলেও যখন গ্রামোফোন রেকর্ডে সেটি গেয়ে তিনি প্রচার করতে চাইলেন, তখন গ্রামোফোন কোম্পানীকে তিনি এ কথা জানাতেন না যে সেটি প্রকাশ না করলেই ভালো হয়। তা প্রকাশিত হলে হয় তো রবীন্দ্রসংগীতের অন্য এক দিগন্ত উন্মোচিত হ'ত, যা রবীন্দ্রনাথের কাম্য ছিল না।

অথচ রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রেও স্বরলিপির বাঁধা ধরা নিগড়ে আবদ্ধ থাকাও সম্ভব হচ্ছেনা, কারণ ইদানীং শুনতে পাচ্ছি রবীন্দ্রসংগীতের যে সব রেকর্ড করানো হচ্ছে

রেডিওতে বা রেকর্ড সেখানে সেই সব গানের পরিচালকবৃন্দ বেচারী তরুণ শিল্পীদের মাথার উপর সর্বদাই স্বরলিপির খাঁড়া ঝুলিয়ে রাখছেন, সামান্য ব্যতিক্রম হ'লেই কোপ বসিয়ে তা বাতিল ক'রে দিচ্ছেন বা আবার শুদ্ধ ক'রে গাওয়াচ্ছেন স্বরলিপির তিলমাত্র ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে। তার ফলে কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের মূল ভাব ও রূপ ক্ষুণ্ণ হ'চ্ছে দুই-ই অনেকে এ অনুযোগ করছেন এবং রেকর্ডিং কর্তৃপক্ষ শেষ অবধি শিল্পীকে তার নিজের মতো ক'রেই গাইতে বলছেন যেমন চিরকাল শুনে ও শিখে এসেছেন সেইভাবে, পরিচালকের নিয়ন্ত্রণ বা হুমকিকে উপেক্ষা ক'রে। এ কথা সর্বজনবিদিত যে নিজস্ব গায়কীতে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করার ফলে দেবব্রত বিশ্বাস ব্রাত্য অপাংক্তেয় হয়েই রইলেন এই সব উন্নাসিক স্বরলিপি অনুবর্তনকারীদের চোখে অথচ জনসাধারণের কাছে, রবীন্দ্রসংগীতরসিক মাত্রেরই কাছে তিনি সবচেয়ে জনপ্রিয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী রবীন্দ্র সংগীত-শিল্পী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইলেন চিরদিনের জন্য।

রবীন্দ্রসংগীতের এই গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করলে সকলকে স্বীকার করতেই হবে দিলীপকুমারের মন্তব্যের যাথার্থ্য যে বিশেষ ক'রে বাংলা গানের ক্ষেত্রে সর্বত্র এবং সাধারণভাবে সব ভারতীয় সংগীতেই individuality বা শিল্পীর স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তার একটি বিশেষ স্থান ও অবদান আছে। তাই দিলীপকুমার সব সময়েই শিল্পীকে স্বাধীনতা দেবার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। মনে পড়ে এই প্রসঙ্গে পুণার হরিকৃষ্ণ মন্দিরে গান গাওয়ার সময় শেষের দিকে তাঁর একটি মন্তব্য ইন্দিরা দেবীর জিজ্ঞাসার উত্তরে। তিনি সেদিন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে শেখা সম্ভবত 'নিবিড় আঁধারে মা গো চমকে ও রূপরাশি' গানটি গাইছিলেন এবং গান শেষ ক'রে বললেন : 'এটি আমি সুরেনমামার কাছে শিখেছিলাম, তবে একটু-আধটু নিজের মত ক'রে বদলেও নিয়েছিলাম, যা শুনে তিনি খুব তারিফও করেছিলেন।' সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরা আমাকে দেখিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'হ্যাঁ দাদাজি! গোবিন্দদাও কি তোমার গানে নিজের মতো কিছু করেন নাকি?' তখনই হেসে তিনি জবাবে বললেন : 'হ্যাঁ, একটু আগেই ও যখন গাইছিল আমার গান, তখন লক্ষ করছিলাম এখানে-ওখানে বেশ কিছু নতুন লাগাচ্ছে নিজের মতো ক'রে। তা বেশ ভালোই লাগছিল।' অর্থাৎ আমার মতো অক্ষম শিল্পী তাঁর সম্পূর্ণ অনুকরণে বা অনুসরণে অসমর্থ হয়ে এদিক-ওদিক একটু ব্যতিক্রম করে ফেলছি দেখেও তিনি তাঁর ক্ষমাসুন্দর চোখে শিল্পীর স্বকীয়তা বলেই বরণ ক'রে নিলেন তাকে এবং উৎসাহিত করলেন তার স্বকীয়তাকে বজায় রাখার জন্য।

আবার এ-ও শুনেছি—এটা আমার শোনা গল্প—শেষের দিকে পরিণত বয়সে তিনি একবার দিল্লি এসেছেন এবং খবর পেয়ে তাঁর একান্ত অনুরাগী ও ভক্ত কাশ্মীরের ভূতপূর্ব মহারাজকুমার ডক্টর করণ সিং তাঁকে সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছেন এক সন্ধ্যায় ভজন গাইতে। দিলীপকুমারের গাইতে কষ্ট হচ্ছে দেখে করণ সিং বললেন : 'দাদা! আপনি বিশ্রাম করুন, এবার আমি আপনার গান গেয়ে শোনাই।' করণ সিং সুকণ্ঠ এবং ক্লাসিকাল রাগ-রাগিণীতে তালিম নেওয়া সংগীত-অভিজ্ঞ পুরুষ। দিলীপদার ভজনও খুব ভালবাসেন তাই নিজেও গান তার দু'চারখানা যখন মন চায়। তাই তিনি গান ধরলেন এবং তাঁর গানের শেষে দিলীপকুমার বাড়ী ফিরে মন্তব্য করলেন : 'আমার গান একেবারে murder ক'রে ছাড়ল!'

সুতরাং এই লাইন টানাটাই সব চেয়ে কঠিন ব্যাপার, এই সীমারেখা নির্দিষ্ট করা। গান কোথায় তার স্বকীয়তা হারায়, খুন হয় অর্থাৎ তার প্রাণবিয়োগ ঘটে, তাকে আর চেনাই যায় না সেই গান ব'লে, আর কোথায় বা সামান্য হেরফের সত্ত্বেও যেন সে আরও সমুজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে এবং বুঝিয়ে দেয় এটা কা'র গান। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত তাঁর গান প্রাণ হারাবে তেমন শিল্পীর হাতে পড়লে, এই ভেবে তাকে স্বাধীনতা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু মূল কথাটি হ'ল গানের প্রাণকে চেনা, তার ভাবটি ধরা। সেটি যথাযথভাবে চিনে বা জেনে যে শিল্পী সেটিকে যতদূর সম্ভব নিখুঁত করে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, তিনিই সার্থক শিল্পী।

গানে আছে মূলত দুটি জিনিস : একটি তার বিষয়, অপরটি হ'ল আশ্রয়। বিষয় সে সংগ্রহ করে কথা থেকে আর সুর তাকে আশ্রয় দিয়ে পল্লবিত সুশোভিত অলঙ্কৃত করে তোলে। একটি content অপরটি form। দিলীপকুমারের গান বিষয়ের দিক দিয়ে আবর্তিত হয়েছে একটিমাত্র কেন্দ্রকে অবলম্বন ক'রে এবং সেই হিসাবে তা এক সংকীর্ণ পরিধির মধ্যেই যেন আবদ্ধ। তাঁর গান সব লোকের কাছে উপভোগ্য না হওয়ার বা জনপ্রিয় না হওয়ার এ-ও একটি কারণ। তাঁর সব গানই ভগবদ্‌বিষয়ক বা ভক্তিমূলক। সুরের আশ্রয়ে তিনি তাঁর অন্তরের এই একমাত্র মৌল বা কেন্দ্রিক ভক্তিভাবকে প্রকাশ করে গিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তি-মানস এই ভক্তিরসে জারিত ছিল, হয়তো সেটি তিনি কৌলিক বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকারসূত্রেই লাভ করেছিলেন। বারেন্দ্রবংশোদ্ভূত এই অদ্বিতীয় শিল্পীর ধমনীতে যেন অদ্বৈতাচার্যেরই 'কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি' অলক্ষে সঞ্চারিত ও প্রবাহিত ছিল। হয় তো সে-কারণেই আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের কাছ থেকে যখন তিনি মীরার ভজনের সন্ধান পা'ন, তখন সেই 'চাকর রাখোজী'ই তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র হয়ে ওঠে এবং সেই ভজন গানেই নিজের জীবনকে তিনি উৎসর্গ করে দেন। হিন্দুস্থানী ওস্তাদি গানের বিরল বোদ্ধা ও রসিক শিল্পীদের মধ্যে একজন ছিলেন গৌরীপুরের রাজকুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তিনি অকুণ্ঠে স্বীকার করতেন ভজন-গানে দিলীপকুমারের সমকক্ষ ভারতবর্ষে কেউ নেই। একে একে সব সন্তদের ভজনকেই তিনি আত্মসাৎ করেছিলেন, মীরা থেকে আরম্ভ ক'রে তুলসীদাস, সুরদাস, নানক, কবীর প্রভৃতি সকলের রচনাতেই সুর-সংযোগ ক'রে আপন অনবদ্য ভঙ্গীতে তিনি গেয়ে যেতেন আত্মহারা হয়ে। বর্তমান প্রজন্মেরও যারই রচনার মধ্যে তিনি এই ভক্তির যথার্থ প্রকাশ দেখতে পেতে অমনি সাগ্রহে সেটি সংগ্রহ ক'রে সুর দিতে বসে যেতেন ও সকলকে গেয়ে শোনাতেন। এইভাবে মধ্যপ্রদেশের তুক্‌ড়োদাস, বরোদার মুসলমান সাধিকা রৈহানা তায়েবজি, যাঁরই রচনার সন্ধান পেয়েছেন তাকেই তুলে ধরেছেন সকলের সামনে। শেষের দিকে বাঙালী এক প্রায় অখ্যাত কবি শান্তশীল দাসের রচনায় তিনি মুগ্ধ হয়ে নিজে থেকে সুর সংযোজন করে স্বরলিপিসমেত আমাকে পাঠিয়ে লেখেন : 'ভক্তির গান সকলে লিখতে পারেনা, এই মানুষটির আশ্চর্য ক্ষমতা ভক্তিকে প্রকাশ করার। পারলে অহনাকে দিয়ে এর গান রেকর্ড করাস্ এবং নিজেরাও গাস্'। আমার জেষ্ঠ্যা কন্যা স্বস্তিকাকে তিনি অহনা ব'লে ডাকতেন, সে তখন নেহাৎ বালিকা, সুকণ্ঠী গায়িকারূপে সবে আত্মপ্রকাশ করছে। তিনি ভাবতেন তাঁর যুগে যেমন তাঁর কথায়

সঙ্গে সঙ্গে সব রেকর্ড হয়ে যেত, তেমনি এ-যুগেও বুঝি সাগ্রহে এগিয়ে আসবে গ্রামোফোন কোম্পানী এই জাতীয় ভক্তিগীতি রেকর্ড করাতে। কিন্তু হায়! তিনি পুণায় আপন হরিকৃষ্ণ মন্দিরে বসে বুঝতে পারতেন না যে এখন যুগ পাল্‌টেছে, এ-সব জীবনবিমুখী গানে কেউ আর কর্ণপাত করেনা, সবাই চায় জীবনমুখী গান।

মানুষটি কিন্তু মোটেই জীবনবিমুখী ছিলেন না কোনদিন। একান্ত জীবনরসিক প্রাণচঞ্চল হাস্যোচ্ছল পরিহাসপ্রিয় মানুষ এই দিলীপকুমার! গানে হয় তো সেই কারণেই তাঁর স্বভাবের প্রতিফলন ঘটেছে, যেন এক উদ্দাম চিরচঞ্চল গতি তাঁর গানে লক্ষ করা যায়। আর সেই সঙ্গে ভাবাবেগ, ভাবোন্মাদ, হৃদয়ের তন্ময়তা। নিজের সম্বন্ধে নিজেই বলেছেন অনেক জায়গায় : 'স্বভাবে আমি ঝোঁকালো মানুষ'। যখন যেদিকে বা যার দিকে ঝুঁকেছেন সম্পূর্ণভাবে তাতে নিজেকে যেন ঢেলে দিয়েছেন। পিতা দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যেও ছিল এই উচ্ছ্বাসপ্রবণতা, যা তাঁর কাব্য, নাটক ও গানে উৎসারিত এবং হয়তো পুত্রের মধ্যে পিতার থেকেই উত্তরাধিকার-সূত্রে তা সঞ্চারিত। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমেও যখন তিনি সংগীত-জগতে বিপুল যশ, খ্যাতি, উন্মাদনা সব পিছনে ফেলে চলে গেলেন ১৯২৮ সালে এবং রইলেন একটানা নয় বৎসর বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়েই বলা চলে আশ্রমের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে, তখনও তাঁর পক্ষে গম্ভীরানন অন্তর্মুখী যোগীতে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব হয়নি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দিব্য জীবনের দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে মানুষের physical, vital, mental ইত্যাদি নানা স্তর বা প্রকৃতির কথা বলেছেন এবং তাকে শেষ supramental-এ অতিমানসে রূপান্তরিত করার স্বপ্ন দেখেছেন। দিলীপকুমার যখন পণ্ডিচেরিতে যোগসাধনায় নিমগ্ন তখন তাঁর গুরুভাইরা পরিহাসচ্ছলে দূর থেকে তাঁকে দেখিয়ে বলতেন : 'ঐ দেখ, vital আসছে'। অর্থাৎ তিনি যেন প্রাণেরই প্রমূর্তরূপ বা দেহধারী বিগ্রহ।

মনে পড়ছে হাসির গানের এক সময়ে অদ্বিতীয় গায়ক ছিলেন যে নলিনীকান্ত সরকার তাঁর মুখে শোনা একটি বড় কৌতুককর গল্প দিলীপকুমার সম্বন্ধে। নলিনীদাও শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যরূপে শেষ জীবন পণ্ডিচেরি আশ্রমেই কাটিয়েছেন এবং দিলীপকুমারের সঙ্গে তার আগে থেকেই খুব অন্তরঙ্গ সৌহার্দ ছিল তাঁর গানবাজনার সূত্রে। দীর্ঘ নয় বৎসর পরে ১৯৩৭ সালে দিলীপকুমার ফিরে এসেছেন কলকাতায়, উঠেছেন সেই তাঁর মেজমামার বাড়ীতে, যিনি তকুমামা নামে পরিচিত ছিলেন। দলে দলে লোক আসছে, গায়ক-বাদক, সাহিত্যিক, সমালোচক, সাংবাদিক, আবার আধ্যাত্মিক জগতেরও জিজ্ঞাসু কিছু কিছু মানুষ। দিনরাত গল্প-গুজব, গান-বাজনায় বিভোর হয়ে আছেন দিলীপকুমার। এতদিনের অবরুদ্ধ ভাবাবেগ মুক্তি পেয়ে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাঁকে পুরানো সব বন্ধুবান্ধব, অনুরাগী, গুণগ্রাহী মানুষদের সাহচর্যে। তকুমামার বাড়ীতে সেই সময় একদিন নলিনীকান্তও গিয়েছেন এবং একান্তে আড়ালে বসে তকুমামার সঙ্গে কথালাপে মগ্ন থাকার সময় তাঁকে বললেন : 'দেখুন তকুমামা! এতদিন আমার শ্রীঅরবিন্দের উপর প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু এবার মন্টু তাঁর আশ্রম থেকে এখানে ফেরার পর আর আমার বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা নেই তাঁর উপর।' তকুমামা জিজ্ঞাসা করলেন : 'কেন? তোমার এ ভাবান্তরের কারণ কী?' উত্তরে নলিনীদা বললেন : 'দেখুন, দীর্ঘ

নয় বছর ধরে—এক আধ দিন নয়—এই মন্টু তাঁর আশ্রমে তাঁরই সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে একান্তবাস ক'রে এল, অথচ তার স্বভাবের বিন্দুমাত্রই পরিবর্তন হ'লনা। সেই হৈ চৈ, হাসি ঠাট্টা, গালগল্প, গান বাজনায় ঠিক তেমন মত্ত!' শুনে একুট গম্ভীর হ'য়ে তকুমামা তখন বললেন : 'দেখো নলিনী! আমার কিন্তু ঠিক উল্‌টো প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এতদিন আমার শ্রীঅরবিন্দের প্রতি কোন ভক্তি শ্রদ্ধা অনুরাগ ছিল না। এবার মন্টু ফিরে আসার পর তাকে দেখে তাঁর উপর আমার অগাধ শ্রদ্ধা জন্মেছে। এই মন্টুকে তিনি কেমন ক'রে দীর্ঘ নয় বৎসর পণ্ডিচেরিতে আটকে রাখলেন, এ এক অলৌকিক তাঁর যোগশক্তি, এ-কথা মানতেই হ'বে।' কাহিনীটি আমাকে ব'লে নলিনীদাও যত হাসেন, শুনে আমিও তত হাসি এবং সেই মানুষটির অবিস্মরণীয় প্রাণচঞ্চল প্রকৃতির যা কোনোদিনও এতটুকুও বদলায়নি—তারই আস্বাদনে পরস্পর আলাপনে বিভোর হ'লাম দুজনে।

তেমনি মনে পড়ে তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু এবং অধ্যাত্মপথের প্রেরণাদাতা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের একটি গল্প, যেটি তিনি আমাকে হাসতে হাসতে শুনিয়েছিলেন প্রাণপ্রিয় বন্ধুটির অপ্রতিরোধ্য স্বভাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে। গিয়েছিলেন সেবার শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বন্ধুর একান্ত অনুরোধে ও আহ্বানে পণ্ডিচেরি শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনে। বললেন : 'গিয়ে দেখলাম ওখানকার আশ্রমে কী অদ্ভুত নিয়মশৃঙ্খলা, সব ঘড়ির কাঁটার মতো সুনিয়মিত ছন্দে চলছে। কিন্তু হ'লে হবে কী? দিলীপকে কে ঠেকাবে? সে হল বিশ্বনাথের ষাঁড়। জানো তো তুমি কাশীতে ছিলে, সেই কাশীর গলিতে সবাই শান্ত সুস্থিরভাবে চলছে বিশ্বনাথ মন্দিরের দিকে, কেউ বা কেনাকাটা করছে নিশ্চিন্তমনে। হঠাৎ কোথা থেকে সেই গলিতে একটি ষাঁড় ঢুকে পড়ে সব বিপর্যস্ত ক'রে দিল, কে কোথায় ছিটকে পড়ল প্রাণ বাঁচাতে। ঠিক তেমনি পণ্ডিচেরিতে দেখলাম সবাই সুশৃঙ্খলভাবে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে চলেছে একের পিছন আর একজন শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনে। কিন্তু দিলীপ সে-সব লাইনের কোনও তোয়াক্কা না ক'রে যেখান সেখান দিয়ে এগিয়ে চলল আমাকে নিয়ে। শুধু কি তাই? আগের দিন রাত্রে সে শ্রীঅরবিন্দকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছে যে আগামী কাল আপনার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেম যাবে আমার সঙ্গে, সে থাকবে ঠিক আমার পিছনেই the man next to me will be Krishna Prem এবং সম্ভব হলে তার দিকে চেয়ে আপনি একটু হাসবেন, And if possible, give him a smile. দেখো তার কাণ্ড। গুরুকে হুকুম করছে এমনি করে! সে বেচারাই বা কী করেন, দিলীপকে তো আর বিরূপ করতে পারেন না। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই আমার দিকে চেয়ে একটু মৃদু হাসলেন।'

সুতরাং সব বিধিনিয়ম শৃঙ্খলার পারে ছিলেন এই মানুষটি। কী গানের ক্ষেত্রে, কী জীবনের ক্ষেত্রে বাঁধাধরা পথে তিনি কোনদিনই চলতে রাজি ছিলেন না। উল্‌টে ইচ্ছা করে সব বিধিনিষেধ ভেঙে লোকের চোখে নিজেকে হেয় করতেও তাঁর বাধত না, বরং তাতে তিনি আমোদ পেতেন, কৌতুক বোধ করতেন। সেদিনই তাঁর এই দুষ্টুমি বুদ্ধির গল্প আবারও শুনতে পেলাম লীলা দেশাইয়ের কাছে গিয়ে, যিনি প্রখ্যাত হয়েছিলেন এক সময়ে চিত্রতারকা হিসাবে। এখন অশীতিপর বৃদ্ধা, কিন্তু আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে যেন ফিরে গেলেন সেই যৌবনের দিনগুলিতে। বললেন : 'কতরকম মজাই না করতেন মন্টুদা। একদিন তাঁর গান শুনতে গিয়েছি, একটু পরেই সুভাষচন্দ্র এলেন। আমি তো সন্ত্রস্ত তাঁকে দেখে, সসম্ভ্রমে দূরে সরে বসছি কিন্তু মন্টুদা বললেন
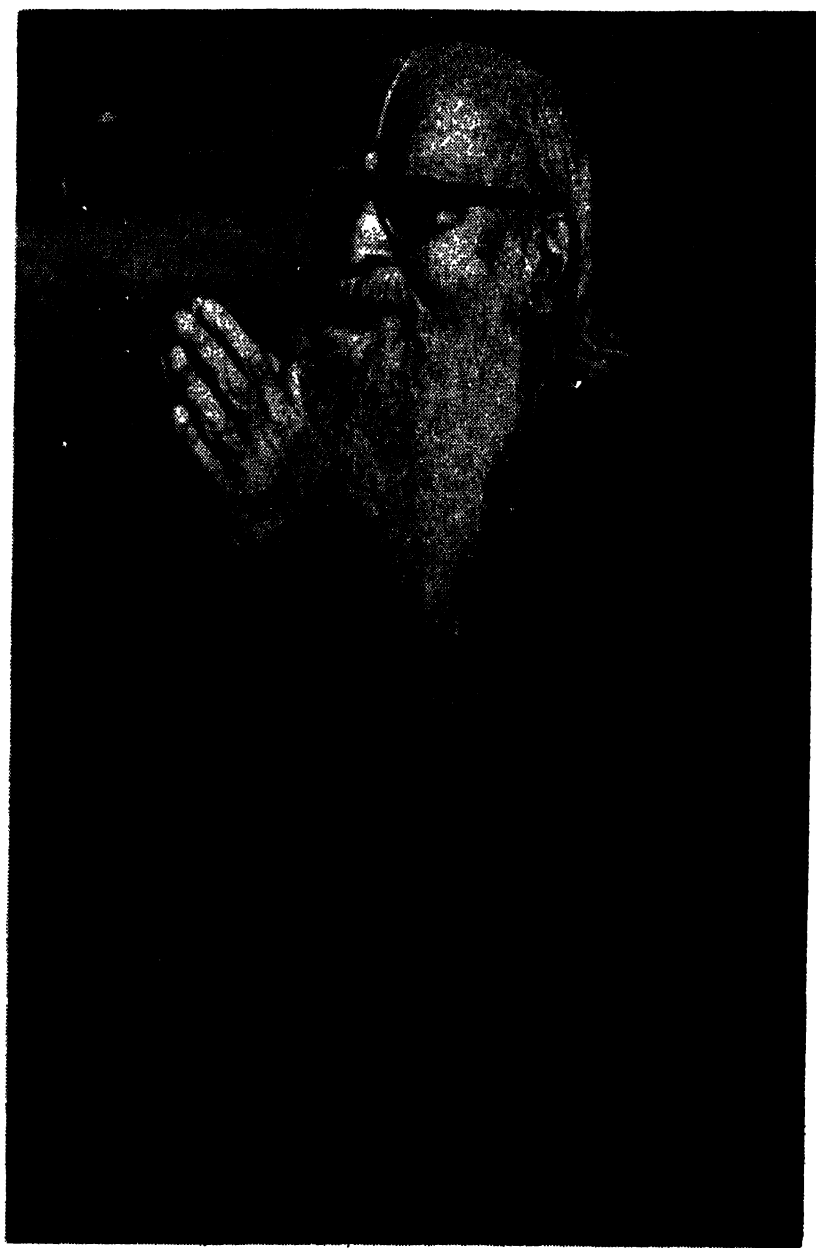
শেষ বয়সে দিলীপকুমার

তুমি ওর পাশে বোসো, গল্প করো ওর সঙ্গে। মন্টুদা ভাল করেই জানতেন বন্ধুটি তাঁর রাশভারি লোক এবং চিরকুমার দেশব্রতী, তিনি নারীসঙ্গ থেকে দূরে থাকাই পছন্দ করেন। বন্ধুকে বিব্রত করার জন্যই জোর ক'রে আমাকে তার পাশে বসিয়ে ছাড়লেন যে-কিনা তখন সিনেমার এক নামজাদা নায়িকা। তাঁরও যেমন অস্বস্তি, আমারও তেমনি অস্বস্তি বোধ হ'চ্ছে ঐভাবে তাঁর পাশে বসে থাকতে। কিন্তু মন্টুদার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, বসে কেবল মজা দেখছেন। তেমনি আর একদিনের ঘটনা। গিয়েছি তাঁর কাছে আমি এবং মৈমনসিং সুষঙ্গের রাজবংশের পুত্রবধূ রেবা সিংহ যাঁর স্বামী সুধীন সিংহ মন্টুদার প্রাণের বন্ধু। রেবাদিও অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন, তখন পূর্ণযৌবনা। তারপর এক জায়গায় মন্টুদার বেরুবার কথা। একটি হুড্ওয়ালা মোটর গাড়ী দুয়ারে দাঁড়িয়ে। বেরিয়ে এসে তিনি মোটরের পিছন সীটে নিজে মাঝখানে বসলেন এবং একপাশে আমাকে ও আর একপাশে রেবাদিকে বসালেন। তারপর নিজের দুদিকের হাত প্রসারিত ক'রে আমাদের দুজনের গলা জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন মোটরের হুড্টা খুলে দাও, সবাই ভালো ক'রে দেখুক। গাড়ী চলছে আর আশেপাশের বাস ট্রাম মোটর থেকে সবাই অবাক হয়ে দেখছে গৈরিকধারী সুদর্শন এ কেমন সাধু যে দুটি রমণীকে বাহুবেষ্টনে বেঁধে সবাইকে দেখিয়ে রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছে।'

কৌতুকপ্রিয়তার তাঁর শেষ ছিল না, ছিল না শেষ বা সীমা বা কোন আগল তাঁর ভালোবাসার। এজন্য অনেক সময়েই অনেকে তাঁকে ভুল বুঝতেন এবং ক্ষোভে বিরাগে দূরে সরেও যেতেন তাঁর কাছে থেকে, নিন্দায়ও মুখর হ'তেন। ফলে তিনিও কম আঘাত পা'ননি আপন নানা প্রিয়জনের কাছ থেকে। কখনও আত্মীয়স্বজন বিরূপ হয়েছেন, কখনও গুরুভাই-ভগ্নীদের বিরাগভাজন হয়েছেন তিনি। এমনকি একান্ত বন্ধু কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গেও বিচ্ছেদ হ'বার উপক্রম হয়েছে। কৃষ্ণপ্রেম ছিলেন স্বভাবে তাঁর একান্ত বিপরীত, সম্পূর্ণ অন্তর্মুখ, লোকলোচনের অন্তরালে সকলের অগোচরে থাকতে ভালবাসতেন। থাকতেনও হিমালয়ের এক নিভৃত কন্দরে জনমানবশূন্য নিরালায়। কিন্তু বন্ধু দিলীপ তাঁর এই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দীপ্ত প্রোজ্জ্বল বুদ্ধি ও বোধির যুগপৎ অধিকারী মানুষটিকে সর্বসাধারণের গোচর না করে ছাড়বেন না কিছুতেই, সুযোগ পেলেই। একবার ইংরাজিতে কোন্ এক পত্রিকায় এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে বসলেন তাঁর সম্বন্ধে, যার শিরোনাম দিলেন : 'The world does not know its greatest man.' সেটি পড়ে অনেকে কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেন, তাঁর কাছে যাবার জন্যও উদগ্রীব হলেন। তিনি প্রমাদ গণলেন এবং তিক্ত বিরক্ত হয়ে বন্ধুকে লিখলেন পণ্ডিচেরিতে 'তোমার সঙ্গে আর আমার কোনও সম্বন্ধ রইল না। আমি আর তোমাকে চিঠি লিখব না, তুমিও যোগাযোগ রেখো না।' অথচ এমন হৃদয়ের টান যে দিলীপের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করা সম্ভব হয়নি কোনদিন।

তেমনি আর একবার দিলীপকুমারের ৫০ তম জন্মদিন পালিত হচ্ছে ঘটা ক'রে কলকাতায়, কৃষ্ণপ্রেম ঘটনাচক্রে তখন কলকাতায় উপস্থিত। কোনো এক বিরাট হলে সেদিন সন্ধ্যায় সকলে আমন্ত্রিত, কৃষ্ণপ্রেম কোনো সভাসমিতিতে যান না, জনসমাগম যেখানে সেখান থেকে দূরে থাকেন। তবু দিলীপের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে

উপস্থিত থাকবেন জন্মদিনের সভায় এই কথা দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেও দিয়েছেন তাঁকে যেন মঞ্চে না বসানো হয় বা তাঁর উপস্থিতির কথা ঘোষণা না করা হয়। কিন্তু সে কথা শুনছে কে? সভা যখন শেষ হয়ে আসছে এবং দিলীপ নিজের কিছু বক্তব্য শোনাচ্ছেন সম্বর্ধনার উত্তরে ধন্যবাদ জানিয়ে, তখন বলে বসলেন : 'আমার বিশিষ্ট বন্ধু কৃষ্ণপ্রেমও আজ এখানে উপস্থিত, তার মতো মানুষ দেখা যায় না, সে যে আমার জন্মদিনে এসেছে, এ আমার অশেষ সৌভাগ্য' ইত্যাদি। এ কথা শোনামাত্র সকলের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ হ'ল সেই গৈরিকমণ্ডিত দিব্যকান্তি পুরুষটির দিকে আর অমনি তিনি নিঃশব্দে পিছনের দুয়ার দিয়ে হল থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দিলীপকুমারের এই ছিল আর এক অসাধারণ গুণ : মহতের পূজা ও তাঁদের সুপরিচিত করানো। তাঁর রচিত বাংলায় 'তীর্থঙ্কর' এবং ইংরাজিতে লেখা Among the Great-ই এর সাক্ষ্য দেবে। এছাড়া Six Illuminates ইত্যাদি গ্রন্থে এবং নিজের স্মৃতিচারণে কত অগণিত মহাজনকে যে তিনি পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরেছেন বলা যায় না। এ তাঁর এক অনন্য কীর্তি। সেইসঙ্গে তাঁর ছিল অসামান্য গুণগ্রাহিতা, যা বাঙালী চরিত্রে দুর্লভ ও একান্ত বিরল। যার মধ্যেই তিনি দেখতে পেয়েছেন কিছু প্রতিভার স্ফুরণ—তা সে সাহিত্যেই হোক্ সংগীতেই হোক্ বা কাব্যরচনাতেই হোক—সঙ্গে সঙ্গে তাকে সকলের কাছে সুপরিচিত করার জন্য ছিল তাঁর প্রাণপণ প্রয়াস। গীতিকার হিসাবে কেউই নিশিকান্তের পরিচয় জানতে পারত না যদি না দিলীপকুমার নিজে তাঁর গান গেয়ে জনপ্রিয় করে তুলতেন। পণ্ডিচেরি থেকে দীর্ঘকাল পরে কলকাতায় ফিরে যখন তিনি গ্রামোফোন কোম্পানী কর্তৃক আবার রেকর্ড করার জন্য অনুরুদ্ধ হ'ন, তখন ইচ্ছা করলে তিনি নিজেরই কোন রচনা বা তাঁর পিতার বা অতুলপ্রসাদের গান গাইতে পারতেন কিন্তু তিনি তা না ক'রে দুখানি নিশিকান্তের রচনাই রেকর্ড করলেন। 'এই পৃথিবীর পথের পরে' এবং 'জ্বলবার মন্ত্র দিলে মোরে' যাতে এক আগুন জ্বলে উঠল চারদিকে এবং বাংলাগানের দিগন্তে। কবি হিসাবে নিশিকান্ত অসামান্য ছিলেন কিন্তু তাঁকে গীতিকার করে তুললেন দিলীপকুমার। তাঁর 'গীতশ্রী' নামক স্বরলিপির বইটি খুললেই দেখা যাবে প্রসিদ্ধ সব গীতিকার, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদের গানের প্রায় প্রত্যেকটির পাশাপাশি একই ছন্দে বাঁধা নিশিকান্তের এক একটি রচনা তিনি সন্নিবিষ্ট ক'রে দিয়েছেন। এইভাবে গান রচনায় তাঁকে দিয়ে যেন মক্‌সো করিয়েছেন অনুকরণ করিয়ে করিয়ে শ্রেষ্ঠ গীতিকারদের রচনার। ঐ 'গীতশ্রী'তেই দেখা যাবে একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের, যাঁকে তিনি বইটি উৎসর্গ করেছেন এবং তাঁর নানা রাগ-রাগিণীর লক্ষণগীতও তার মধ্য দিয়ে দিয়েছেন অথচ পূর্ব ভারতে তখন প্রায় কেউই ভাতখণ্ডেকে বা তাঁর প্রতিভাবান শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকারকে চিনতও না, নামও শোনেনি বলা চলে।

এই ভাতখণ্ডে দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংগীতশিক্ষার প্রতিষ্ঠান, লক্ষ্ণৌ মরিস্ কলেজে দিলীপকুমার তাঁর দুই খড়তুতো ভাই, হেমেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রলাল রায়কে উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষার জন্য স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে পাঠিয়ে দেন। হেমেন্দ্রলাল অত্যন্ত সুকণ্ঠ ছিলেন কিন্তু অকালে মারা যান। রবীন্দ্রলাল সংগীতশিল্পীরূপে যত না সার্থক হয়েছেন

তার চেয়ে বেশি সার্থক হয়েছেন সংগীতশিক্ষক ও সমালোচক রূপে। তাঁরই হাতে তৈরী সুযোগ্যা কন্যা মালবিকা কানন বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীরূপে।

বাঙালীকে উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাই দিলীপকুমারের ছিল অনলস প্রয়াস ও অদম্য উৎসাহ। তিনিই প্রথম আবদুল করিম খাঁকে নিয়ে আসেন কলকাতায় এবং সংগীতরসিকদের কাছে তাঁকে সুপরিচিত ক'রে দেন তাঁর অনবদ্য সংগীত শুনিয়ে। এরপর দ্বিতীয়বার যখন খাঁ সাহেব কলকাতায় আসেন, সম্ভবত ১৯৩৬ সালে এক সংগীত-সম্মেলনে যোগ দিতে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে; তখন প্রথমেই গান আরম্ভ করার আগেই তিনি স্মরণ করেন দিলীপকুমারকে এবং বলেন 'আমাকে প্রথম এই কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন দিলীপকুমার রায় এবং সেবার তাঁর আমন্ত্রণে কিছু সঙ্গীতবোদ্ধা সমঝদার এসেছিলেন আমার গান শুনতে, এবার এসে দেখছি হলভর্তি লোক গান শুনতে এসেছে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি ইতিমধ্যে এত অনুরাগ বাঙালীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে দেখে বিশেষ আনন্দ বোধ করছি।' এই উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চা ও তার প্রতি অনুরাগের প্রসারে দিলীপকুমারের কতখানি অবদান ছিল দুর্ভাগ্যের বিষয় বাঙালী আজ তা স্মরণ করেনা। অনেকে জানেও না। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল বাংলা গানকে আরও রসসমৃদ্ধ অলঙ্কৃত, সুশোভিত করা এবং উচ্চাঙ্গ সংগীতের ভিত্তি ছাড়া তা যে সম্ভব নয়, তা তিনি ভাল করেই জানতেন। তাই উমা বসুর মত প্রতিভাময়ী শিল্পীকে পেয়ে তাঁকে তিনি শুধু নিজের গান শিখিয়ে, গাইয়ে রেকর্ড করিয়েই পরিতৃপ্ত হ'তে পারেন নি, তাকে উচ্চাঙ্গ সংগীতে তালিম নেওয়ার জন্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের হাতে সঁপে দেন, যাতে তাঁর প্রতিভার আরও বিকাশ, আরও ব্যাপ্তি ঘটতে পারে। কিন্তু অকালমৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, যার ফলে সংগীতজগৎ তার আরও অসামান্য অবদান থেকে বঞ্চিত হয়।

দিলীপকুমারের নিজের জীবনে ও গানে সব চেয়ে বেশি প্রভাব ও অবদান তিনটি নারীর এবং এই তিনটি নারীর জীবনও সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়েছে তাঁর দ্বারা। তাঁর প্রথম জীবনে এসেছেন সাহানা দেবী। মধ্যজীবনে উমা বসু এবং শেষ জীবনে ইন্দিরা দেবী। প্রথম দুজনের কাছে তিনি পেয়েছেন সুরের দিগন্ত বিস্তৃত করার উৎসাহ ও প্রেরণা এব শেষজনের কাছে লাভ করছেন কথার অমৃত-সমুদ্রের দিশা। আজন্ম সুরের পূজারী তিনি যেখানেই কণ্ঠলাবণ্য দেখেছেন সেখানেই তার মাধ্যমে নিখুঁত সুরের প্রতিমা গড়ে তুলতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ অনুযোগও করেছেন : 'দেশের যত ভালো ভালো মেয়ে আছে তুমি যদি তাদের এমন ভাঙিয়ে নিয়ে যাও, তা হ'লে আমার কি অবস্থা দাঁড়ায় বলো তো?' সাহানা ছিলেন কবিগুরুর একান্ত স্নেহধন্যা। তাঁর গানের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী কিন্তু তিনি দিলীপের হাত ধরে চলে গেলেন পণ্ডিচেরি তাঁকে ছেড়ে। দিলীপের সাধনায় ও সুর আরাধনায় একাত্ম হয়ে গেলেন তাঁর সঙ্গে এবং তাঁরই মতো শ্রীঅরবিন্দকে গুরুরূপে বরণ করে সংসারত্যাগিনী হয়ে যৌবনেই যোগিনী ও আশ্রমবাসিনী হয়ে রইলেন। দিলীপের তখন নিত্য নতুন গান বাঁধা ও সুর সাধা চলতে থাকে এই সাহানাকে কেন্দ্র করে। বলতেনও তিনি : 'আমার গান একমাত্র সাহানাই গাইতে পারে'। তার কারণ সাহানার মধ্যে ছিল যেমন ভাবের গভীরতা তেমনি সুরের

তন্ময়তা। উমাকে যখন তিনি পেলেন তখন আশ্চর্য হ'লেন তাঁর কণ্ঠের সাবলীলতা ও মাধুর্য দেখে এবং মেতে উঠলেন নিত্য নব সুর-সৃষ্টিতে ও তান-কর্তবের প্রসারণে। সুর-সৃষ্টির দিকে দিয়ে এটি তাঁর জীবনের স্বর্ণযুগ বলা যায়। তারপর উমার আকস্মিক বিয়োগে তাঁর সুরের নির্ঝরিণী যেন স্তব্ধ হয়ে গেল, নব নব সুরসৃষ্টির উন্মাদনা তাঁর হারিয়ে গেল, কে আর তাকে ফোটাবে এই ভেবে।

সুরের উৎস তাঁর প্রতিহত হলেও উমার তিরোধানে, ভাবের তরঙ্গ তাঁর যেন আরও উদ্বেল, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। খুঁজতে লাগলেন তিনি ব্যাকুল হয়ে উপযুক্ত তাঁর ভাবের বাহন অর্থাৎ তেমন ভাবসমুজ্জ্বল কথা, যাতে সুরারোপ ক'রে তিনি তাঁর ভাবকে অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত করতে পারেন, যদিও নিজেই লিখে যেতেন অজস্র অনবদ্য গান, যার সব কিছুরই কেন্দ্রে মূলত ছিলেন তাঁর চির আরাধ্য হৃদয়ের দেবতা শ্রীকৃষ্ণ। লিখেছিলেনও একটি কবিতায় :

যা-ই কেন না লিখি বা গাই—তাঁরি সুরেই বাঁধব
তাঁরি রঙে রাঙব, শুধু তাঁরি মালা গাঁথব।
তাঁর চরণে চেয়ে শরণ,
তাঁরি কৃপা ক'রে বরণ,
তাঁকেই কেবল ডাকব, প্রাণে তাঁরি সাধন সাধব,
অন্তর-মন্দিরে শুধু তাঁরি আসন পাতব।

এই কৃষ্ণৈকান্তশরণ হ'য়ে অন্তরে শুধু তাঁরি আসন পাতবার দীক্ষা তিনি পেলেন গুরু শ্রীঅরবিন্দের চরণাশ্রয়ে গিয়ে ১৯২৮ সালে। সেদিন থেকে পিছনে পড়ে রইল অন্য সব সংগীত যা শুধু Art for Art's sake, এখন তা রূপান্তরিত হ'ল Art for Devine's sake। গান হ'য়ে দাঁড়াল আরাধনা, entertainment আর তার লক্ষ্য রইল না, লক্ষ্য হ'ল attainment তাঁকে পাওয়া গানের মাধ্যমে। পণ্ডিচেরি আশ্রমে থাকাকালে পেলেন গুরুভ্রাতা কবি নিশিকান্তকে অসাধারণ গীতিকাররূপে তাঁর ভাবকে পুষ্ট করার জন্য, আর সেখান থেকে শ্রীঅরবিন্দের দেহত্যাগের পর যখন চলে এলেন তখন তাঁর শূন্য হৃদয়কে পূর্ণ করার জন্য শিষ্যারূপে এলেন ইন্দিরা, যিনি মূর্তিমতী মীরা হয়ে দেখা দিলেন তাঁর শেষ জীবনে, হাজার হাজার অতুলনীয় ভজনের ডালি দিয়ে ভরিয়ে দিলেন তাঁর আত্মনিবেদনের আকুল আস্পৃহাকে, মিটিয়ে দিলেন তাঁর কথার বা বিষয়ের সমস্ত ক্ষুধা, যাকে আশ্রয় করতে পারে তাঁর অনিন্দনীয় সুর, আপন ভাবের আত্মপ্রকাশের জন্য। অঞ্জলির পর অঞ্জলি ভ'রে ইন্দিরা অর্পণ ক'রে যেতে লাগলেন ইষ্টের ও গুরুর চরণে তাঁর হাজার হাজার গানের সম্ভার, যেগুলি পরে একে একে 'শ্রুতাঞ্জলি', 'প্রেমাঞ্জলি', 'সুধাঞ্জলি', 'দীপাঞ্জলি', 'ভাবাঞ্জলি', 'উষাঞ্জলি' নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়। দিলীপকুমার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রত্যেকটি ভজনের বাংলায় অনুবাদ করেন এবং পরে 'তারাঞ্জলি' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন।

অনুবাদকর্মেও তাঁর অসামান্য অবদানের কথা আমরা স্মরণ করি না। সব-ভাষাতেই ছিল তাঁর আশ্চর্য দখল এবং সেই সঙ্গে কাব্যরচনায় সহজ পটুত্ব। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী

গানের তিনি ইংরাজী ও সংস্কৃতে অনুবাদ ক'রে একই সুরে গেয়ে সবাইকে চমৎকৃত করেছেন। জর্মন ভাষাতেও অনুবাদ ক'রে খোদ জার্মানিতে এবং এদেশেও গেয়েছেন নানা সভা-সমিতিতে, গানের আসরে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের নানা সংস্কৃত স্তবের একই ছন্দে বাংলায় অনুবাদ ক'রে তিনি তাঁর ছন্দোদক্ষতারও স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। বলতেন : 'আমার ছন্দের গুরু প্রবোধচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ন'ন। তাঁর কাছেই শিখেছি ছন্দের নানা গতি-প্রকৃতি।' এছাড়া উর্দু গজল, হিন্দী ভজন ইত্যাদিরও যে কত অনুবাদ করেছেন। তার ইয়ত্তা নেই। অনুবাদ করেছেন ইংরাজিতে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস। সব শেষে ইন্দিরার ভজনের অনুবাদে তিনি নিজেকে যেন সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছিলেন। সে-সব ভজনের কত না বৈচিত্র্য, কত না বিরহ-মিলনের আলো-ছায়ার খেলা, ছন্দেরই বা কত না দোলা। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় একবার আমাকে বলেছিলেন : 'দেখেছ এই ভজনগুলি ভাবের গভীরতায়, ভাষার সাবলীলতায় মূল মীরার ভজনগুলিকেও যেন ছাড়িয়ে গিয়েছে।' ইন্দিরার মাধ্যমে এই সব ভজনগুলি মীরারই ভাবাবেশের যেন প্রকাশ হয়েছে এবং প্রত্যেকটির শেষে তাই 'মীরা' নামের ধুয়া। প্রবীণ কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক পাঞ্জাবী এই ইন্দিরাকে 'পঞ্চনদের কন্যা' বলে সম্বোধিত ক'রে যথার্থ অভিনন্দন জানিয়েছেন এই বলে :

নীলাম্বরীর অঞ্চলেতে বাঁধা তোমার চিন্তামণি।
দেবি! তোমার নিত্য লীলা, তুমি মীরা চিরন্তনী।

আর এক মনীষী মরমিয়া সাধক শ্রীমৎ অনির্বাণও বলেছেন :

'মীরার 'শব্দ' সুধা মূর্তি ধরেছে ইন্দিরা দেবীর কবিতায়। অথচ এ যুগের ভাবের আবহাওয়াটুকুও পাই—মাঝে মাঝে পাই উপনিষদের আলোর ঝলক। মনে হয় মীরা যদি আজ আবার ফিরে আসতেন, এই ঢঙেই কথা বলতেন। চম্‌কে ওঠবার মতই বটে।'

আমরা সমাধি বুঝি না, তাই সন্দিহান হই যখন দাবী করা হয় এগুলি সমাধিশ্রুত বা সমাধিলব্ধ সব ভজন গান। ইন্দিরা নিজেও স্বভাবকবি, রচনায়ও সিদ্ধহস্ত। তবু এগুলি ঠিক তাঁর সজ্ঞান মনের রচনা নয়। একক ভাবাবিষ্ট চেতনায় স্বয়ং উদ্ভূত বা আপনা-আপনি নিঃসৃত ভক্তিভাবের ছন্দোময় দিব্য রূপ এবং সে কথা মানতেই হয় ভজনগুলি শুনলে বা পড়লেও। যথার্থ কবির সব সার্থক রচনার মূলেই থাকে এইরকম এক অনির্বচনীয় স্বতঃস্ফূর্ত চেতনা। বেদের কবিতা বা সূক্তগুলিকে সেইজন্যই বলা হয় 'অপৌরুষেয়', কোনো পুরুষের সজ্ঞান রচনা নয়, কৃতি বা কর্ম নয়, 'শ্রুতি', প্রজ্ঞানের আলোক উদ্ভাসিত শ্রবণমাত্র, সেখানে কোন সচেতন activity নেই, আছে শুধু utter passivity বা pure spontaneity। ইন্দিরার এই সব অজস্র ভজনাবলীতে সেই স্বতঃ প্রকাশের ঝলক, আন্তরিক ভাবের আলোক।

শেষ জীবনে দিলীপকুমারের একমাত্র অবলম্বন বা আশ্রয় হয়ে উঠল এই ভজনগুলি এবং স্বয়ং মীরা নবরূপে এসে যেন তাঁর চিরজীবনের একমাত্র অভীপ্সা বা আস্পৃহার শিখাকে উদ্দীপ্ত করে দিলেন, যাতে সেটি গিয়ে নিঃশেষে মিলতে পারে তার উৎসে, সেই আলোর পারাবারে। তাঁর কাছে এ আলোর সাগর রবীন্দ্রনাথের মতো কোনো

'দেশহীন কালহীন আদিজ্যোতি শাশ্বত প্রকাশ পারাবার' রূপে প্রতিভাত হয় নি। ধরা দিয়েছে 'নীলং পরঃ কৃষ্ণং' রূপে, আর এক পরম বৈদান্তিক বাঙালী সন্ন্যাসী মধুসূদন সরস্বতী যাঁকে চিনেছিলেন 'কালিন্দীপুলিনোদরে কিমপি যন্নীলং মহো ধারতি' রূপে, কালিন্দীতটে যমুনাতীরে ইতস্তত ধাবমান কী এক অনির্বচনীয় নীল দ্যুতি বা দীপ্তিরূপে। বাঙালী-হৃদয়ের হয়তো চিরন্তন আরাধ্য এমন একটি বিগ্রহধারী পুরুষ, যিনি সকলের অন্তরকে আকর্ষণ করেন বলেই হয়তো 'কৃষ্ণ' নামধারী বা তাঁর অনির্বচনীয় 'কিমপি', কী যেন কী কালো রূপের জন্যই 'কৃষ্ণ' ব'লে পরিচিত। দিলীপকুমারের অন্তর সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে বসেছিলেন এই কৃষ্ণ। মধুসূদন সরস্বতীর মতো তাঁর মনও গেয়ে উঠত এই ব'লে :

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীবদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরংকিমপি তত্ত্বমহং না জানে।।

কৃষ্ণই ছিল তাঁর কাছে চরম ও পরম তত্ত্ব, যেমন ছিল তাঁর একান্ত সুহৃদ, অভিন্নহৃদয় বন্ধু কৃষ্ণপ্রেমের কাছেও। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম পুরোপুরি বৈষ্ণব মতাবলম্বী কণ্ঠীধারী সন্ন্যাসী, বিগ্রহসেবাতেই সমর্পিতপ্রাণ। আর দিলীপকুমার গিয়ে পড়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের যোগাশ্রমে, তাঁর শিষ্যরূপে তাঁরই অনুবর্তী হ'তে। গুরুরূপে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর এই কৃষ্ণনিষ্ঠাকে বরাবরই উৎসাহিত করেছেন, বলেছেন তিনি নিজেও কৃষ্ণের কাছ থেকেই পেয়েছেন অধ্যাত্ম-পথের দিশা সেই আলিপুর জেলে বাসুদেবরূপে তাঁর প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের লগ্ন থেকে। তবু অনেক অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগতে হয়েছে দিলীপকুমারকে। অন্য গুরুভাইরা ধ্যান করেন, তাঁদের নাকি নানারকম উপলব্ধিও হয় কিন্তু তিনি তো তেমন শান্ত হয়ে চুপচাপ বসে ধ্যান করতে পারেন না বেশিক্ষণ, অশান্ত তাঁর চিত্ত তবু শান্তি পায় গানে। শ্রীঅরবিন্দও তাঁকে নির্দেশ দেন যাতে অন্যের দেখাদেখি তিনি ধ্যান করতে না যান, বলেন : 'why don't you sing?' গুরু জানেন এই গানই তো তাঁর ধ্যান, গান ধরলেই যেন তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন।

ইন্দিরার কাছে এই নিজেকে হারানোর সম্বল পেতে থাকেন দিনের পর দিন নতুন নতুন ভজনের উপহারে। সঙ্গে সঙ্গে মেতে ওঠেন একদিকে বাংলায় তারই অনুবাদে, অন্যদিকে সুরসংযোজনায় তাকে ফুটিয়ে তুলতে, যথাযথভাবে। সুরের অলঙ্করণের বাহুল্য তখন তিনি কমিয়ে এনেছেন অথচ নিত্য নব নব বৈচিত্র্যের সৃষ্টিতে তাঁর প্রতিভা তখনও তেমনি সক্রিয়। ভাবের দিকটিই গভীর হয়ে উঠেছে ক্রমশ শেষের দিকে, সুরের তরঙ্গলহরী যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে কিছুটা। আমাকে শেষের দিকে একদিন পুণায় বলেছিলেন : 'আমার গান তো এখন আমি সোজা করে দিয়েছি, তবু লোকে গাইতে চায় না?'

গাইতে না চাওয়া বা না পারার মূল কারণ তাঁর ভাবের রঙে সবাইয়ের পক্ষে রাঙিয়ে ওঠার অক্ষমতা। হৃদয়ের সে-আবেগ, অন্তরের সে-আকুলতা, 'কৃষ্ণভক্তিরস-

ভাবিতা মতি'র ছোঁয়াচ যে না পেয়েছে, সে কেমন ক'রে ফোটাবে তাঁর গান? গান তাঁর কাছে ছিল আত্মদান, নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দেওয়া ইষ্টের বা কৃষ্ণের চরণে। সে ছিল আপনহারা গান। তার মধ্যে ছিল চিরবিরহের বেদনা। কার বাঁশি তিনি শুনেছিলেন জানি না, যা তাঁকে জীবন-যৌবন ধন-মন সব কিছুর প্রতি নিঃস্পৃহ ক'রে এমন উম্মনা ক'রে তুলেছিল ও ঘরছাড়া করেছিল। তাঁর গান তাই মনকেমনের গান, চোখে জলঝরার গান।

তাঁর এই ভাবালুতায় বুদ্ধিজীবী বন্ধুরা যেমন খেদ করেছেন যে এমন যুক্তি-তর্কে দীপ্তবুদ্ধি প্রতিভাধর মানুষটি কেমন ক'রে সে-সব বিসর্জন দিয়ে, জানার পথ ছেড়ে নিছক মানার পথে নিজেকে খুইয়ে বসল, তেমনি তাঁর গুরুভাইয়েরাও কটাক্ষ ও বিদ্রূপ করেছেন এই ব'লে যে যদি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ক'রেই তিনি কেঁদে ভাসাবেন তা হ'লে বৈষ্ণব ভেকধারী হ'লেন না কেন, পণ্ডিচেরির অতিমানস যোগের সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে গেলেন কেন? গুরু যার অমন তত্ত্ববেত্তা মহা দার্শনিক এবং সেই সঙ্গে সকল যোগের সমন্বয়কারী সিদ্ধ পুরুষ সে কিনা তাঁর যোগের অনুসরণ না ক'রে ভক্তিযোগ নিয়েই পড়ে রইল! দিলীপ তাঁদের উদ্দেশ্য ক'রে একটি গানে তাই লিখলেন :

ওরা বলে তোমার পরেও আছে আরো অনেক কথা,
আমি জানি আমার প্রাণে জাগে তোমার মূর্তি সদা।

কৃষ্ণের পরে আর কী আছে, তা তিনি জানেন না, জানতেও চা'ন না। শুধু তাঁরই মূর্তি হৃদয়ে তাঁর নিত্য নিরন্তর জেগে ওঠে। তাঁর শুধু আক্ষেপ এখনো তিনি তাঁর সব কিছু নিঃশেষ দিয়ে অকিঞ্চন অনন্যগতি হয়ে তাঁর চরণমূলে কেন শরণ নিতে পারছেন না? জানেন এখানে তাঁর স্বভাব, প্রকৃতিগত চঞ্চলতাই মূল বাধা। বিলাপ করছেন একটি স্বরচিত কবিতায় :

তোমার চরণ-পদ্ম-পরিমল-আস্বাদে যার বুক উঠেছে ভ'রে
চঞ্চলতায় আজও সে-উচ্ছল, অভিমানে তাই তো অশ্রু ঝরে!

চির-চঞ্চল, প্রাণরসে উচ্ছল, হাসিতে উদ্বেল, পরিহাস-রসিক এই মানুষটির অন্তরের অন্তস্তলে ছিল এই গভীর বেদনা এবং সেই বেদনাই জাগিয়ে দিয়েছিল তাঁর চেতনা, তা তিনি নিজেই উপলব্ধি ক'রে গেয়ে গিয়েছেন একটি অনবদ্য গানে :

সে-বেদনা মাঝে চেতনা কেমনে
ফুটিল গো ধীরে ব্যথা নিবেদনে,
হারায়ে আমারে লভি যেন তারে।

সাক্ষাৎ তাঁকে পাওয়া তাঁর ঘটেছিল কিনা জানি না, দর্শন তিনি পেয়েছিলেন হয়তো অন্তিম লগ্নে কিন্তু নিরন্তর বংশীধ্বনি শ্রবণে ধন্য হয়েছিল তাঁর জীবনের শেষ কয় বৎসর। শেষে সেই নিঃসীম নীলাম্বুধির অতলে তিনি মিলিয়ে গেলেন ৬ই জানুয়ারি ১৯৮০ সালে।

সেই ১৯৩৭ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত চল্লিশ বছরেরও বেশি, প্রায় অর্ধ শতাব্দী কালই বলা চলে, যে-মানুষটির নিবিড় স্নেহসান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য ঘটেছিল আমার জীবনে,

তাতে এই মানুষটির একটি রূপই আমার কাছে প্রধান হয়ে সমুজ্জ্বল রূপে ধরা দিয়েছে : তা হ'ল তাঁর অসীম ভালবাসার মূর্ত বিগ্রহ রূপ। তিনি মানুষকে ভালবেসেছেন এবং তাদের ভালবাসা চেয়েছেন ততোধিক। ভালবাসার তিনি ছিলেন কাঙাল। আমার মনে হয় শৈশবেই মা'কে হারিয়ে এবং তারপর কৈশোরে পদার্পণ করতে না করতেই স্নেহশীল পিতাকেও হারিয়ে তাঁর হৃদয়ে অতৃপ্ত ভালবাসার এক আশ্চর্য ক্ষুধা যেন পুঞ্জীভূত ও সুপ্ত হয়ে ছিল মনের অবচেতনে। মামা-মামীরা যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁকে নিজেদের কাছে রেখে মানুষ করতে গিয়ে এবং স্নেহের সে-ঘাটতি যথাসাধ্য পূরণেও তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন। এর ফলে তাঁর মনে যে কোনও সামান্য কারণে অভিমান বা ক্ষোভ জমে উঠত, যদি তিনি দেখতেন কেউ যেন তাঁকে আর তেমন ভালবাসছে না বা তাঁর প্রতি বিমুখ বা বিরূপ হয়েছে। এইরকম ভুল বোঝাবুঝির ফলে অনেকের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য ঘটেছে, পরিণামে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদও দেখা দিয়েছে। আঘাত পেয়েছেন এই কারণে অনেক, আঘাত দিয়েছেনও অনেকের মনে।

অথচ আশ্চর্য স্বচ্ছ ও বালসুলভ সারল্য ছিল তাঁর মনে এবং সেই কারণে দেখা যেত তাঁর ক্ষণে তুষ্ট এবং ক্ষণে রুষ্ট রূপ। মনে রাখতেন না কারুর বিরূপতা বা প্রত্যাঘাতের কথা, পরক্ষণেই বা কিছুদিনের মধ্যেই সে-সব ভুলে আবার তাকে তেমনি স্নেহে, প্রেমে, অনুরাগে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। মনের কোথাও কোনো দাগ রাখতেন না তিনি, আবার নিজের অভিমান প্রকাশ করতেও বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করতেন না কখনও। কলকাতায় যখনই আসতেন নিয়মিত যেতাম তাঁর গান শুনতে, হয়তো অন্য কাজের বাধা এসে পড়ায় দুদিন যেতে পারিনি। তারপরে যেতেই সকলকে বললেন আমাকে লক্ষ্য ক'রে : 'ও আর আমার গান ভালবাসেনা, তাই শুনতে আসেনা।' এমনই অহেতুক অনুযোগ, অভিমানের আত্মপ্রকাশ তাঁর সহজাত ছিল। পুণায় যাবার পর সেখানেও ছুটে গিয়েছি তাঁর অপার স্নেহের টানে ও গানের লোভে। মাঝে দু'এক বছর যাওয়া হয়নি, একবার ছুটিতে কাশীতে গিয়েছি শিক্ষাগুরু মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিবাজ মহাশয়ের পদপ্রান্তে কিছু শিক্ষালাভের আশায়। পরের বার কলকাতায় দিলীপকুমার এসেছেন, রোজই যাওয়া-আসা করছি, তারপর পুণায় ফিরে যাবেন, ইন্দিরা আমাকে অনুরোধ করলেন আবার সুবিধা হ'লেই পুণায় চলে আসতে, শুনেই তিনি বলে উঠলেন : 'না, না, ওকে পুণায় যেতে বোলোনা, ও আমার কাছে যাবে কেন? ও যাবে গোপীনাথ কবিরাজের কাছে।'

এমনি ছিল তাঁর অহেতুক অভিমান যখন-তখন, যে কোনও তুচ্ছ কারণে। তাঁকে স্বভাবে ও স্বরূপে চিনতেন একমাত্র তাঁর গুরু শ্রীঅরবিন্দ। সেই গুরুর আশ্রমে পণ্ডিচেরি থাকা কালেও কোনো গুরুভ্রাতা বা ভগ্নীর কোনও মন্তব্যে তিনি হয়তো এমন বিরূপ হয়েছেন যে আশ্রম ছেড়ে চলে আসবেন ব'লে মনস্থ করেছেন। জিনিষপত্র বেঁধে ছেঁধে তৈরী, গুরুকে চিঠি লিখে জানিয়েও দিয়েছেন যে তাঁর পক্ষে এর পর আর আশ্রমে থাকা সম্ভব নয়। গুরু ও তাঁর অসীম ধৈর্য ও অপার ভালবাসায় পুত্রাধিক স্নেহে তাঁকে পরিপালন করেছেন, তার স্বভাব জানেন, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দীর্ঘ পত্র লিখে তাঁর সব ক্ষোভ, অভিমান দূর ক'রে দিলেন। আশ্রম ছেড়ে যাওয়া তাঁর হ'ল না, আবার রয়ে গেলেন, যেমন ছিলেন তেমনি, সব রাগ-অভিমান কোথায় মিলিয়ে গেল পরক্ষণেই।

তাই গুরু যতদিন দেহে ছিলেন তাঁর সেই অপার স্নেহবন্ধন ছিন্ন ক'রে বেরিয়ে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি কোনদিনই।

কিন্তু বিপর্যয় দেখা দিল শ্রীঅরবিন্দের দেহত্যাগের পরেই। একে তো তিনি জানতেই পারেনি গুরুদেবের গুরুতর অসুস্থতার কথা, মনের আনন্দে গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন ভারতবর্ষের নানা স্থানে, আশ্রমের জন্য অর্থসংগ্রহ করার জন্য। সেই অর্থ যেটুকু সংগ্রহ হবে অর্ঘ্যরূপে গুরুর চরণে সঁপে দেবেন এবং সেই সুযোগে একবার সাক্ষাৎ তাঁর দর্শনের ও আশীর্বাদলাভের সুযোগ হবে, এই ভাবনায় তখন তিনি বিভোর। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! তখন তিনি কাশীতে, সকালে গঙ্গাস্নানে এসেছেন দশাশ্বমেধ ঘাটে, কালীতলায় মা কালীর মন্দিরে প্রণাম করছেন স্নান সেরে। এমন সময় সকাল সাড়ে সাতটার রেডিওর খবরে শুনতে পেলেন শ্রীঅরবিন্দ দেহত্যাগ করেছেন! অথচ সেদিনই সন্ধ্যায় কাশীতে তাঁর গানের জলসা যাতে সার্থক হয় তার জন্য শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ-সম্বলিত টেলিগ্রাম এসেছে তাঁর কাছে। ক্ষোভে, দুঃখে, রাগে তিনি তখন আত্মহারা, কেউ ঘুণাক্ষরেও তাঁকে জানতে দিলনা তাঁর গুরুর আসন্ন প্রয়াণের কথা! ছুটলেন পাগলের মতো পণ্ডিচেরিতে প্লেনে, গিয়ে দেখলেন তাঁর জ্যোতির্ময় দেহ তখনও শায়িত রয়েছে মহাসমাধিতে।

সেই যে তাঁর মনে নিদারুণ আঘাত লাগল ১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর, তারপর সে বেদনার ক্ষত আর শুকালো না। সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে গেল তাঁর আশ্রমের সঙ্গে, বিশেষ ক'রে তিনি বিরূপ হয়ে উঠলেন শ্রীমা বা Mother-এর প্রতি, যিনি ছিলেন আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও পরিচালিকা। শ্রীমা'র প্রতি তাঁর এই বিরূপতা তাঁর অন্য গুরুভাই-ভগ্নীদের আরও বিরূপ ক'রে তুলল তাঁর প্রতি। ফলে তিনি অবশেষে আশ্রম ছাড়তে বাধ্য হ'লেন যদিও ঠিক সেই সময় তাঁর অভাবনীয় সুযোগ এসে গেল আর একবার বিদেশ-ভ্রমণের, ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে। নিজের আরাধ্য গুরুর অভাবে যখন চারদিক তাঁর নীরন্ধ্র অন্ধকারে আবৃত হয়ে গিয়েছে, শোকের সেই গভীর বেদনা ভুলে থাকার জন্য তিনি বেরিয়ে পড়লেন দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণে, যার বিবরণ তিনি রেখে গিয়েছেন তাঁর 'দেশে দেশে চলি উড়ে' ভ্রমণ-কাহিনীতে। দেশে ফিরে আশ্রমে আর বেশিদিন থাকা সম্ভব হ'ল না তাঁর পক্ষে, কারণ যিনি তাঁকে এতদিন বেঁধে রেখেছিলেন সেখানে তাঁর অচ্ছেদ্য স্নেহবন্ধনে, তিনিই চলে গিয়েছেন।

জীবনে সব চেয়ে সঙ্কটকাল তখন তাঁর। কোথায় যাবেন আশ্রম ছেড়ে, কে-ই বা আশ্রয় দেবে তাঁকে? নিজের পুঁজি বলতে তাঁর কিছুই নেই, সব কিছু নিঃশেষে অর্পণ ক'রে বসে আছেন শ্রীগুরুর চরণে। এমনকি কৃষ্ণনগরের পৈত্রিক ভিটাটুকুও বিক্রী ক'রে দিয়েছেন, আশ্রমে সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে দেবেন ব'লে। নিজের সম্পত্তি ব'লে কোথাও কিছু রাখবেন না, সম্পূর্ণ অকিঞ্চন না হ'লে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায় না এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁর এই পদক্ষেপ। মামারা পরমর্শ দিয়েছিলেন বাড়ীঘর সম্পত্তি সব বিক্রী না করতে, সেগুলি ভাড়া দিয়ে সেই অর্থ তো তিনি আশ্রমে দিতে পারেন নিয়মিত, সব এমন ক'রে জলাঞ্জলি দেবার কী দরকার? দেশের লোকও, কৃষ্ণনাগরিকরাও তাঁর উপর বিরূপ হ'ল যে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিটুকুও সেখান থেকে মুছে দিলেন এভাবে ভিটেমাটি সব উচ্ছেদ ক'রে। কিন্তু তাঁর সঙ্কল্পে অনড় রইলেন, বললেন, বিক্রী

না করলে সব সময়েই মনে জেগে থাকবে I possess something, আমার নিজস্ব কিছু আছে। নিজস্ব কিছু থাকতে তো সম্পূর্ণ তাঁর হওয়া যায় না।

কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় নিরালম্ব এখন তিনি দাঁড়াবেন কোথায় এই শেষ বয়সে? গুণগ্রাহী তাঁর অনেক ছিলেন। ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান সার রামস্বামী আয়ার তাঁকে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতের প্রধান অধ্যাপক পদ, চেয়ার অলঙ্কৃত করার জন্য আহ্বান জানালেন। তিনি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করলেন এই ব'লে যে সারা জীবন যখন কোথাও কারও দাসত্ব করিনি কোনও চাকরি নিয়ে, তখন এই শেষ বয়সে দাসত্ব-শৃঙ্খলে নিজেকে আবদ্ধ করব শুধু দুমুঠো অন্নসংস্থানের জন্য?

পরিণত বয়সে জীবনের এই চরম সংকটে, ঘোর অনিশ্চয়তা ও একান্ত অসহায়তার লগ্নেও তিনি অটল ছিলেন তাঁর সংকল্পে, ত্যাগব্রতীর যে-জীবন স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিয়েছিলেন যৌবনেই সব সুযোগ-সম্পদ, প্রতিভা-কীর্তির অনন্ত সম্ভারকে তুচ্ছ ক'রে, প্রার্থনা জানিয়েছিলেন আরাধ্যের চরণে নিজেরই রচিত একটি গানে :

প্রতিভা-শকতি-গরব-বিভব
করো পদানত প্রণতি-নীরব

তাঁরই পদানত, একান্ত শরণাগত হয়েই রইলেন। অযাচিতভাবে এসব সম্মানিত পদ তাঁকে দেওয়ার প্রস্তাব করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেন সার রামস্বামীকে অবশ্যই. কিন্তু চাকরি নিলেন না। 'চাকর রাখোজি' ব'লে মীরার সুরে গান গেয়ে যাঁর দাসত্ব তিনি ভিক্ষা করেছিলেন তাঁরই দাস হয়ে রইলেন, 'জো পহরাবে ওহি পহিরুঁ, জো দেওয়ে সো খাউঁ ' এইভাবে তাঁরই উপর নির্ভর করে থাকলেন।

একদিন পণ্ডিচেরি আশ্রমে তিনি প্রবেশ করেছিলেন একটি নারীর হাত ধরে, যিনি তাঁরই সুরে সুর মিলিয়ে নিজের জীবন-বীণা বেঁধেছিলেন এবং গুরুবরণ করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দকে তাঁরই মতো যোগসাধনায় আত্মনিয়োগ করবেন ব'লে। সেই সাহানা রয়ে গেলেন সেখানেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শ্রীমা- শ্রীঅরবিন্দের চরণছায়ায় সাধিকার জীবন বরণ ক'রে। আর দিলীপ বেরিয়ে এলেন আর এক নারীর হাত ধরে', যিনি মীরারই সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তিরূপে অনুগত শিষ্যা হয়ে দিলীপকেই গুরুরূপে তখন বরণ করেছেন এবং সেই গুরুর কৃষ্ণ-সাধনার পরিপূর্তি এনে দেবার জন্যই যেন তাঁর আবির্ভাব শিষ্যারূপে। বহুকাল পূর্বে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এক যোগিপুরুষ, লালগোলার হেডমাস্টার, বরদাচরণ মজুমদার দিলীপকুমারকে বলেছিলেন : 'একজন নারীর মাধ্যমে শেষ জীবনে আপনার সিদ্ধিলাভ হ'বে।' এ সিদ্ধি তাঁর সারা জীবনের যে মূল সাধনা, কৃষ্ণের প্রতি অহেতুক প্রেম, সেই প্রেম-সাধনার সিদ্ধি।

নিরাশ্রয় দিলীপকে ইন্দিরা প্রথম নিয়ে এলেন মাদ্রাজে তাঁর ভগ্নী ও ভগ্নীপতির আশ্রয়ে। ভগ্নহৃদয় দিলীপ কায়ক্লেশে মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই পেলেন তাঁদের কাছে। কিন্তু যিনি অলক্ষে থেকে বিশ্বঘরে তাঁর ঠাঁই নির্দেশ করে রেখেছেন তিনি এবার আর এক সহৃদয় বন্ধুরূপে এগিয়ে এলেন দিলীপের দুরবস্থার কথা জেনে। তিনি আর এক দিক্‌পাল পুরুষ, মহারাষ্ট্রের এক খ্যাতনামা বিশিষ্ট ধনী ও কীর্তিমান, সার চুনিলাল মেহতা, যিনি একসময়ে অস্থায়ী গভর্ণরের পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন ব্রিটিশ আমলে।

থাকতেন বোম্বাইতে সমুদ্রতীরে, নিজের প্রাসাদোপম অট্টালিকায়, মালাবার হিল্‌সে সমুদ্রতটে। এছাড়া পুণাতেও ছিল তাঁর এক সুরম্য ভবন এবং তারই সংলগ্ন একটি ছোট বাংলোও। যার নাম ডানলাভিন কটেজ। মাঝে মাঝে সার চুনিলাল পুণায় এসে থাকতেন। দিলীপকে তিনি অমন্ত্রণ জানালেন পুণায় এসে তাঁর অতিথি হয়ে বাস করার জন্য এই কটেজে। ইন্দিরা ও তার শিশুপুত্র প্রেমলকে নিয়ে দিলীপ চলে এলেন সেখানে। কে তখন জানত যে এই পুণাতেই কাটবে তাঁর শেষ জীবন এবং সেখানেই গড়ে উঠবে ইন্দিরার সহযোগিতায় ও প্রেরণায় তাঁর শেষ জীবনের আশ্রয় হরিকৃষ্ণ মন্দির?

তাঁর প্রেমের আকর্ষণে এবং দিব্য কণ্ঠের ভাবমাধুর্যে ভরা গানের টানে ক্রমে ক্রমে অনেক ভক্ত ও অনুরাগী এসে একত্র হলেন পুণাতে এবং তাঁদের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন অধ্যাত্ম-পথের দিশারি, প্রেরণাদায়ক এক সন্ত মহাপুরুষ, তাঁদের আদরের 'দাদাজি'। বাঙালীর ঘরোয়া 'মন্টুদা' যেন হারিয়ে গেল সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সিংহাসনে আসীন দাদাজির মধ্যে। তার উপর শেষের দিকে দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রু দিয়ে ঢেকে ফেললেন তাঁর হাস্যোজ্জ্বল অনিন্দ্য মুখমণ্ডল। এ যেন এক গম্ভীরানন গুরু নানক, যা আমাদের একান্ত অচেনা। পিছনে লাগলাম তাঁর এই দাড়ি রাখার জন্য, আমার সঙ্গে যোগ দিলেন তাঁর মাসতুতো ভাই, পণ্ডিচেরি আশ্রমবাসী কল্যাণ চৌধুরী, যিনি প্রখ্যাত লেখক ও সাহিত্যিক 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও বিখ্যাত শিকারী কুমুদ চৌধুরীর পুত্র। তিনি আমায় বললেন : 'চলো ভাই, আমরা দুজনে পুণায় যাই, গিয়ে ওর ঐ কুলোর মতো যে দাড়ি রেখেছে, সব চেঁচে দিয়ে আসি। ও বোধহয় জানে না শ্রীঅরবিন্দ একসময় বলেছিলেন জীবনে তিনি মাত্র তিন চারজন যথার্থ handsome men অর্থাৎ সুন্দর সুপুরুষ দেখেছেন এবং তাদের একজন হ'ল দিলীপ। আর সেই চাঁদের মতো মুখ কিনা ঢেকে বসে থাকল দাড়ি দিয়ে!'

কলকাতায় স-দাড়ি যেবার তাঁর আবির্ভাব সর্বপ্রথম, তখন সবাই তাঁকে ঘিরে বসেছেন। কিছু বাঙালী, কিছু অবাঙালী। আমি একপাশে বসে আছি চুপ ক'রে আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বললেন : 'এই এরা সব anti-দাড়ি' আর অবাঙালীদের দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললেন 'pro- দাড়ি হল এরা।' প্রথম দাড়িওয়ালা ছবি যখন পণ্ডিচেরি পাঠালেন তখন নলিনীকান্ত সরকারের কন্যারা এবং আরও অনেকে বিরূপ মন্তব্য করেছিল। তার কিছুদিন পরে প্রাণখোলা হাসিসমেত একটি দাড়িওয়ালা ছবি তাদের পাঠিয়ে পিছনে লিখে দিলেন শুধু : 'এইবার'? অর্থাৎ আমাকে কি আদৌ গুরুগম্ভীর লাগছে? এ ছবিটা দেখে বলো তো?

তাঁর চিরচপল পরিহাস-রসিক রূপ যাবে কোথায়? স্বরূপে তিনি সেই চিরদিনের দিলখোলা সরল সহাস্য-আনন মন্টুদাই ছিলেন শেষ দিন পর্যন্ত। অনেক চিঠিতে আমাকে লিখতেন শেষে : 'তোর সেই মন্টুদা', 'অর্ধবিস্মৃত মন্টুদা'। আমরা চিরদিন তাঁকে যেরূপে দেখে এসেছি তিনি অন্তরে অবিকল সেই রূপেই সমুজ্জ্বল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কি সাধে তাঁকে অনেকদিন দেখতে না পেয়ে লিখেছিলেন :

বহুদিন কেন তব সহাস্য
দেখিনি অমল-কমল-আস্য?

প্রস্ফুটিত কমলের মতোই ছিল তাঁর যেমন মুখাবয়ব, তেমনি তাঁর প্রেমে বিকশিত চিত্ত। তার কেন্দ্রকোরকে ছিল সেই মধু বা মাধুর্য, যা বহু ভ্রমরকে করত প্রলুব্ধ, টেনে আনত তাঁর হৃদয়-সন্নিধানে তারই আস্বাদনের লোভে। কণ্ঠের মাধুর্য, রূপের মাধুর্য, হাসির মাধুর্য, সবই ছিল তাঁর তুলনাহীন, একান্ত নিজস্ব। তাতে অনেকেই মজেছেন, সব কিছু খুইয়েছেন, আবার রূঢ় প্রত্যাখানে আহত হয়ে প্রত্যাঘাতে তাঁকে জর্জর করেছেন, নিজেরাও জর্জরিত হয়েছেন। যখন বম্বেতে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা, তখন প্রথম ঘরে ঢুকেই দেখি তিনি একটি ডিভানে শুয়ে আছেন চুপচাপ। কানে তখন কম শোনেন। ইন্দিরা চেঁচিয়ে বললেন : 'দাদাজি! উনি এসেছেন।' আমাকে বললেন ইন্দিরা, সকাল থেকে ব্যাকুল হয়ে আছেন তোমার আগমনের প্রতীক্ষায়। আমি কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে যেতেই বললেন : 'দাঁড়া, আগে উঠি, তোকে বুকে ধরি, ঝাঁঝরা পাঁজরা একটু জুড়োই।' অন্যের সাহায্যে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন পরম প্রেমের আলিঙ্গনে, যে-প্রেম দিয়েছে তাঁকে অপার আনন্দের সঙ্গে অপরিসীম বেদনাও, সারা জীবন ধরে'। মনে পড়ল শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে লেখা তাঁরই নিজের একটি গানের দুটি কলি :

প্রেমে গড়া, তনু, প্রেমে গড়া মন যা'র,
প্রেমে গড়া প্রাণ, নয়নে প্রেমের ধার।

নিজেও ছিলেন তিনি এমনি এক নিশ্ছিদ্র, নিরেট প্রেমমূর্তি। লিখেছিলেন একটি অনবদ্য সংস্কৃত শ্লোকে ও তার বঙ্গানুবাদে আপন আত্মপরিচয় :

প্রেম মম সাধনং প্রেম সঞ্জীবনং
বন্ধনে মুক্তিমণিতারা
বিরহ উদ্দীপনং মিলন উন্মাদনং
নিদাঘে শ্যামঘনধারা।।

প্রেম আমার সাধন জানি,
প্রেম আমার জীবন মানি
বন্ধনে সে মুক্তিমণিতারা
বিরহে প্রেম উদ্দীপন, মিলনে প্রেম উন্মাদন
নিদাঘে প্রেম স্নিগ্ধ বারিধারা।।

এখন পুণায় হরিকৃষ্ণ মন্দিরে তাঁর সমাধি বেদীতে এটি উৎকীর্ণ হয়ে আছে, যেটি তাঁর একমাত্র পরিচয় আমার কাছে।

'এ ধরায় দে বিদায় অধরায় প্রাণ চায়'
অশোক মিত্র

আমার শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি-বিস্মৃতির অনেকখানা জায়গা জুড়ে, এখন আবিষ্কার করে চমকিত হই, এক বিশেষ দিলীপকুমার রায়। একবার চিন্তা করে দেখুন তিরিশের দশকের অতি মন্থর বাংলাদেশের মফস্বল, মাঝে-মধ্যে পকেটে-পিস্তল নিয়ে ধরা-পড়া কোনো অকুতোভয় যুবককে নিয়ে রোমাঞ্চের উচ্ছ্বাস, ইংরেজ হাকিমকে গুলি করতে গিয়ে তাঁর গুলি কী কারণে ফস্‌কালো তার নানা ব্যাখ্যা। ফের দিনগুলির স্তিমিত হয়ে আসা, হঠাৎ কাছে-পিঠে কোথাও, আমাদের পাড়াতেই হয়তো বা, কোনো স্বদেশী ডাকাতি নিয়ে আলোড়ন। পরাধীন দেশ, ভূগোলের সম্যকরূপে সংকীর্ণ আকাশ, ইতিহাস মহামান্য ডি.পি. আই বাহাদুর যে-সব পাঠ্যপুস্তক মঞ্জুর করেছেন তাদের নিগড়ে অনুশাসিত, উল্লেখনীয় তেমন-কিছু ঘটে না ঘটবার নয়।

অথচ তবুও আমি স্বচ্ছন্দে অন্য পৃথিবীতে অহরহ চলে যেতাম, আমাকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যেতেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-তনয় দিলীপকুমার রায়। বই-ঠাসা বাড়ি ছিল এমন নয়, কিন্তু শোবার ঘরের কোণে যে-কাঁচ-দেওয়া আলমারি, তার দু'তাক জুড়ে সারি সারি বাঁধানো 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্‌ অনেক উদ্যোগের সঙ্গে পত্রিকাটির প্রকাশ ও ব্যবসায়িক সফলতার জন্য প্রয়াসবান হয়েছিলেন দিল্লির দরবারের বছর, অথবা তার অব্যবহিত পরবর্তী মুহূর্তে, তাঁদের আমন্ত্রণে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রতিষ্ঠাতা- সম্পাদক। তবে এখন আর তথ্যটি সম্পর্কে ততটা সুনিশ্চিত নই। প্রথম সংখ্যা বাজারে বেরোবার আগেই দ্বিজেন্দ্রলাল প্রয়াত হয়েছিলেন, হরিদাস চাটুয্যে মশাইরা তা হলেও প্রতিটি সংখ্যায় প্রথম সম্পাদক হিশেবে দ্বিজেন্দ্রলালের নামোল্লেখ করতেন পরিচিত অভ্যাসের মতো। তা ছাড়া, ১৩২৮-২৯ সাল থেকে শুরু করে, 'ভারতবর্ষ'-এর সংখ্যার পর সংখ্যা জুড়ে, দ্বিজেন্দ্রলাল-পুত্র দিলীপকুমার রায়ের অজস্র রচনা। বাংলাদেশের মফস্বল শহরের গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্তের শিথিল দ্বিপ্রহর অপরাহ্ণ, আট-নয় বছরের এক নিরেট অনুভূতির বালক, যার চেতনা ডাঁই-করা অজ্ঞতায় সমাচ্ছন্ন, সে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টে যাচ্ছে, কিছু বুঝছে, অধিকাংশই বুঝছে না, প্রায়ই তার দৃষ্টি ঠেকে যাচ্ছে একটি বিশেষ নামে, শ্রী দিলীপকুমার রায়, যিনি লিখে চলেছেন, লিখেই চলেছেন, কী যেন সব ধাঁধা-লাগানো শিরোনাম, 'মনের পরশ', 'রঙের পরশ' সেই সঙ্গে, থেকে-থেকে, 'ভ্রাম্যমাণের জল্পনা'। তখন ঠিক বুঝতে পারতাম না, এখন বিস্মরণে ঢাকা পড়ে গেছে, 'মনের পরশ' কিংবা 'রঙের পরশ' সত্যি-সত্যিই কি উপন্যাস ছিল, নাকি উপন্যাসের ছলে তর্কের বিন্যাস, নাকি তর্কের বিন্যাসের পটভূমিকায় উপন্যাসের বিস্তার, প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পর্বে বিশেষ করে জর্মান সাহিত্যে যে-প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তার প্রভাবে বা অনুসরণে? অথচ সেই না-বোঝার কুজ্ঝটিকা

সত্ত্বেও ঐ গোগ্রাসে বাক্য-বাক্যবন্ধ গিলতে-থাকা বালকটির একটু-একটু করে দূরের আকাশে পৌঁছে যাওয়া, দূর থেকে আরো দূরতর আকাশে। পৌঁছে দিতেন শ্রী দিলীপকুমার রায়। 'ভ্রাম্যমাণের জল্পনা' পরে হরিদাসবাবুরাই বই আকারে প্রকাশ করেছিলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে ঢুঁড়লে পরে, কে জানে, কীটদংশিত একটি অবশিষ্ট কপি মিললেও মিলতে পারে। তবে আমার অবলম্বন ছিল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সেই বাঁধানো সংখ্যাগুলি। দিলীপকুমার শেষ পর্যন্ত কেম্ব্রিজ থেকে ট্রাইপোজ কিংবা অন্য-কোনো ডিগ্রী নিয়েছিলেন কি না তা আজ পর্যন্ত আমার জানা নেই, কিন্তু তখনও তিনি প্রবাসী, কেম্ব্রিজ থেকে বেরিয়ে পড়েছেন, ইওরোপের যত্রতত্র বিহার করে বেড়াচ্ছেন। বাঘা-বাঘা বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করে আলাপচারী হচ্ছেন, কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিক-রাজনীতিবিদ-নব-নব আবিষ্কারে পৃথিবীকে চমকে দেওয়া বৈজ্ঞানিক কিংবা পয়সা-জমানো ব্যাবসাদার, কে নন দিলীপকুমার রায়ের শিকারের লক্ষ্য। বাইরের বিশাল পৃথিবীর জটিল সরল নানা তথ্য কোন্ অজ্ঞাত সুড়ঙ্গ দিয়ে শিশু বা কিশোরের বোধে সেঁধিয়ে যায় কে জানে, এখন মনে আনা অসম্ভব কোন্ সূত্রে জানতে পেরেছিলাম সুভাষচন্দ্র বসু-ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-দিলীপকুমার রায় অভিন্নহৃদয় সখা ছিলেন, কেম্ব্রিজে সর্বদা এক সঙ্গে ঘোরাফেরা করতেন, যে-কারণে তাঁদের পরিচয় রটেছিল থ্রী মাস্কেটিয়র্স। একজন ফিরে এলেন আই. সি. এস-ত্যাগী রাজনৈতিক নেতা রূপে, আরেকজনের দেশে, এবং কলকাতায়, প্রত্যাবর্তন সমাজতত্ত্ব-নৃতত্ত্বের অধ্যাপক হিশেবে, আর তৃতীয়জন, তিনি যেন ফিরলেনই না, মনের পরশে-রঙের পরশে বিভোর হয়ে রইলেন কয়েকটা বছর, সতত ভ্রাম্যমাণ, চরে বেড়াচ্ছেন-চষে বেড়াচ্ছেন এদেশ-ওদেশ, প্রকৃতিবর্ণনায় তাঁর বিশেষ উৎসাহ নেই, কবি-মনীষী-ঔপন্যাসিক-চিন্তানায়কদের সঙ্গে দেখা করছেন, তাঁদের বিতর্কে-আলোচনায় জড়িয়ে নিচ্ছেন, বার্ট্রাণ্ড রাসেল-রমাঁ রোলাঁ বর্নার্ড শ-এইচ. জি. ওয়েলস্-মেটারলিঙ্ক কেউ-ই বাদ যাচ্ছেন না, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার পৃষ্ঠায় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুলিখন, আমি যৎসামান্য বুঝছি, বেশির ভাগই বুঝছি না, তবু মনের মধ্যে ঘোর, স্তরের পর স্তর বিস্ময়ের জড়ো হওয়া, যে-বিস্ময়ের কেন্দ্রবিন্দু শ্রী দিলীপকুমার রায়।

'ভ্রাম্যমাণের জল্পনা' পড়ছি, এরই মধ্যে 'ভারতবর্ষে'র কোনো সংখ্যায় ওঁর অনিন্দ্যকান্তি ছবি দেখে মুগ্ধ হচ্ছি, প্রায় একই সময়ে লোকপ্রবাদের মারফৎ ক্রমশ জানতে পারছি এই আশ্চর্য মানুষটি স্রেফ তাঁর সংগীতপ্রতিভা দিয়েই আমাদের মাৎ করে দিতে পারেন : তাঁর কণ্ঠলাবণ্য তথা কণ্ঠবলিষ্ঠতার কথা উহ্য থাক, ভারতীয় মার্গ সংগীতের গভীরে তাঁর যেমন অনায়াস প্রবেশ, পাশাপাশি ইওরোপীয় ধ্রুপদী সংগীতে তাঁর সমান স্বভাবপ্রতিভা, তা ছাড়া কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের পরিবারের ঐতিহ্যও তো তুচ্ছ করার মতো নয়। যদি কোনোক্রমে ওঁকে একবার দেশে এনে ফেলা যায়, গানের বন্যায় ভাসিয়ে দেবেন গোটা বাংলাকে, সেই পরমসুখকর আগামী অভিজ্ঞতার পূর্বশিহরণ মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরে-ঘরে। ঠিক ঐ সময়েই কি, আড়াই মিনিটের আটাত্তর-গতি গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রথম 'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হতে কী সংগীত ভেসে আসে,' 'বঙ্গ আমার জননী আমার' কিংবা 'লচক লচক বিজলী ঝলক' শুনে অভিভূত হয়েছিলাম, না কি তা আরো পরে তা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে স্মৃতিশক্তি এখন অপারগ।

তবে আমি তখনও প্রধানত ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকার বাঁধানো খণ্ডগুলির মোহিনী মায়ায় আচ্ছন্ন। ‘ভ্রাম্যমাণের জল্পনা’ থেকেই দিলীপকুমারের বিশেষ রচনাবিভঙ্গ শুরু, ‘সবুজপত্র’-এর শিক্ষা বিফল হয়নি। চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহারযুক্ত বাক্যবন্ধনের রেওয়াজে অভ্যস্ত হতে অন্য অনেকের খানিকটি সময় লাগতে পারে, কিন্তু দিলীপকুমারের নয়। রচনাগুলির আদল চিঠিপত্রের মতো। উচ্ছ্বাসের ঠাসবুনোনে-বিশিষ্ট শব্দাবলীর মিছিল, একই সঙ্গে নির্ভার ও ভারযুক্ত, কারণ আলাপের ঢঙে হলেও প্রচুর তত্ত্বকথা, কাব্য-বিশ্লেষণের সঙ্গে দর্শন, নিসর্গশোভা বর্ণনার পাশাপাশি রাজনীতির প্রসঙ্গ, দেশ থেকে ও দেশে বিহার, এ শহর বা পল্লীপ্রান্ত থেকে ঐ মহানগরে কিংবা অন্যত্র, বিখ্যাত-বিখ্যাত নামের শোভাযাত্রা, এই বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথোপকথনের প্রায়-অন্তহীন ধারা বিবরণী, মাঝে-মাঝে কোনো ইংরেজি শব্দের অথবা আস্ত ইংরেজি বাক্যবন্ধের অনুপ্রবেশ, বিবেকবান দিলীপকুমার সঙ্গে-সঙ্গে তার বা তাদের বাংলা সারানুবাদও পেশ করেছেন। আমি কিছু বুঝছি বেশির ভাগই বুঝছি না, শুধু সব ছাপিয়ে এটা অনুধাবন করছি অন্য অলৌকিক জগৎ, একটি বিশেষ আলোক-উজ্জ্বল ব্রহ্মাণ্ডই যেন, ‘ভ্রাম্যমাণের জল্পনা’র মধ্যে লুকিয়ে আছে, অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যেতে চাইছে আমাকে। এরই মধ্যে কোনো এক কিস্তিতে, না কি বেশ কয়েকটি কিস্তি জুড়ে, দিলীপকুমার-কর্তৃক এক ধনী সুমার্জিত ফরাশি দম্পতির নামকীর্তন, শ্রী ও শ্রীযুক্তা পল রিশার। কোনো-একটি সংখ্যায় ‘ভারতবর্ষ’-এর অর্ধেক পাতা দখল করে মাদাম পল রিশারের ছবি, ভদ্রমহিলা টেনিস খেলছেন। তখন পর্যন্ত মহিলারা লম্বা পোশাক পরেই টেনিস খেলতেন, মাদাম রিশারেরও সেই রকমই পোশাক, তবু ঐ অতি বালকবয়সেও যে-চিন্তা আমাকে তাড়া করে বেড়াতো : মহিলা খেলতে নেমেছেন, হাতে টেনিস র‍্যাকেট, কিন্তু সারা শরীর জুড়ে অত ঝলোমলো অলংকারের সমারোহ কেন? কয়েক বছর বাদে, যখন জ্ঞানগম্যির বহর একটু বেড়েছে, আরো অনেক খবরাখবরে ধাতস্থ হচ্ছি, হঠাৎ তথ্যটি শুনে আমার থ হবার উপক্রম, ও হরি, পণ্ডিচেরি আশ্রমের অধীশ্বরী শ্রী মা আর কেউ নন, ঐ মাদাম পল রিশারই। বিত্তবতী সাঁলোতে-সম্রাজ্ঞীরূপে-অধিষ্ঠিতা প্যারিসবাহিনী মহিলাটি কী করে শ্রীঅরবিন্দের অনন্ত আলোক-অনুসন্ধানের প্রব্রজ্যায় ভাবসহচরী হলেন, সেই কাহিনী ‘ভ্রাম্যমাণের জল্পনা’য় ধরা পড়েনি, এমন কি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে উক্ত মহিলার প্রথম যোগাযোগ দিলীপকুমারের মারফৎই কিনা, তা সুদ্ধ জানি না, কবুল করতে দ্বিধা নেই, এখনো তা জানি না। তবে এরই মধ্যে ‘ভ্রাম্যমাণের জল্পনা’, ‘রঙের পরশ’, ‘মনের পরশ’-এর অপার্থিব মায়ারাজ্যে বিহার করতে গিয়ে আমার চমকিত-শিহরিত-ঘোর লাগা-অবস্থা। এই অবস্থার মধ্যেই হঠাৎ-হঠাৎ চোখে পড়ে দিলীপকুমার-কৃত গানের স্বরলিপি। আমি স্বরলিপির বয়ান বুঝি না, তখনো বুঝতাম না এখনো বুঝি না, কিন্তু ঐ সকলপারঙ্গম ব্যক্তিটি সম্পর্কে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিস্ময়ের মিশে-যাওয়া এক মোহমুগ্ধ উপচার সাজিয়ে প্রতি মুহূর্তে তাঁকে আমি তখন সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

স্মৃতি কোনো অনুশাসন মানতে চায় না, আমার পক্ষে তাই বলা মুস্কিল ঠিক কখন ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকা অতিক্রম করে আমি ‘প্রবাসী’, ‘বিচিত্রা’র প্রকোষ্ঠেও পা বাড়িয়েছি, আবিষ্কার করেছি দিলীপকুমার রায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও ব্যতিব্যস্ত করে রাখছেন চিঠির

পর চিঠির ঝড়ে, কী প্রসঙ্গ নেই সে-সমস্ত চিঠিতে, বের্গস-র দর্শনের ব্যাখ্যা থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের অমুক গানের রাগ বা রাগবিচ্যুতি নিয়ে দিলীপকুমারের তুখোড় বাক্যোচ্ছ্বাস, বেচারী রবীন্দ্রনাথ, সন্দেহ না হয়েই পারে না, এই তর্কের প্রবল প্রপাতে বিধ্বস্ত-পর্যুদস্ত, কখনো 'স্নেহের মন্টু'কে বাধ্য হয়ে একটু দীর্ঘায়িত চিঠি দিচ্ছেন, কখনো দ্রুত শান্তিকামনায় দিলীপকুমারের যুক্তি ঝটপট ঘাড় নেড়ে মেনে নিচ্ছেন, কখনো তাঁর থেকে প্রায় চল্লিশ বছরের ছোটো ভ্রাতুষ্পুত্রপ্রতিমটিকে নিয়ে ঈষৎ হুলহীন কৌতুকের আশ্রয় অন্বেষণ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবদ্দশায় তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। যদিও তার অধিকাংশ দায় রবীন্দ্রনাথের উপর নিশ্চয়ই বর্তায় না, তা হলেও, মনে না হয়েই পারে না, দিলীপকুমার সম্পর্কে আবহমান একটি অনুশোচনা-মিশ্রিত অপত্য স্নেহ তিনি সযত্নে লালন করে গেছেন। তার মানে এই নয় যে জনান্তিকে দিলীপকুমারকে নিয়ে রঙ্গ করা থেকে তিনি নিবৃত্ত থাকতেন। বেচারী রবীন্দ্রনাথকে কম সহ্য করতে হয়নি, হঠাৎ-হঠাৎ দিলীপকুমার, পণ্ডিচেরি থেকেই হয়তো, শ্রী অরবিন্দের আস্ত ইঁটের আকৃতির ভাব-গম্ভীর কাব্যচর্চার নিদর্শন পাঠাতেন, সেই সঙ্গে সে-সমস্ত নিদর্শনের 'মৎ-কৃত' বাংলা অনুবাদ, উভয় সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত দাবি করে। দিলীপকুমার বরাবরই নাছোড়, 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'-গোছের মামুলি বচনে তাঁকে এড়ানো মুস্কিল, রবীন্দ্রনাথ অথৈ জলে। সাধে কি আর রবীন্দ্রনাথ আতঙ্কে-নীল-হয়ে-এসে কাকে যেন জানিয়েছিলেন : অনেককাল দিলীপ চিঠি দেয়নি, তাই পরম শান্তিতে আছেন।

শৈশব পেরিয়ে ইতিমধ্যে আমি কৈশোরে অতিক্রান্ত। পরাধীন দেশের স্তিমিত মফস্বলেও জ্ঞানের-চেতনার পরিধি একটু-একটু করে বাড়ে। গুরুজনদের কথোপকথন থেকে কিছু-কিছু তথ্য সংগ্রহ, কিছু-কিছু এখান-ওখান থেকে পড়ে পাওয়া। তবে এখনো যা আমার কাছে কুয়াশায় ঢাকা ঠিক কবে দিলীপকুমার ইওরোপ থেকে দেশে ফিরে এলেন, কবেই বা শ্রীঅরবিন্দের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কলকাতাস্থ উচ্চবিত্ত কাতার-কাতার যুবতীতরুণীদের দীর্ঘশ্বাসের কারণ হয়ে পন্ডিচেরি চলে গেলেন। আমার এটাও জানা নেই কবে তিনি ধুতি-পাঞ্জাবী-এলায়িত-চাদর-জড়ানো ঘোর বাঙালি বেশ পরিত্যাগ করে নামাবলী সমাচ্ছন্ন গেরুয়ার আড়ালে চিরকালের জন্য চলে গেলেন। তবে আমার একটু-একটু করে বেড়ে ওঠারই পাশাপাশি, দিলীপকুমারের গানের বন্যায় বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভেসে যাওয়ার উপক্রম : 'তোমার ফুল বাগিচায় রইবো চাকর আমায় চাকর রাখো জি', 'বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম', 'বৈষ্ণব জনতো', 'মুরলী মধুর বাঁশি বাজে'। জনশ্রুতি, শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী সিনেমার জন্য মীরার ভজন গাইবেন, খোদ দিলীপকুমারের কাছ থেকে তালিম নিয়েছেন, অন্যথা শুভলক্ষ্মীর কোনো দিন শুভলক্ষ্মী হয়ে ওঠা সম্ভব হতো না। তাঁকে নিয়ে এত-এত উন্মাদনা-হুল্লোড়, কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্তের নিরামিশ আধ্যাত্মবাদে আস্থা নেই, দিলীপকুমারের গান অপছন্দ করেন এমন গোষ্ঠীর চোরাগোপ্তা আক্রমণের তাই শানানো ছুরি : ঢঙ দেখে আর বাঁচিনে, রাগ নিয়ে এত ঢলাঢলি কেন, আলাপের আদিখ্যেতা একটু কম হলেই কি ভালো হতো না, ইত্যাদি।

দিলীপকুমার ও উমা বসু

একটি উপাখ্যান, যা ঢাকা শহরে তখন খুব চাউড় হয়েছিল, এবং যা রটে তার কিছু তো বটেই। প্রতিভা বসুর 'জীবনের জলছবি' আত্মস্মৃতিতে উল্লেখ নেই এই কাহিনীর, তবে তার একাধিক কারণ অনুমান করে নেওয়া তেমন দুঃসাধ্য নয়। তিরিশের দশকের গোড়ার দিক, প্রতিভা বসু তখনো প্রতিভা বসু হননি, আমাদের ঢাকা শহরে তখনো তিনি রানু সোম, গানের গলার জন্য সুখ্যাতি কুড়োচ্ছেন, বাজারে একটি-দু'টি রেকর্ড বেরিয়েছে। দিলীপকুমার রায় দমকা হাওয়ার মতো একদিন-দু'দিনের জন্য আসতেন, থাকতেন পরমবন্ধু আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বৃক্ষ-পুষ্প-ঘেরা বাংলোতে, একটি-দু'টি সভায়, তেমন করে কেউ ধরে পড়লে, গান গাইতে রাজি হতেন, ভিড় উপচে পড়তো। তা ছাড়া একদিন -দু'দিন হয়তো বা স্নেহাস্পদা রানু সোমকে কোনো-একটি সদ্যরচিত গান ধরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বনগাঁ পাড়ায় তাঁদের বাড়ি যেতেন। যেমন যেতেন কাজী নজরুল ইসলামও : প্রায় একই সময়ে, খেয়ালের বশে হয়তো বন্ধুবান্ধব পরিবৃত হয়ে শেয়ালদায় ট্রেনে চেপে ঢাকা পৌঁছে গেছেন, উঠেছেন সন্‌জিদা খাতুনের বাবা কাজী মোতাহার হোসেনের আলয়ে, কিংবা অন্য কোথাও, গানের বন্যায় ঢাকা শহরকে ভাসিয়ে দিয়ে গেছেন যে-ক'টা দিন থেকেছেন। নজরুলও যেতেন রানু সোমদের বনগাঁর বাড়িতে, দিলীপকুমার রায়ের মতোই, কণ্ঠলাবণ্যবিশিষ্টা এই তরুণীটিকে উৎসাহ-আশীর্বাদ জানাতে, নয়তো নতুন কোনো গানে তালিম দিতে আসতে। পাড়ায় বখাটে ছেলেছোকরার অভাব ছিল না, তাদের অধিকারবোধ প্রবল, নজরুল তা তিনি যতই বিখ্যাত হোন, তাঁদের পাড়ার মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করবে তা তাদের ঘোর অপছন্দ। একদিন সন্ধ্যায়, পুরসভার টিমটিম রাস্তার আলো, রানু সোমদের বাড়ির দোরগোড়ায় ঘোড়ার গাড়ি থামলো, নজরুল চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে গাড়ি থেকে নামলেন, সঙ্গেসঙ্গে কতিপয় যুবকের তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিল-চড়-ঘুষির বর্ষণ : সেই মুহূর্তে, যে-জনপ্রবাদ ঢাকা শহরে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, নজরুলের সকাতর ঐতিহাসিক উক্তি : 'ওরে, তোরা ভুল করছিস্, আমি দিলীপ নই, দিলীপ নই, আমি নজরুল।' তিনি যে নজরুল হওয়া-হেতুই প্রহৃত হলেন, দিলীপ-হেতু নন, তা সরলপ্রাণ নজরুলের ধারণার বাইরে, কিন্তু ঘটনাক্রমের, অথবা পরিবাদপ্রবাহের, এমনই কর্কশ রসিকতায় মফস্বলীয় পাড়াটে বেলেল্লাপানার সঙ্গে দিলীপকুমার রায়ের নাম যুক্ত হয়ে রইলো।

অথচ, ঠিক এরই কাছাকাছি সময়ে, এটাও তো আমার জানা হয়ে গিয়েছিল বিশের দশকের উপান্তে ঢাকা শহর থেকে বুদ্ধদেব বসু - অজিত দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ক্ষীণায়ু 'প্রগতি' পত্রিকায় দিলীপকুমার মহা উৎসাহে ভূরি-ভূরি লেখা পাঠাতেন, চিঠি-প্রবন্ধ-কবিতা-গান, বুদ্ধদেব বসুর প্রথম দিকের রচনার, বিশেষ করে 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যের গুণমুগ্ধ তিনি। বুদ্ধদেব বসুরা তাঁর, দিলীপকুমারের, রচনার সমান গুণমুগ্ধ কিনা, কিংবা কতটা গুণমুগ্ধ, তা আমার জানতে-বুঝতে আরো কয়েক বছর গড়িয়ে গেল।

তবে, রাজনীতির অঙ্গন জুড়ে সুভাষচন্দ্র বসুর যেমন, সাহিত্য-সংস্কৃতি-সংগীতের সীমিত বাঙালি পৃথিবী জুড়ে দিলীপকুমারের ক্র[illegible]মান বিখ্যাতি, তাঁকে ঘিরে অজস্র কাহিনী-আলোচনা। দ্বিজেন্দ্রলালের একমাত্র পুত্র, প্রতিভার এত-এত বিকীর্ণ ধারা,

কণ্ঠৈশ্বর্য সবাইকে স্তম্ভিত-মুহ্যমান করে আনে। মীরার ভজন গাইছেন, ভারতীয় মার্গ সংগীতের সঙ্গে তাঁর গায়কীর নিবিড়তম মাখামাখি, অথচ ইওরোপীয় সংগীতের বহুতর ধারাকে কী অনায়াস সাচ্ছল্যে বাংলা গানের স্বরলিপিতে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ -রবীন্দ্রনাথের পিয়ানো-ভায়োলা নিয়ে পরীক্ষা-অনুশীলন আরো অনেক ছাপিয়ে দিলীপ-কুমার রায়ের পরীক্ষা, তাঁর গানের প্লাবনে বাঙালি সমাজ উতল। পাশাপাশি, তাঁর অজস্র লেখালেখি, রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত শ্রাবণের ধারার মতো, একটু-একটু করে তাঁর রচনাশৈলীর বিশেষ আদলটি আমাদের কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। প্রধানত এঁকে-ওঁকে-তাঁকে উদ্দিষ্ট মস্ত চিঠির ভণিতা আশ্রয় করে তাঁর নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রার মতো, স্বাধীন আকাশে দাপিয়ে বেড়ানো, গদ্যের বারান্দা থেকে হঠাৎ দুই-তিন চরণ কবিতায় উত্তরণ, কোনো বিদেশী মনীষীর রচনা থেকে উদ্ধৃতি, মূল পাঠ নীরস গদ্য, দিলীপকুমারের অনুবাদে তা পদ্যে রূপান্তরিত। আমার সেই কৈশোর থেকেই ধারণা : কাব্যচর্চায়, তাঁর যে-আগ্রহ ছিল, সমপরিমাণ স্বভাব-প্রতিভা ছিল না, অনেকটা গা-জোয়ারি ব্যাপার, ঐ অন্য পণ্ডিচেরী-প্রবাসী নিশিকান্ত রায়চৌধুরীর মতোই। কিন্তু দিলীপকুমার রায়কে ঠেকাবেন কে বা কারা, অপ্রতিরোধ্য তাঁর রচনার তোড়, তিনি বুদ্ধিমন্যতার স্বাক্ষর রাখতে চান পংক্তির পর পংক্তিতে, কিন্তু অশাসিত আবেগের প্রকোপে প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর সেই প্রয়াস পরাভূত। অথচ সব মিলিয়ে একটি আলাদা স্বাদ তো অনুপস্থিত নয় : নববিভঙ্গের একটি সাহিত্যসৃষ্টি, দিলীপকুমার যেন আড্ডা দিচ্ছেন আমাদের সঙ্গে, জমাটি আড্ডা, যে-আড্ডায় কোনো নিয়মনিগড় নেই, তিনি বর্ণাড শ' কিংবা অল্ডাস হাক্সলীর লেখা থেকে (দিলীপকুমার বরাবর লিখতেন 'আলডুস') একটি টইটুম্বুর বাক্য উপহার দিচ্ছেন, নয়তো তাঁর পরম সুহৃদ্, ভারতীয়- দর্শনে-মজে-যাওয়া আইরিশ কবি রোনাল্ড ডিক্সন ওরফে কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে তাঁর সুগম্ভীর অধ্যাত্ম-আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ, পর মুহূর্তে কোনো গানের সুললিত চরণ, খরস্রোতা ঝর্ণার মতো যার ছিটকে নিচে নেমে আসা, ঝিলকিয়ে অনেক উঁচুতে জল ছিটিয়ে দেওয়া। মানুষটির সমগ্র চরিত্রের মতো, তাঁর প্রতিটি লেখাই খেয়ালি, কখনো হয়তো কোনো গহন চিন্তার গোপনতম কন্দরে পৌঁছে দেয়, কিন্তু কয়েক মুহূর্তের যতি অতিক্রান্ত হলেই আনন্দে-কৌতুকে আমরা অবগাহিত হই, দিলীপকুমার নিগড়ের মধ্যে নেই, শৃঙ্খলের মধ্যে নেই, তিনি সতত-চঞ্চল, সদাভ্রাম্যমাণ।

আজ থেকে ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগেকার সামাজিক পরিস্থিতির কণ্ডূয়ন করছি, বাঙালি মধ্যবিত্ত কিছুতেই মেলাতে পারছিলেন না কী করে এই অপরূপকান্তি প্রায়-সর্বপারঙ্গম প্রতিভাধর পুরুষ, কোন্ মোহিনীমায়ায় বিবশ হয়ে, সব-কিছু ছেড়ে-ছুড়ে পণ্ডিচেরীতে স্থিত হলেন, দিলীপকুমার রায় থেকে শ্রী দিলীপকুমার, যে-সমাজ তাঁকে শিরোপায় ভূষিত করতে উন্মাদ-উদ্গ্রীব, তাকে অতি সহজে এড়িয়ে। পণ্ডিচেরিতে স্বেচ্ছানির্বাসিত, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কী সব কুচুটে উচ্চচিন্তা , সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় আমরা তার পূর্ণ পাঠ পড়তে পাই, তেমন বুঝিসুঝি না কিছুই। তারই ফাঁকে ফাঁকে চিঠি, গণ্যমান্য এঁকে-ওঁকে-তাঁকে, চমৎকার কথাবার্তায় ঠাসা, কবিতা বা গানের উপস্থিতি

যে-সমস্ত চিঠিপত্র ততদিনে দ্বিতীয় প্রকৃতি হিশেবে আমরা মেনে নিয়েছি। প্রবন্ধ আকারের একটি চিঠির কথা প্রায়ই আমার মনে পড়ে, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় যা প্রকাশিত হয়েছিল। উদ্দিষ্টা শ্রীযুক্তা নীলিমা দেবী, প্রসঙ্গ জবাহরলাল নেহরু। জননেতা জবাহরলাল, ভাবুক জবাহরলাল, ব্যক্তি জবাহরলালের বিষয়ে এর চেয়ে তীক্ষ্ণতর, উৎকৃষ্টতর আলোচনা আমার অন্তত আজ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। পত্রাকার এই প্রবন্ধেই ডাকসাঁইটে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দদের সম্পর্কে দিলীপকুমার সেই চমৎকার গল্পটি বিধৃত করেছেন : কোনো কংগ্রেসী অধিবেশন উপলক্ষ্যে সায়াহ্নে জলসার আয়োজন করা হয়েছে, দিলীপকুমার সংগীত পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রিত, কিন্তু নেতাদের বয়েই গেছে গান শুনে সময় নষ্ট করবার, তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলাপে মশগুল, এমন সময় জবাহরলালের উঠে দাঁড়িয়ে হুংকার : 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনার নিজেরা যদি গান শুনতে আগ্রহী না হোন, না শোনার সেই স্বাধীনতা আপনাদের কাছে, কিন্তু যাঁরা শুনতে চান, দয়া করে তাঁদের অন্তত শুনতে দিন।' মন্ত্রবৎ সভা হলো নিস্তব্ধ, দিলীপকুমার গাইতে শুরু করলেন। মুখোমুখি হয়তো একমাত্র শ্রোতা জবাহরলাল নেহরু।

হঠাৎ কি আমি 'ভূস্বর্গ-চঞ্চল'-এ পৌঁছে গেলাম? বাঁধানো 'ভারতবর্ষে'র ঋতু শেষ, এখন ডাকে-আসা হালের সংখ্যাগুলির জন্য আমার অধীর অপেক্ষা? কোন্ সময় হবে সেটি? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সদ্য বেধেছে কি বাধেনি, দিলীপকুমার সুহৃদ্-শিষ্যশিষ্যা পরিবৃত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, কাশ্মীরে, কয়েক মাসের ব্যবধানে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে, খাসি-গারো পাহাড়ে। ভ্রমণ বৃত্তান্ত ছাপিয়ে যাঁদের নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন তাঁদের প্রসঙ্গ, যাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন, যাঁদের সঙ্গে দেখা করেছেন তাঁদের নিয়ে অঢেল কথা। স্বয়ং গান্ধিজী 'ভূস্বর্গ-চঞ্চলে' জায়গা জুড়ে আছেন। দিলীপকুমার দর্শন করতে গেছেন, গান্ধিজীর জিজ্ঞাসা : But haven't you brought the nightingale? না, গান্ধিজীর চিন্তার কারণ নেই। গান্ধিজী-বর্ণিত বুলবুল কলকাতার উমা বসু, যাঁর কণ্ঠের মূর্ছনা অগ্নিস্রাব গলিত ধাতুর মতো, এই উঁচু পর্দায় চড়ছে, পরমুহূর্তে সুগভীর খাদে নেমে আসছে। গাম্ভীর্য, তীক্ষ্ণতা, সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য, মাধুর্য, গতি লয়শুদ্ধতা : এক সঙ্গে জড়ানো এক অত্যাশ্চর্য কণ্ঠের অধিকারিণী, যাঁকে দিলীপকুমার, পণ্ডিচেরী থেকে কলকাতা ঘুরে যাওয়ার প্রতিটি সুযোগ ব্যবহার করে, তাঁর নিজের গানের, নিজের ঢঙের, নিজের একান্ত ঘরানার জন্য নিটোল তৈরি করে নিয়েছেন। বুলবুলটি এগিয়ে এসে প্রণামান্তে গান্ধিজীকে গান নিবেদন করলেন, গান্ধিজী খুশিতে উদ্ভাসিত, মাথা ছুঁয়ে আশীর্বাদ জানালেন। দৃশ্য পরিবর্তন। দিলীপকুমার সীমান্ত গান্ধি ও তাঁর ভ্রাতা ডক্টর খাঁ সাহেবের অতিথিসৎকারের বর্ণনা দিচ্ছেন। পেশোয়ারে এবং খাইবার-সন্নিহিত অন্যত্র, খুদাই খিদ্‌মদ্‌গরদের শৌর্যের বিবরণ, তাঁদের ত্যাগের, নম্রতারও। নিসর্গশোভা বর্ণনা ছাপিয়ে নানা উল্লেখনীয় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বিনিময় - প্রতিবিনিময়ের আঁকড়ে-ধরা বিবরণ। এখানেও কিন্তু দিলীপকুমারের লেখকশৈলী উটকো ঝোঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা : ছলছল প্রবাহিত শানানো গদ্য, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে ঠিকরে বেরিয়ে যাওয়া, হঠাৎ কোনো উদ্ধৃতি বিদেশী ভাষায়, তার বঙ্গানুবাদ কখনো গদ্যে, কখনো কবিতার ঢঙে। অনেক ক্ষেত্রে আমার যেন মনে হয় ঐ জুড়ে দেওয়া

কবিতাংশ ছন্দে খাটো, ওঁর কাছে অথচ যা হয়তো আদৌ খাটো বলে মনে হয়নি, কারণ ওঁর তো সংগীতবিদের কান, প্রলম্বিত-সংকুচিত তান-লয়ে ব্যাকরণিক ত্রুটি ঢাকা পড়ে গেছে। তখনও আমার সত্তা জুড়ে মুগ্ধতার ঘোর, অথচ তা-ও মাঝে-মাঝে ঈষৎ অস্বস্তিবোধ, 'ভূস্বর্গ-চঞ্চল'-এর অধ্যায়ের পর অধ্যায় জুড়ে ঔজ্জ্বল্য ছিটকে পড়ছে, কিন্তু ওরই মধ্যে, চাঁপা-করবীদের ডালপালা আদৌ উতল না করে, প্রায়ই শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্মদর্শন নিয়ে আমার-কাছে-উটকো-মনে-হওয়া স্তবকের পর স্তবক; তা ছাড়া শব্দ প্রয়োগ ও ব্যবহারে দিলীপকুমারের বিচার-বিবেচনা সম্পর্কে আমার ক্রমশ-উত্থিত অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ। হর্ষোচ্ছ্বাসের প্রকাশ বোঝাতে যে-ইংরেজি শব্দটি দিলীপকুমার বরাবর ব্যবহার করেছেন তার প্রকৃত অর্থ সেই বয়সেই আমি জানি, শুক্রনিষ্কাশন, এবং এটা ভেবে আমার অবাক হওয়া, ওঁর আশেপাশে কি কেউ-ই নেই চুপি-চুপি ওঁকে এই অস্বস্তি উদ্রেককারী স্খলন থেকে নিবৃত্ত করতে পারেন?

এখন আর মনে আনতে পারি না, 'ভূস্বর্গ-চঞ্চলে'ই, সুভাষচন্দ্র'ই কিংবা সুভাষচন্দ্র-সখা ধর্মবীর দম্পতির একাধিক উল্লেখ পাই, ডালহৌসীতে দিলীপকুমার এই বিখ্যাত চিকিৎসক স্বামী-স্ত্রীর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের সহৃদয়তার বিশদ বিবরণ। ধর্মবীরদের কন্যাদ্বয়, যাঁরা নিজেরাও পরে নিজেদের বেছে-নেওয়া বৃত্তির ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি কুড়িয়েছিলেন, তাঁদেরও উল্লেখ ছিল কি? হয়তো বা ছিল। কিন্তু যা মনে আনতে পারি তা কাশ্মীর নিয়ে দিলীপকুমারের অহরহ আবেগশীর্ষে পৌঁছে যাওয়া। যে-মানুষ খানিকটা নির্দোষ কপটতার সঙ্গে দাবি করেন ভ্রমণ-ট্রমন তাঁর দুই চোখের বিষ, বিশেষ করে খিলানমার্গ-গুলমার্গের বন্ধুর চড়াই-উৎরাই মোটর-যানে পরিভ্রমণে তাঁর নাকি স্বভাবঅনীহা, সেই সঙ্গে ভয় ('জানো না কি ক্যাপসাইজিং কাকে বলে সাহেবেরা, মোটর মানুষ চড়ে কেন ইঞ্জিচেয়ার সবার সেরা'), অথচ দিলীপকুমারকে যখন ঠেলে-ঠুলে বেরিয়ে পড়তে একবার রাজি করানো গেছে, আমাদের সৌভাগ্যের ডালি একেবারে উপচে পড়ছে, তাঁর লেখনীতে আনন্দের কলতান। যাঁরা কাশ্মীরে দিলীপকুমারের ভ্রমণসঙ্গী, তাঁদের মধ্যে উমা বসু তো ছিলেনই, তাঁর কণ্ঠলাবণি তখন মনে হয় বৈভবের শেষ স্তরে উত্তীর্ণ, সম্ভবত আরো ছিলেন দিলীপকুমার-ভাগিনেয়ী নৃত্যপটিয়সী এষা। 'ভূস্বর্গ চঞ্চল' জুড়ে কাশ্মীরের রূপৈশ্বর্য নিয়ে দিলীপকুমারের কলকলায়ন, পাহাড়কে দুমড়ে-মুচড়ে নিজেকে বার বার বেঁকিয়ে-চুরিয়ে সমতলে পৌঁছুবার ঝোঁকে ঝিলম নদীর অদম্য সংগীত-নৃত্য লীলা, ঝিলম নিয়ে সেই অত্যাশ্চর্য গান : 'নিঝর ধারা শিহরধারা কোন পূজারিনী আপন হারা......', ঝিলমের সততপ্রবাহের ঝংকারনিক্কণ যে-গানের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে প্রতিধ্বনিত। আমরা কল্পনা করতে পারি দিলীপকুমার নির্দেশ দিচ্ছেন, উমা বসু গাইছেন, তাঁর কণ্ঠ থেকে যেন অবিশ্বাস্য বেগবতী-রুদ্ধশ্বাস দ্রুতলয়ের জললহরী বিচ্ছুরণ, যা এখানে-ওখানে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে বলেই আরো উদ্দাম, উমা বসু যেন গান গাইছেন না, আমাদের ঝিলম নদীর থরোথরো পুলিনে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন, আমরা আতঙ্কে-আনন্দে কাঁপছি। আমরা অভিজ্ঞতার অনেকগুলি ধাপে এক সঙ্গে আছড়ে পড়ছি, ছন্দের মূর্ছনার সঙ্গে জলের প্রপাত ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, ফের ঘনবদ্ধ হচ্ছে, ফের ভাঙছে, ফের ফুঁসছে, হঠাৎ কখন শান্ত হয়ে যাচ্ছে, উমা বসু গাইছেন। তিনি নিজেই যেন ঝিলম নদী, পাশাপাশি, আসরের ভিড়ে জায়গা করে নিয়ে,

এষা নৃত্যের বিভঙ্গে ঝিলমকে তরঙ্গায়িত করছেন, দিলীপকুমারের আনন স্মিত হাসিতে বিকিরিত। বাংলা গানের পরিবহে ঝিলমের মূর্ছনার অনুপ্রবেশ এক ঐতিহাসিক ঘটনাসম্পাত। তবে এই বিরাট ঘটনার চরিত্রপ্রকৃতি অনুধাবন করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন বিদগ্ধজন তখনও আশে-পাশে ছিলেন না, পরেও তাঁদের দেখা মেলেনি।

তা হলেও দিলীপকুমারের পরীক্ষার খামতি নেই। 'ভারতবর্ষে' না 'বিচিত্রা'য় মনে নেই এখন, 'নিঝরধারা শিহরধারা'র স্বরলিপি প্রকাশিত হলো, আমাদের উত্তেজনা আকাশকে ছুঁয়ে এলো। কাছাকাছি সময়ে, বাজারে উমা বসুর গাওয়া রেকর্ড বেরোবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে, আরো স্বরলিপি, 'নীলপরী' কিংবা 'বুলবুল মন ভুল সুরে ভেসে চল্ নীল মঞ্জিল উদ্দেশে'। ধুলো ঝেড়ে উমা বসুর রেকর্ডগুলি উদ্ধার করে বহু বছর ঐ গানগুলি আর শোনা হয়নি, তবু একটি-দুটি শব্দের বাঁধুনী এখনো স্মৃতিকে প্রহার করে, 'অম্বর বাঁশরী ঐ ডাকে আয় পিঞ্জর পাশরি চল্ অধরায়,' তার পর হঠাৎ সেই : হৃদয়-খোঁড়া আকৃতি : 'এ ধরায় দে বিদায়, অধরায় প্রাণ চায়...'

আমি তো ইতিমধ্যে প্রায় তারুণ্যে পৌঁছে গেছি, দিলীপকুমার রায়ের ঘোর কাটিয়ে অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে ক্রমশ আমার আগ্রহ বর্ধমান, অথচ 'ভূস্বর্গ-চঞ্চল' গ্রন্থের উপসংহারপর্বের উল্লেখ এড়াই কী করে? এবার কাশ্মীর ছেড়ে অন্য ভূস্বর্গে, শিলং পাহাড়ে, উমা বসুদের বাড়ির সবাইর সঙ্গে দিলীপকুমার। আশুতোষ কলেজের উত্তর দিক ঘেঁষে যে-রাস্তা, বসন্ত বসু স্ট্রীট, যাঁকে চিরস্মরণীয় করবার লক্ষ্যে রাস্তাটির নামকরণ, সেই বসন্তকুমার বসু, এই শতাব্দীর প্রথম দশকগুলিতে কলকাতা হাইকোর্টের রাশভারি অ্যাডভোকেট, একদা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, তাঁর পুত্র ধরণীকুমার বসু, কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, মজলিশি সংস্কৃতিবান পুরুষ, তাঁর তনয়া উমা বসু। এই পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন দিলীপকুমার, আঘাতে-প্রত্যাঘাতে উমা বসুর কণ্ঠনালী দীর্ণবিদীর্ণ হচ্ছে, কিন্তু দিলীপকুমার সংবৃত হতে সম্মত নন, সংগীত ঠিক যেমন হওয়া উচিত, যে-রূপকল্প তাঁর মানসপটে, উমা বসুর কণ্ঠে তার সম্পূর্ণতা ক্রমশ ধরা পড়ছে। এই মাহেন্দ্র যোগাযোগের সুযোগ হেলায় হারাতে নেই, সুতরাং পণ্ডিচেরী-থেকে-ছুটে-আসা দিলীপকুমার বসু পরিবারের সঙ্গে অহোরাত্র সংযুক্ত হয়ে রইলেন, উমা বসুর কণ্ঠকে ক্লান্তিহীন শ্রান্তিহীন অনুশীলন তথা অনুশাসনের জাদুবলয়, গানের পর গানের অবিরাম নিঃসরণ। ধরণীকুমার বসুপরিবার দল বেঁধে ছুটি কাটাতে শিলংমুখো, দিলীপকুমার সঙ্গী। 'ভূস্বর্গ-চঞ্চলে'র এই পর্বের উপসংহার শোকান্তিক, শিলং-গৌহাটির পাহাড়ি পথে কঠিন বাঁক নিতে গিয়ে মোটর গাড়ির বেসামাল হয়ে খাদে গড়িয়ে পড়া, প্রায় সবাই-ই কম বেশি আহত, কিন্তু সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত উমা বসুর পিতা ধরণীকুমার বসু, বুকে-পিঠে-মাথায় হাড় চূর্ণবিচূর্ণ, দিলীপকুমারের দিকে তাকিয়ে ধরণীকুমারের অসহায় শেষোক্তি, 'Dilip, I am undone'। দু'দিন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ, ধরণীকুমারের প্রয়াণ। দিলীপকুমারের 'ভূস্বর্গ-চঞ্চল' হঠাৎ বেদনায় বিশীর্ণ, ঐ অন্তিম মুহূর্তে নিজের অবস্থা বোঝাতে যে-বিশেষ শব্দটি উমা বসুর জনক ব্যবহার করেছিলেন, ঈষৎ সাধারণের বাইরে সেই 'undone'-এর প্রয়োগ নিয়ে বহুকাল আমি ভেবেছি।

'ভূস্বর্গ-চঞ্চল'-এর অবসান। আমার পক্ষেও এক যুগান্ত। কারণ এই পর্বে আমি দিলীপকুমারের সমসাময়িকতায় পৌঁছে গেছি, চল্লিশের দশকের উত্তাল সময়, দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-দেশভাগ, পৃথিবীর সঙ্গে আমার ক্রমশ পরিচয় নিবিড় হওয়া, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রায় শেষ, বর্বর নাৎসীদের ঠেকাতে সোভিয়েট দেশের বীর মানুষদের কাহিনী মানুষের মুখে-মুখে। চীনে মহাবিপ্লবের পূর্ব-সংকেত, বাংলাদেশের মফস্বলেও যার ইঙ্গিত কী করে যেন ছুঁয়ে যাচ্ছে। আমার যৌবন আমাকে হাতছানি দিচ্ছে, বাঁধানো বাংলা মাসিক পত্রিকার কবর খুঁড়ে দেশের-জাতির-পৃথিবীর ইতিহাসে ঋদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন আমার ফুরিয়ে গেছে, সহস্র-অজস্র বিভিন্ন বহু আবেগ, বহু আগ্রহ, দিলীপকুমার আমার মানসলোক থেকে পুরোপুরি মিলিয়ে গেলেন।

এখানেও হয়তো একটু বাগাড়ম্বরের আশ্রয় নিচ্ছি। কারণ একদিকে যেমন দিলীপকুমারের রচনাদির গুরুচণ্ডালী ঢঙ, শ্রীঅরবিন্দর আড়ষ্ট-কিম্ভূত ইংরেজিতে-নিবদ্ধ তথাকথিত কাব্যমালার দিলীপকুমার-কৃত আড়ষ্টতর বঙ্গানুবাদ, তাঁর সখাসখীশিষ্য-শিষ্যাপরিবৃত জীবনবিহার, তাঁর মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তির পুরোপুরি শ্মশ্রু-ও নামাবলী-ছাওয়া আলখাল্লার আড়ালে হারিয়ে যাওয়া, বন্ধু সুভাষকে নিয়ে তাঁর শ্লোকোচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি, সাম্যবাদী আদর্শের এদেশে-ওদেশে বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর শুচিবায়ুগ্রস্ত সন্দেহবোধ, (এ সময়েই কি, না কি আরো পরে, এটা জেনে একটু চমৎকৃত, সেই সঙ্গে একটু বিষণ্ণও হয়তো, দিলীপকুমারের অনুরক্ত, বিকল্পে দিলীপকুমার যাঁর প্রতি অনুরক্ত, সেই 'কৃষ্ণপ্রেম' ভদ্রলোক আমাদের ধ্যানজ্ঞানের আরাধ্য কমিউনিস্ট অর্থনীতিবিদ মরিস ডব-এর অতিঘনিষ্ঠ আত্মীয়), এ সমস্তই ক্রমশ আমার জীবনজিজ্ঞাসার প্রসঙ্গে আগাপাশতলা প্রক্ষিপ্ত, অন্যদিকে তখনো কিন্তু উমা বসুর গানের ধারায় মোহাচ্ছন্ন থাকছি, তাঁর গানের আটাত্তর গতির রেকর্ড হিজ মাস্টার্স ভয়েস কর্তৃপক্ষ একটির পর একটি বাজারে ছাড়ছেন, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা শুনবো, 'রূপেবর্ণে গন্ধে আলোকে আনন্দে মূরতি স্বপন মাখা, আকাশে হাসে রাকা,' নাকি 'মধু মুরলী বাজে' অথবা 'মুরলীওয়ালে নন্দদুলালে,' দিলীপকুমারকে ছাপিয়েই যেন উমা বসু, অথচ এতটা ব্রাত্য হইনি যে ভুলে থাকবো যে দিলীপকুমারকে বাদ দিয়ে অসম্ভব ছিল উমা-হাসি-বসুর সংগীত সৃষ্টি, যা শ্রবণের প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের স্বর্গবিহারের সৌভাগ্যে উত্তীর্ণ করতো।

এর কয়েক বছরের মধ্যেই উমা বসুর ক্ষয় রোগে মৃত্যু, তিনি যথার্থই গান গেয়ে-গেয়ে ক্ষয়ে গেলেন, দিলীপকুমারের কঠিন অনুশাসনের পীড়নেই সম্ভবত তাঁর কণ্ঠ দীর্ণ-বিদীর্ণ, গানের ঐশ্বরিক মাহাত্ম্যের কাছে মহিলার জীবনবিসর্জন। দিলীপকুমারের গানের মাধ্যাকর্ষণের শিকার না হলে আরো অনেকটা বছর বাঁচতেন হয়তো বা, আমাদের খানিকটা বিষণ্ণতাবোধ, কিন্তু ইতিমধ্যে দেশ জুড়ে, সারা পৃথিবী জুড়ে, হতচকিত করার মতো অনেক-কিছু ঘটছে, দুর্ভিক্ষ-গৃহযুদ্ধ-দেশভাগ, পূর্ব ইওরোপ ও গোটা উত্তর এশিয়া জুড়ে সাম্যবাদের বিজয়দুন্দুভি, ইন্দোনেশিয়া-কাম্বোজ-হিন্দুচীন-মালয় দেশ ব্যেপে বিপ্লবের পূর্বলক্ষণ, আমরা ব্যস্ত, আমরা ত্রস্ত, আমরা সময়হীনতার আবর্তে নিপতিত, দিলীপকুমারের যুগান্ত। পরের দুই দশকে টুকরো-টুকরো খবরের কানে এসে

পৌঁছনো, কখন কী কারণে তিনি পণ্ডিচেরি আশ্রম ছাড়লেন তা নিয়ে জল্পনাগুজব। পুণা শহরের উপকণ্ঠে তাঁর নতুন আশ্রম, নবতর শিষ্যশিষ্যার সম্ভার, তাঁর গেরুয়ার রঙ গাঢ়তর, এখানে-ওখানে তাঁর লম্বা-লম্বা বাংলা লেখা চোখে পড়ে, একটু-আধটু পড়বার চেষ্টা করেও এগোতে পারি না, হয়-চর্বিত চর্বণ নয়তো কোনো উদ্ভট-উৎকট চিন্তাবিন্যাস যা আমার অধৈর্যহেতু মাঝে-মাঝে ন্যাকামি বলে ঠাহর হয়, আমার জীবন থেকে দিলীপকুমার সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট হয়ে গেলেন। বাঙালি সমাজেও তাঁকে নিয়ে, তাঁকে জুড়ে আলোচনা দ্রুত নিঃশেষ। ষাটের দশকে চীন কিংবা পাকিস্তানকে যুদ্ধে ধোলাই দেওয়ার পরমোৎসাহে, দিলীপকুমার কর্তৃক গীত তাঁর পিতৃদেবের 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে' গানটি 'আকাশবাণী' মারফৎ না শুনে অবশ্য উপায় ছিল না, 'অরাতিরক্তে করিব স্নান' বিশেষ করে এই বিঘোষণা প্রায় অশ্লীল বলে মনে হতো তখন। সৌভাগ্যের কথা, সেই ঋতু অতি ক্ষণস্থায়ী ছিল।

দিলীপকুমারের সঙ্গে আমার একবারই সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেছিল। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত। দ্বিজেন মৈত্র মশাইর বাড়ির তেতলায়, হঠাৎ প্রায় ঝড়ের মতো, দিলীপকুমারের প্রবেশ, ঘোর রক্তবর্ণ নামাবলী-কণ্টকিত গাত্রাভরণ, সঙ্গে এক শিষ্য ও এক শিষ্যা, শিষ্য ভদ্রলোকের পূর্বাশ্রম পরিচয় অ্যাডমিরাল ইন্দ্রদেব কিংবা ঐ ধরনের কিছু, মহিলাটির পরিচয় এখন আর মনে নেই। দিলীপকুমার কানে আদৌ কিছু শুনতে না-পারার স্তরে পৌঁছে গেছেন। তাঁর শিষ্য-শিষ্যা-পরিবৃত আবির্ভাব কেমন যেন খাপছাড়া হাওয়ার অনুপ্রবেশের মতো। অথচ অস্বীকার করতে পারি না তাঁর কথায়-আলাপে-আকৃতিতে ধূর্জটিপ্রসাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা-অনুরাগ চুঁইয়ে পড়ছিল, সেই ধূর্জটিপ্রসাদ যাঁর সঙ্গে সংগীত অধ্যাত্মবিশ্বাস তথা জীবনদর্শন নিয়ে আজীবন তর্ক করে গেছেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ প্রয়াত হলেন, দিলীপকুমার নিজে প্রয়াত হলেন আরো বেশ কিছু বছর গড়িয়ে গেলে। আমি ব্যস্ত, খবরটি আমাকে মুহ্যমান করলো না, ফিরিয়ে নিয়ে গেল না শৈশবের-কৈশোরের-প্রথম যৌবনের শিহরিত স্মৃতিতে। আমি তো একা নই, বাঙালি সমাজে ক'জন আর দিলীপকুমারের কথা মনে রেখেছেন, এমন কি তাঁর গানের অনুরাগাসক্ত আর ক'জন অবশিষ্ট আছেন? আপাতত সমাজব্যবস্থা ঘূর্ণাচক্রে বিপর্যস্ত, আমরা কী ছিলাম, কী হলাম, কী হতে যাচ্ছি, তা নিয়ে চিন্তা করবার ইচ্ছাও নেই, চিন্তান্বিত হবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছি, তাই নিছক দিলীপকুমার রায়কে নিয়ে ভাবিত হবার প্রস্তাব অনেকের কাছেই অকারণ, এবং পরিত্যজ্য, বিলাসিতা বলে বিবেচিত হবে। এই অবস্থায় মনে হয় রবীন্দ্রনাথের উপদেশই যথাযথ : ফুরায় যা দেরে ফুরাতে।

তবু স্বগত একটি প্রশ্নের যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি নেই। দিলীপকুমারের মতো প্রতিভা গণ্ডায়-গণ্ডায় তো কোনো সমাজেই জন্মগ্রহণ করেন না, তিনি কী বলতে চেয়েছিলেন আমাদের, কী দিতে চেয়েছিলেন, না কি তিনি নিজেই জানতেন না সারা বেলা একি খেলা আপন মনে? তাঁর প্রেমের সঙ্গে কি এক নিগূঢ় অভিমানেরও আরক ছিল, যা তাঁকে গার্হস্থ্য থেকে সন্ন্যাসে চালিত করেছে; কিন্তু খানিক-খানিক বাদে সন্ন্যাস থেকে

ছুটে এসে, থিয়েটার রোডে মামাবাড়ির গৃহী পরিবেশের আশ্রয়ে, অন্যতর অন্বেষণেও প্রেরণা জুগিয়েছে? তাঁর ইওরোপীয় ও ভারতীয় মার্গ সংগীতোপলব্ধির তুলনা নেই, যা আপাতঅধরা সেই সৌন্দর্য তো তাঁর কাছে স্বেচ্ছাবন্দী ছিল, তবু কেন তাঁর বিহার থেকে বিহারান্তরে প্রব্রজ্যা, কী পেয়েছিলেন তিনি শ্রীঅরবিন্দের নিরেট-নিকষ দর্শন চর্চা থেকে, যা পেয়েছিলেন তা কি তাঁর নিজের কাছেই পরবর্তী অধ্যায়ে তুচ্ছ-যৎসামান্য বলে প্রতিভাত হয়েছিল, তাই তাঁর পণ্ডিচেরী ছেড়ে চলে যাওয়া? জীবনে তিনি প্রচুর ভালোবাসা অকৃপণ হস্তে বিলিয়েছেন, অথচ লোকপ্রবাদের যদি কোনো ভিত্তি থেকে থাকে, নির্দয়তার সঙ্গে ফিরিয়েও দিয়েছেন অনেককে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে জড়িয়ে আমার যে-প্রশ্নাবলী তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি দিলীপকুমারের কোনো গানের চরণে আশ্রয় নেবো না, ফিরে যাবো রবীন্দ্রনাথেরই বহুবিখ্যাত একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তিতে : 'মন-দেয়া-নেয়া অনেক করেছি মরেছি হাজার মরণে; নূপুরের মতো বেজেছি চরণে চরণে'।

কিন্তু কেন? প্রশ্নাবলী অতএব প্রশ্নাবলীই থেকে যায়। দিলীপকুমারের কোনো-এক রচনায়, ধূ ধূ মনে পড়ে, একটি সংযোজিত মন্তব্য সেই বালকবয়সে আমাকে চমৎকৃত করেছিল। দুই কবি না কি ঔপন্যাসিকের—ঠিক মনে নেই এখন—, রচনা-উৎকর্ষের তুলনা-প্রতিতুলনা : একজনের লেখা পড়লে মনে যে-অনুভূতি জাগে তার বহিঃপ্রকাশ 'বাঃ' উচ্চারণে, আর অন্যজনের লেখা পড়লে যে-ভাব উথলে ওঠে তার যথাযথ অভিব্যক্তি 'আহা' শব্দ প্রয়োগে। তাঁর জন্মের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তাঁর সমগ্র সৃষ্টি-কর্ম-প্রব্রজ্যা-বিহার-বিচরণের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হঠাৎ আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত : তাঁর পুরোটা জীবনই এই 'বাঃ' ও 'আহা'-র অতি অন্যমনস্ক, অতি অবহেলার সংশ্লেষণ।

Dilip Kumar Roy

Phone 57387
HARI KRISHNA MAND
INDIRA NILOY
POONA 411016

৺ বিজয়াদশমী

আশীর্বাদ

কণ্ঠের ঝঙ্কারে বাজে মনের প্রাণের কলতান,
সৌন্দর্যলহরী-ঢেউ তোলে সে রাগিণী-আলাপনে
জীবনহাটের ধূলিধূম-রসহীন অভিযান
ক্ষণিক ধ্যানে রূপান্তর যাকিছু বেদনাকাঁটাবনে
যে দুঃখ মর্মরে তোলে শান্ত সংসারের গ্লানি;
সে-আনন্দ নয় মূল্যহীন। তবু নয় সে কাঞ্চন,
যার সুরবিন্যাসে ফোটে অপরূপী অমৃতে
প্রতিভার অপার্থিব বৈকুণ্ঠের আরতি তান।

এই প্রশান্তির সুর গানে তুমি করেছ বরণ
তোমার মধুর অনুশীলনে, মাধুরী, প্রতি দিনে
সুরেলা সাধনে চেয়ে নির্ঝরিতে শাশ্বত বন্দন,
অশ্রান্ত আঁধার কাব্য চিরসুন্দরের জয়গানে।
কামনা তোমার হোক সুফলা — বলি এ-আশীর্বাদ
শ্রীকান্তের বাণী বহি' বিলাও ধরায় সুপ্রসাদ।

১.১০.১৯৭৯ নিত্যাশীর্বাদ দিলীপদাদা (দিলীপকুমার রায়)

দিলীপকুমার রায়ের পাণ্ডুলিপি

দিলীপকুমার রায়

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্যারিসের একোল নরমাল সুপিরয়র যেমন ইউরোপে সম্মানিত, কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজও ভারতীয় উপমহাদেশে তেমনই সমাদৃত। সুদীর্ঘ পরম্পরায় এই কলেজ তার এক প্রাক্তন ছাত্রকে স্মরণ করে—তিনি দিলীপকুমার রায়। প্রধানত কবি ও সুরকার হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি রসায়ন ও গণিতশাস্ত্রে নিজের দক্ষতার পরিচয় দেন। এক বিখ্যাত বাঙালী কবি, নাট্যকার ও সুরকারের সন্তান হিসেবে দিলীপকুমার আশৈশব তাঁর পারিবারিক ধারার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন এবং নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে বিভিন্ন জনপ্রিয় ও মার্গসংগীতের সুর সংগ্রহ করেন। কৈশোরে তিন বছরের জন্য ইউরোপ যাত্রা করার অল্প কিছুদিন আগে তিনি পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের সংস্পর্শে আসেন, এবং সংগীতকেই বৃত্তি হিসেবে নেবার সিদ্ধান্ত নেন। অতএব, কেম্ব্রিজে দক্ষ গণিতজ্ঞ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি 'ছিটেফোঁটা ইউরোপীয় সংগীত' প্রশিক্ষণ করে ও ইউরোপ ভালোভাবে ঘুরে দেখে এই সংগীতের মূল ঐতিহ্য আবিষ্কার করতে মনস্থির করেন। এই অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি আয়োনিয়ান, লিডিয়ান, মিক্সোলিডিয়ান, ডোরিয়ান, এয়োলিয়ান এবং ফ্রিজিয়ান প্রমুখ প্রাচীন ধারাগুলির সঙ্গে যথাক্রমে ভারতীয় মার্গসংগীতের বিলাবল, ইমন, খাম্বাজ, কাফী, আশাবরী ও ভৈরবী ঠাটের মিল পান।

রোমা রঁল্যা তাঁর দিনলিপিতে দিলীপকুমারের উল্লেখ মোটামুটি সবিস্তারে করেন ডজনখানেক বার। তার কয়েকটার না হয় অনুবাদ করি এখানে। যেমন, ২৩শে অগস্ট ১৯২০ সালে দিলীপকুমারের প্রথম ইউরোপ ভ্রমণের কথা : '.... তিনি খুব সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির ব্যক্তি নন...... লম্বা, সুগঠিত যুবক.....গায়ের রং ক্রিয়োলদের (পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বসবাসকারী মিশ্র ব্যক্তি) মত কমলাটে বাদামি, চোখা নাক মুখ'.... তাঁর গানের সম্বন্ধে রল্যাঁ উল্লেখ করেন, বিশেষত তানসেনের এক ভক্তিগীতি ... ষোড়শ শতকের পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরির সংগীতের সঙ্গে যেন আমি এর কিছু মিল পাই ; আরো পাই সেই গ্রীক ধর্মসংগীতের সঙ্গে যা কিনা এরও মূলে ছিল ....'। রঁল্যা আরো বলেন, 'জনপ্রিয় সুরগুলি শুনলে যে কেউ হিন্দুজাতির নির্মল ও স্বাভাবিক প্রতিভার কথা বুঝতে পারবে। দিলীপকুমার এমন কিছু গান করেন, যা হৃদয়গ্রাহী, সূক্ষ্ম, আনন্দময়, কাব্যময়, এবং সুনিপুণভাবে ছন্দোবদ্ধ—যা কিনা আমাদের দেশেরও জনপ্রিয় গান হতে পারে.... একথা বোঝা যায় যে জনপ্রিয় শিল্প উচ্চমার্গের শিল্পের চেয়ে কম গণ্ডীবদ্ধ।' এবং দিলীপকুমারের কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে বলেন, 'ঈষৎ সানুনাসিক ভঙ্গিতে তিনি গান করেন, তাঁর গলা বেশ চড়ায় ওঠে এবং অবলীলাক্রমে তিনি অনবরত অলঙ্কার ও বিস্তার পরিবেশন করেন।'

২৪শে অক্টোবর ১৯২৭ সালের আরেক সাক্ষাতের কথাও লেখেন রঁল্যা : 'তিনি অভিজাত ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ধরণের ব্যক্তি'। একটি প্রাচীন ভারতীয় শ্যামাসংগীত শুনে তিনি বলেন : 'এক কথায় মনোমুগ্ধকর—একটি আবেগের স্রোত, যার মধ্যে আছে অনুনয়, বিলাপ, উচ্ছ্বাস, যা উচ্চতম স্বর ছুঁয়ে আবার খাদে নেমে আসে, এবং আবার শুরু হয় দ্বিগুণ উল্লাসে......'

ইউরোপে থাকাকালীন দিলীপকুমার বোঝেন তাঁর সমসাময়িক ভারতীয় মার্গসংগীতজ্ঞদের চর্চা করা সংগীত মহত্ত্ব ও দীনতাগুলি। দিলীপকুমারের বিশ্বাস ছিল যে সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত ভারতীয় ভাষাগুলিতে প্রচলিত উচ্চমানের সুরে মধ্য মানের কথার বিকল্প রচিত হতে পারে (যা তাঁর নিজের পিতা এবং রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন)। দিলীপকুমার জানতেন দুটি ইউরোপীয় ভাষা এবং সংস্কৃত ছাড়াও আরো গোটা ছয়েক ভারতীয় ভাষা এবং এই সব ভাষাতেই তিনি খুব মৌলিক গান রচনা করেন। অতএব তাঁকে মধ্যপথ অবলম্বন করতে হয় : অপূর্ব সুরের সঙ্গে আবোলতাবোল কথা জুড়ে দেওয়া বাদ, অসাধারণ কবিতার সঙ্গে চলনসই সুর বাদ। যেমন দেখা যায় গ্রামীণ চারণ কবির চিরাচরিত মহাভারতপাঠে—

সা সা সা রা	গা গা গা মা	রা রা গা সা	রা...
ম হা ভা র	তে র ক থা	অ মৃ ত স	মা...ন
পা পা পা	মা পা গা গা	রা গা সা রা	রা . . .
কা শী রা ম	দা স ক হে	শু নে পু ণ্য	বা. . ন

ভারতবর্ষে ফিরে দিলীপকুমার পণ্ডিত ভাতখণ্ডের সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁর পন্থা অবলম্বন করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে আঞ্চলিক সংগীতবিশারদদের কাছ থেকে রাগের ভিন্ন ভিন্ন রূপ এবং গানের সুর সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করেন। হয়ত ভারতে আর কেউ এত সংখ্যক ও এত নিখুঁত স্বরলিপি রেখে যাননি। ভাতখণ্ডে এবং তাঁর শিষ্য রতনজনকরের মত দিলীপকুমারও লেখা এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা দেখান যে সংগীতও পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে শেখান সম্ভব, এবং গুরুশিষ্যপরম্পরার গোপনীয়তা একান্তই নিষ্প্রয়োজন। স্পষ্টভাষী সংগীত সমালোচক হিসেবে তিনি যথেষ্ট নাম করেন, বিশেষত তথাকথিত অলঙ্ঘনীয় গুরুদের দুঃসাহসিক সমালোচনা করে।

প্রাচীন ভারতীয় সংগীত ছিল জার্মানীর লীডার গানের মত—নবম শতাব্দীর চর্যাপদের মাধ্যমে এই ঐতিহ্য গানের মধ্যে তালকে প্রবেশাধিকার ও প্রশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুহাজারেরও বেশী গানকে ইউরোপীয় সংগীতের মত স্বাতন্ত্র্য দিতে চেয়েছিলেন, এবং স্বরলিপির মাধ্যমে এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছিলেন। একথা সকলেই জানেন যে তাল হল পাশ্চাত্য সংগীতের ক্যাডেন্জার মত বিভিন্ন স্বরের এক আবর্ত, যা গানের কোন বিশেষ কথার তাৎপর্য ফুটিয়ে তোলে। এক অতুলনীয় সংগীতজ্ঞ হিসেবে দিলীপকুমার রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অনুমতি সংগ্রহ করেন রবীন্দ্রসংগীতে স্বাধীনভাবে তান প্রয়োগ করার, যে অধিকার কিনা একমাত্র তিনিই পান।*

* এই তথ্য অবশ্য ভুল।—সম্পাদক।

দিলীপকুমারের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানগুলির মধ্যে পড়ে তাঁর রচনা করা একধরণের ভারতীয় অপেরা, যার ভিত্তি সনাতনী কীর্তনে। এতে এক ধরণের ভাবাবেগের অবসান ঘটে কিছু গঠনগত এবং ছান্দিকসূত্র ধরে, যা ভারতীয় ধ্রূপদী নৃত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে। এই পরীক্ষামূলক আঙ্গিকেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন, কিন্তু এর এখনো অনেক সম্ভাবনা রয়েছে।

কণ্ঠস্বরের বলিষ্ঠতা, মাধুর্য এবং ব্যাপ্তির জন্য জনপ্রিয় দিলীপকুমার শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধিজীর মত লোকের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। ১৯৪০-এর দশকে একটি হিন্দি সিনেমা দেশ ভাসিয়ে দিয়েছিল মধ্যযুগীয় ভক্তরাজকুমারী মীরাবাঈ-এর গান দিয়ে। স্বর্ণকণ্ঠী এম. এস. শুভলক্ষ্মীর গাওয়া হলেও সেগুলি সংগ্রহ বা সুর দান করেছিলেন দিলীপকুমার। তাঁর গুরুদেবকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে শুভলক্ষ্মী লিখেছেন যে দিলীপকুমার যখন 'গান করেন.... তা হল এক স্বতন্ত্র আত্মার আবেদন বিশ্ব আত্মায় বিলীন হবার জন্য।'

কলকাতার সংস্কৃত আকাদেমী দ্বারা সুরসুধাকর আখ্যায় ভূষিত দিলীপকুমার Indian State Academy of Fine Arts এর সদস্য নির্বাচিত হন। অর্ধশতাধিক রেকর্ড (যার বেশ কিছু HMV এখনো পুনর্মুদ্রণ করছে), আট খণ্ড স্বরলিপিসহ গান, ২২টি ইংরাজি ও ৪৬টি বাংলা উপন্যাস, কবিতা, নাটক, স্মৃতিচারণ ও প্রবন্ধ তিনি রেখে গেছেন। দিলীপকুমার ছিলেন এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব—সহাস্য, সস্নেহ, নিজের জ্ঞানভাণ্ডার ভাগ করে নিতে আগ্রহী সবার সঙ্গে। বারো বছর বয়সে যখন ছাত্র হিসেবে তাঁর কাছে গেছিলাম, তখন পুরোন এক প্রবাদ মনে হয়েছিল : 'ফলের ভারে গাছ যতই ভারাক্রান্ত হয়, ডালগুলো ততই নাগালের মধ্যে নুয়ে পড়ে।' তাঁর যৌবনের চমক লাগানো তানের মধ্যে কোথায় যেন শিল্পী ভ্যান গগের প্রাণোচ্ছলতার আভাস পাওয়া যায়। যখন দিলীপকুমারের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, তখন এগুলি অধিকাংশই বিলীন হয়ে যায় শিল্পীর আধ্যাত্মিক সুরসাধনার গভীরতর তানে।

ছান্দসিক দিলীপকুমার রায়

নীলরতন সেন

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বনামখ্যাত পুত্র দিলীপকুমার রায় সাধারণ্যে সুপরিচিত হয়েছিলেন গায়ক ও কথাসাহিত্যিক হিসাবে। তারপর যখন সংসারধর্ম না করে, সর্বপ্রকার বিলাসিতা বিসর্জন দিয়ে শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যরূপে আশ্রমবাসী হলেন, তখন থেকে তাঁর মুখ্য পরিচয় হয়ে উঠল, ভক্ত সাধক রূপে। তবে লক্ষ করবার বিষয়, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সাহিত্য ও সংগীত চর্চাকে তাঁর প্রতিদিনের জীবনচর্চায় সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছিলেন। সাহিত্য ও সংগীত সাধনাকে তিনি ধর্মসাধনারই অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন।

দিলীপকুমারের কবি ও গায়ক সত্তা তাঁকে কবিতা ও গানের গঠনরূপের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আর তারই ফলস্বরূপ অসংখ্য গল্প উপন্যাস, রমন্যাস, অলৌকিক ধর্মীয় কাহিনী, ভ্রমণকথা, প্রবন্ধ, গান ইত্যাদির রচনার পাশাপাশি গান ও কবিতার গঠনরূপ সম্পর্কিত দুটি অসামান্য গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। আমি তাঁর সুলিখিত সাঙ্গীতিকী এবং ছান্দসিকী বই দুটির কথা উল্লেখ করছি। সংগীত এবং কবিতার ছন্দ-ব্যাকরণকে যে কতটা প্রাঞ্জলভাবে জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে পরিবেশন করা সম্ভব দিলীপকুমার আলোচ্য গ্রন্থদুটি মাধ্যমে তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন রেখে গেছেন। এ আলোচনায় আমি কেবলমাত্র তাঁর কাব্যছন্দ-বিষয়ক চিন্তাধারার প্রসঙ্গটি সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।

দিলীপকুমারকে ঠিক বহুভাষাবিদ বলা চলে কিনা জানিনা তবে বাংলা ছাড়াও সংস্কৃত, ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান এবং হিন্দী ভাষাতেও যে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল সে বিষয়ে আমি নিঃসংশয়। ছেলেবেলা থেকেই সংগীতের ও কবিতার তাল সম্পর্কে তাঁর কান বেশ প্রখর ছিল। তাছাড়া স্তোত্রজাতীয় সংস্কৃত শ্লোকগুলির ছন্দরূপও তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে তিনি ইংরেজি ছন্দের পাঠ নিতে থাকেন। সেই সঙ্গে সংস্কৃত এবং ফরাসী ছন্দও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। তার আগে থেকেই তিনি বাংলা কবিতা গান লিখতেন এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য পাঠাতেন। ১৯৩০-এ একবার রবীন্দ্রনাথ তাঁর একগুচ্ছ কবিতা দেখে ফেরৎ পাঠাতে গিয়ে লিখলেন,

> তারপর তোমার কবিতার কথা বলি। পরিমাণ দেখে ভয় পেয়েছিলাম। ইতিপূর্বে পদ্যজাতীয় তোমার অনেক লেখাই দেখেচি। বারবার মনে হয়েছে বঙ্গবাণীর মধুকোষের পথ তুমি পাওনি, তুমি ছন্দে পঙ্গু। তা নিয়ে মাঝে মাঝে আমি বিচার করেছি, সেটা নিশ্চয় শ্রুতিসুখকর হয়নি। অপ্রিয় কথা বলবার অপ্রিয় দায় তুমি আমার উপর আবার চাপাতে এসেচ মনে ক'রে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলুম।

কিন্তু এ কি ব্যাপার হে? হঠাৎ ছন্দ পেলে কোথা থেকে? গুরুমশায়গিরি করবার জো রাখনি। অকস্মাৎ তোমার কান তৈরী হয়ে গেল কি উপায়ে? আর তো তোমার ভয় নেই। কিন্তু কাব্য রচনায় খোঁড়া কি করে লাঠি ফেলে দিয়ে খাড়া হয়ে উঠে দৌড়ে চলে তার রহস্য আমি বুঝতে পারছিনে। এক একবার ভাবি তুমি আর কারোর কাছ থেকে লিখিয়ে নাওনি তো? সরস্বতী যখন তোমার কণ্ঠে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছেন, তখন নবজাগ্রত ভাষায় তোমার যা কিছু বলবার নিজের জবানিতেই বলে যেয়ো।

[দেশ: সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৮৩, পৃ ২৭-২৮]

মাসখানেক বাদে আর একটি চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথ প্রায় একই কথা লিখেছিলেন।

দিলীপকুমার এই সময় ছন্দের যথার্থ পাঠ কিভাবে কার কাছে থেকে পেয়েছিলেন, সেটাও তার নিজের জবানীতেই শোনা যেতে পারে।—

ইংরেজী ছন্দ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের যে ধরণের গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম শ্রুতিবোধ আমাকে অভিভূত করেছিল বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে সে রকম জ্ঞান ও শ্রুতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ছিল মানি, কিন্তু হলে হবে কি, বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে নানা পত্রালাপে অনেক কিছু লাভ করলেও বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর নানা মতামতেই ঠিক সেই ধরণের সূক্ষ্ম 'বৈজ্ঞানিক' বিশ্লেষণ পাইনি যা পেয়েছিলাম শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে ইংরেজী ছন্দদীক্ষায়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল প্রমুখ কবি ও ছান্দসিকদের আলোচনায়ও আমার মন বলে উঠেনি: 'Eureka ! পেয়েছি যা এতদিন ধরে খুঁজছি'। পেলাম সর্বপ্রথম শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের প্রবাসীতে লেখা নানা নিবন্ধে।[১]

[ছান্দসিকী, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা-পত্র]

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, দিলীপকুমারের কাব্যচর্চা এবং ছন্দচর্চার এই প্রথম পর্বেই বিচিত্রা, পরিচয়, উদয়ন প্রভৃতি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে মধ্যমণি করে প্রবোধচন্দ্র, অমূল্যধন, শৈলেন্দ্রকুমার প্রভৃতি তরুণ ছান্দসিকদের ছন্দবিতর্ক সুরু হয়েছিল। তখন তিন বছরের মধ্যেই (১৩৩৮ অগ্রহায়ণ থেকে ১৩৪১ অগ্রহায়ণ) রবীন্দ্রনাথ পরপর নয়টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সে সব প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন মুখ্যত তরুণ ছন্দজিজ্ঞাসুদের নানা প্রশ্নের জবাব দিতে। এই প্রশ্নকর্তাদের অন্যতম প্রধান ছিলেন দিলীপকুমার। তিনি রবীন্দ্র-কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের হসন্তর উচ্চারণের মাত্রা নির্ধারিণ বিষয়ে প্রশ্ন করেন এবং রবীন্দ্র-জবাবে সন্তুষ্ট না হয়ে পত্রিকা-মারফৎ ছন্দজিজ্ঞাসুদের মতামত আহ্বান করেন। কিছুদিন বাদে তিনি আবার স্বরবৃত্ত ছন্দ কবি যে ভাবে তিনমাত্রার চালে বিশ্লেষণ করতে চান তার যৌক্তিকতা সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলেন এবং 'বাংলা ছন্দ ও প্রবোধচন্দ্র' নামে এক প্রবন্ধে (বিচিত্রা, ১৩৩৯ পৌষ) প্রবোধচন্দ্রের বাংলা ছন্দ বিশ্লেষণ-পদ্ধতিকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেন। দিলীপকুমারের মনে হয়েছিল, এ-প্রবন্ধটি লেখার ফলেই

১। প্রবাসীতে প্রবোধচন্দ্র ১৩২৯-৩০-এ বাংলা ছন্দ, ছন্দের শ্রেণীবিভাগ এবং বাংলা ছন্দ ও সংগীত নামে তিনটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি, এবং সেই সঙ্গে প্রবোধচন্দ্রের প্রতিও বেশ কিছুটা বিরূপ হয়েছিলেন। দিলীপকুমার সে সময় রবীন্দ্রনাথকে এবং প্রবোধচন্দ্রকে বাংলা ছন্দ সম্পর্কে যে এত প্রশ্ন করছিলেন তার মধ্যে মুখ্য কয়েকটি হল: গানে ব্যবহৃত কবির লঘুগুরু ছন্দ, ছন্দের দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক চাল, প্রাক্ হসন্ত স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ, অক্ষরবৃত্তে মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গিম বিশিষ্ট উচ্চারণের মিশ্রণ ইত্যাদি। দিলীপকুমার অনুভব করেছিলেন, সে সময় রবীন্দ্রনাথ-সহ যারাই বাংলা ছন্দের উচ্চরণরীতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রবোধচন্দ্রই সঠিক পথের সন্ধান দিতে পেরেছিলেন।

দিলীপকুমারের 'ছান্দসিকী' প্রকাশিত হল ১৩৪৭ বৈশাখে (১৯৪০ এপ্রিল)। সেখানে তিনি প্রবোধচন্দ্রের মাত্রা-বিশ্লেষণরীতি মেনে নিয়ে মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত এবং অক্ষরবৃত্ত—মুখ্য তিন বাংলা ছন্দরীতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। বলা যেতে পারে, বাংলা ছন্দ চর্চার ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত পূর্ণাঙ্গ ছন্দ-ব্যাকরণ রচনার এটিই প্রথম সার্থক প্রয়াস। এ গ্রন্থের 'অবতরণিকায়' তিনি ছান্দসিক কবি এবং কাব্য-রসিকদের পক্ষে ছন্দ চর্চার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করেছেন। 'অবতরণিকা'র উপসংহারে বলেছেন,

> কবি ও ছান্দসিক আসলে একই লক্ষ্য পথের যাত্রী—উভয়েই চান কাব্যরসবোধের গভীরতা, উভয়েই চান শ্রুতিসূক্ষ্মতাকে শান দিয়ে ক্ষুরধার করতে। ভুল হয় তখনই যখন ছন্দ বিচারকে আমরা মনে করি শুধু তার দেহ ব্যবচ্ছেদ। মনে রাখতে হবে ছন্দের আঙ্গিককে জানতে চাওয়ার মানে শুধু তার 'কৌশল'-এর পরিচয় পাওয়া নয়—'সৌষ্ঠব'-এরও ঔৎসুক্য রয়েছে এ-বীক্ষণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য, 'ছান্দসিকী' গ্রন্থটিতে দিলীপকুমার কেবলমাত্র নীরস 'কাব্যব্যবচ্ছেদ' করেন নি, তার সৌষ্ঠব সম্পর্কেও রসিক পাঠককে সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন, এবং সে-কাজে বহুলাংশে সফলও হয়েছেন।

দিলীপকুমার প্রথম থেকেই একজন সংগীতজ্ঞ কবি-ছান্দসিক হিসেবে কাব্যছন্দের বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছিলেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মিল ছিল। পদ্যে শব্দধ্বনির উচ্চারণে যে তাল বা ঝোঁকের পুনরাবর্তন ঘটে, নিয়মিত ধ্বনির ঢেউয়ের যে ওঠাপড়া চলে, তারই মাধ্যমে তিনি ছন্দকে উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও বাংলা শব্দ উচ্চারণে দুই এবং তিন মাত্রার চাল লক্ষ করেন এবং তাদেরই নানাবিধ গ্রন্থনায় গানের তালের মতোই কবিতাতেও বিভিন্ন পর্বের চাল (যেমন চার মাত্রায় কাওয়ালি, তিনমাত্রায় দাদ্‌রা, পাঁচমাত্রায় ঝাঁপতাল, সাতমাত্রায় তেওরা ইত্যাদি) ফুটে ওঠে বলে অভিমত প্রকাশ করেন। বাংলা পঠনভঙ্গির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল উচ্চারণের সুচনায় ঝোঁক দেওয়া; ধীরে ধীরে এই ঝোঁকের গতি স্তিমিত হয়ে আসে। সে কারণে 'যতি' বলতে তিনি 'গতির সম' বা 'ঝোঁকের উপসংহার' বুঝিয়েছেন। বাঁধা পর্যাবর্তে (cycle) একবার ঝোঁকালো চলা এবং একবার মন্থরগতি থামা, গতি ও যতি-এর মাধ্যমেই ছন্দপর্বগুলি রূপান্বিত হয়ে ওঠে। প্রবোধচন্দ্র যে যতির গুরুত্ব অনুসারে উপপর্ব, পর্ব, পদ ইত্যাদি বিভাগ করেছেন দিলীপকুমার এত সূক্ষ্ম

বিশ্লেষণের প্রয়োজন বোধ করেন নি। Syllable-কে একসময় তিনি প্রবোধচন্দ্রের তৎকালীন নির্দেশিত পরিভাষায় ধ্বনি বা স্বর এবং closed এবং open syllable -কে যথাক্রমে যুগ্ম ধ্বনি ও অযুগ্ম ধ্বনি বলতেন। ছান্দসিকীর দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৬৮) প্রবোধচন্দ্রেরই পরিবর্তিত 'দল', 'রুদ্ধদল' , 'মুক্তদল'—নামগুলি গ্রহণ করেছেন। রুদ্ধদলের বিশিষ্ট দু'মাত্রা এবং সংশ্লিষ্ট একমাত্রা উচ্চারণের বিকল্প পদ্ধতির উপরই যে বাংলা ছন্দের মূল রহস্য নিহিত রয়েছে দিলীপকুমার প্রবোধচন্দ্রের ছন্দ আলোচনা থেকেই সেটা প্রথম স্পষ্টভাবে ধরতে পেরেছিলেন। যে ছন্দরীতিতে মুক্তদল একমাত্রার এবং রুদ্ধদল দু'মাত্রা হিসেবে সবসময় উচ্চারিত হয় তাকে প্রবোধচন্দ্র তাঁর ছন্দ আলোচনার প্রথম যুগে 'মাত্রাবৃত্ত' বলতেন। রবীন্দ্রনাথ তখন এ-ছন্দকে 'সংস্কৃত-ভাঙা' ছন্দ বলতেন। দিলীপকুমার 'ছান্দসিকী'র দ্বিতীয় সংস্করণেও এ-ছন্দকে মাত্রাবৃত্তই বলেছেন। যদিও প্রবোধচন্দ্র ইতিমধ্যে মাত্রাবৃত্ত থেকে 'সরল-কলামাত্রিক' এবং তার থেকে 'কলাবৃত্ত' নামে সরে এসেছেন। কলাবৃত্তে প্রবোধচন্দ্র চার, পাঁচ, ছয় এবং সাত মাত্রার পর্ব বিন্যাসের কথা বলেছেন। দিলীপকুমার সেই সঙ্গে নয়মাত্রার পর্ব যোগ করেছেন। চারমাত্রার ছন্দে, তাঁর মতে, 'গতি সচরাচর হয়ে থাকে নৃত্যের দিকে—তখন চার-চার অন্তর অতি প্রত্যক্ষ ঝোঁক পড়ে।' ছয়মাত্রা-পর্বের 'মূল প্রকৃতিটি গতিশীল' হলেও সে গতি শান্তগতি, চঞ্চল নয়। চার বা পাঁচমাত্রা পর্বের কলাবৃত্তের সঠিক মেজাজটি দিলীপকুমার রবীন্দ্র আদর্শেই উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। সচরাচর পঞ্চমাত্রিক ছন্দ-পর্বে বিষম তিনমাত্রার শব্দের পর সম দু'মাত্রায় শব্দ বসে। তিন মাত্রায় গতি—দু'মাত্রায় বাধা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'এই বাধা... কেবল বাধার ছল, এতে গতিকে আরো উস্কিয়ে দেয় এবং বিচিত্র করে তোলে।' দিলীপকুমার আরও লক্ষ করেছেন, সচরাচর এ-ছন্দে তালটা পড়ে তিন-দু'য়ের, কিন্তু বৈচিত্র্যের জন্যে দুই-তিনের বিন্যাসও আনা হয়। যেমন,—

ভরিয়া উঠে। নিখিল তব। রতি-বিলাপ। সঙ্গীতে

[রবীন্দ্রনাথ, মদনভস্মের পর]

সাত মাত্রা-পর্বের ছন্দে, তাঁর মতে, 'প্রথম, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ মাত্রায় তিনটি করে ঝোঁক পড়ে। এই তিন-চারের ছন্দ—সঙ্গীতে তেওরা তালভঙ্গিম।—সে কারণে ৩+২+২ মাত্রার শব্দবিন্যাসক্রম বেশি পাওয়া যায়। তবে কবিরা ঠিকমতো প্রয়োগ করতে পারলে মাঝে মাঝে ২+৩+২ শব্দ বিন্যাসে এ-ছন্দকে আরও বৈচিত্র্য ও মাধুর্যমণ্ডিত করা যায়। যেমন রবীন্দ্রনাথ গানভঙ্গ কবিতায় করেছেন,

শিরা বাহির করা। শীর্ণ করে ০০। তুলিয়া নিল তান। পুরা ০০০০০

এ-ছন্দপর্ব সম্পর্কে দিলীপকুমারের একটি আক্ষেপ, রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর অনুবর্তীগণ এতে যুগ্মধ্বনির ব্যবহার যথাসম্ভব এড়িয়ে গেছেন। এ-অনুযোগ কবির প্রথম যুগের কবিতা সম্পর্কে সত্য হলেও, পরের দিকে কিছু কবিতা-গানে তিনি যুক্তবর্ণ ব্যবহারে আর কার্পণ্য দেখাননি। যেমন,

হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু
ঘন মেঘের ভুরু কুটিল কুঞ্চিত,

হল রোমাঞ্চিত বন বনান্তর—
দুলিল চঞ্চল বক্ষ হিন্দোলে মিলনস্বপ্নে সে কোন্ অতিথিরে।
সঘন-বর্ষণ-শব্দ-মুখরিত বজ্রসচকিত ত্রস্ত শর্বরী,
মালতী বল্লরী কাঁপায় পল্লব করুণ কল্লোলে—
কানন শঙ্কিত ঝিল্লি ঝংকৃত

[গীতবিতান, প্রকৃতি-১০৩]

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, দিলীপকুমার মুখ্যত গানের কান দিয়েই কাব্যছন্দের বিচার করতেন বলে পংক্তি বা পদশেষের অপূর্ণ পদ বা পর্বের বিশ্লেষণে অনুচ্চারিত যতিমাত্রার সাহায্যে মাত্রাপূরণ করতেন। উপরের দুটি দৃষ্টান্তে ০-অঙ্কের সাহায্যে এই অনুচ্চারিত মাত্রা ধরা হয়েছে।

কলাবৃত্তে নয়মাত্রার পর্ব চলতে পারে কিনা একসময়ে সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমূল্যধন, শৈলেন্দ্রনাথ প্রমুখ তরুণতর ছান্দসিকদের বিতর্ক হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছিলেন তাঁর 'আঁধার রজনী পোহাল। জগৎ পুরিল পুলকে' গানটি নয়মাত্রার পর্বে রচিত। তরুণ ছান্দসিকেরা এটি ৬+৩ মাত্রার পূর্ণ-অপূর্ণ দুটি পর্বের সংযোগ হিসেবে গণ্য করেছিলেন। দিলীপকুমার সে বিতর্কে প্রত্যক্ষভাবে যোগ না দিলেও, 'ছান্দসিকী' গ্রন্থে অভিমত দিয়েছেন, 'মাত্রাবৃত্তে নবমাত্রিক পর্ববন্ধনী খুবই কম।' প্রসঙ্গত তাঁর নিজের এবং কবি নিশিকান্তের রচনা থেকে যে দুটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তার পর্ব বিন্যাস ৪ ।৫ ।৪ ।৫ ।। ৪ ।৫ ।। ৪-মাত্রার, —অর্থাৎ চার পাঁচ মাত্রার সমন্বয় বলা যেতে পারে। অর্থাৎ প্রকারান্তরে তিনিও মাত্রাবৃত্তে নয়মাত্রার পর্বকে নাকচ করেছেন।

দলবৃত্ত নিয়ে দিলীপকুমার যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন এ ছন্দে তিন মাত্রার চাল লক্ষ করেছিলেন দিলীপকুমারের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটেছিল। তিনি সত্যেন্দ্রনাথও প্রবোধচন্দ্রের মত সমর্থন করে একে চতুর্মাত্রা চালের ছন্দ বলেছিলেন। প্রবোধচন্দ্র সে সময় অবশ্য এ ছন্দকে চতুঃস্বর পর্বের ছন্দ বলতেন। 'ছান্দসিকী'তে দিলীপকুমার এ-ছন্দের বিশদ সূত্র নির্দেশ করেছেন। তার মুখ্য বক্তব্য হল: এ-ছন্দ চলিত বাংলা ভাষার সবচেয়ে ঘরোয়া ছন্দ। মুখ্যত রবীন্দ্রনাথের হাতেই এ-ছন্দ 'হরিজনদের পৃথক পংক্তি থেকে এখন কুলীনের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। যদিও এ-ছন্দের প্রতি পর্বে চারদল চারমাত্রা, কবিরা প্রয়োজন মতো তিন দল বা দুই দলও পর্ব বিন্যাস করে বৈচিত্র্য এনে থাকেন। চতুর্দল পর্বে চারটি দল মুক্ত থাকতে পারে, তিনটে মুক্ত, একটি রুদ্ধ হতে পারে, দুটি মুক্ত, দুটি রুদ্ধ হতে পারে। একটি মুক্ত, দুটি রুদ্ধ দলের বিন্যাসে দলবৃত্তের ঝরঝরে গতির একটু হানি হয়, তবে ছন্দপতন হয় বলা যাবে না। কিন্তু চারটেই রুদ্ধদল অচল। যদিও রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় ক্বচিৎ ঘটেছে, তবে সুপ্রযুক্ত নয়।'

সত্যেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ত্রিদল এবং দ্বিদল পর্বের দলবৃত্ত/বিকল্পে কলাবৃত্ত ছন্দ সম্পর্কে দিলীপকুমারের অভিমত 'এ ধরণের ছন্দে বৈচিত্র্য আসে না।.. হ্লাদিনী শক্তির স্ফূর্তি হয় না। সংস্কৃতে যে কারণে পঞ্চচামর বা সমানিকা আদর পায়নি।' দ্বিজেন্দ্রলালের

'স্বাধীন ত্রিদল পর্বিক' (অর্থাৎ প্রতি ত্রিদল পর্বে রুদ্ধ-মুক্ত দলের হিসাব যেখানে নির্দিষ্ট নয়) স্বরবৃত্তকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন 'আলেখ্য'র দীর্ঘপদী ছন্দের পূর্বাভাষরূপে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, দলবৃত্তের চাল তিনের না চারের,—এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মত-বিরোধের কারণ উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ এ ছন্দের পর্বে চতুর্দলের আড়ালে ৩+৩ কলামাত্রার (time-unit) চাল লক্ষ করেছিলেন। দিলীপকুমার সেক্ষেত্রে প্রতি দলকে এক মাত্রা (time unit) হিসেবে ধরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লৌকিক দলবৃত্তের আলোচনায় যে 'স্বরবর্ণে টান দিয়ে মিড় দেবার ফাঁক' এর উল্লেখ করেছেন যেখানে তিনি চতুর্দলপর্বে ছয়কলামাত্রার চালকেই ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন। এ-ছন্দে যে একটি মুক্ত, তিনটি রুদ্ধ দলের বা চারটি রুদ্ধদলের পর্ব-বিন্যাস খাপ খায় না, তার কারণ কলামাত্রার হিসেবে সেখানে প্রতি পর্বে ছয়ের থেকে এক বা দু'মাত্রা বেড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন, বরং এক বা দু'মাত্রা কোনো কোনো পর্বে কম থাকলেই 'স্বর বর্ণে টান দিয়ে মিড় দেবার' আসল প্রাণস্পন্দনটুকু ফুটে ওঠে।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য' কাব্যে প্রবর্তিত দলবৃত্ত ছন্দকে দিলীপকুমার একাধারে স্বর ও অক্ষর-এর মিশ্রণজাত 'স্বরাক্ষরিক ছন্দ' নাম দিয়েছেন। তাঁর মতে, এ ছন্দের 'কল্লোল বা rhythm' মিশ্রবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্তের, কিন্তু ক্রিয়াপদগুলি কথ্যরীতির। রুদ্ধদল সচরাচর একমাত্রিক, তবে প্রয়োজনে শব্দপ্রান্তে মিশ্রবৃত্তের মতো দ্বিমাত্রিক। সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের জন্যে এ-ছন্দে ছয়টি দলে পর্ব গঠিত হতে পারে এবং অক্ষরবৃত্তের মতোই প্রবহমানতা আনা যেতে পারে। চতুর্দল পর্বে তিনটি রুদ্ধ একটি মুক্তদল বিন্যস্ত হতে পারে। এখানে বলা প্রয়োজন, দিলীপকুমার লৌকিক দলবৃত্তের উচ্চারণে যে বিশ্লিষ্টতা এবং আলেখ্যের দীর্ঘপদী দলবৃত্তের উচ্চারণে যে সংশ্লিষ্টতা লক্ষ করেছেন, তার মুখ্য কারণ, লৌকিক পর্বে ছয় কলার প্রসারিত উচ্চারণ থাকে, 'স্বরাক্ষরিক ছন্দে' সাধারণত লঘু পর্বযতি লোপ পেয়ে মিশ্রবৃত্তের মতোই জোড় সংখ্যক আট/দশ/ছয় মাত্রার পদযতি প্রাধান্য প্রায়, এবং রুদ্ধ-মুক্ত নির্বিশেষে প্রতি দলেই এক কলামাত্রার সংহত উচ্চারণ ফুটে ওঠে। প্রবোধচন্দ্র এ-ছন্দকে পৃথক ছন্দরীতির মর্যাদা দিতে চাননি। দিলীপকুমার লৌকিক দলবৃত্ত থেকে এ-ছন্দের উচ্চারণগত মৌলিক পার্থক্য লক্ষ করে একে 'স্বরাক্ষরিক ছন্দ' নামে পরিচিত করেছেন। অবশ্য এ-ছন্দের প্রকৃতি বিচারে তিনি মুখ্যত প্রবোধচন্দ্রের আদর্শই অনুসরণ করেছেন, বলা যেতে পারে। বাংলা কাব্যে স্বরাক্ষরিক ছন্দ অবহেলিত হবার কারণ বিশ্লেষণে তিনি বলেছেন,

> দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরাক্ষরিক ছন্দে স্বরবৃত্তের ঘরোয়া চাল মৌখিক হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদের মাধ্যমে স্ফুট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরবৃত্তের ওজস্বিতা ও গাম্ভীর্যকেও তিনি ডাক দিয়েছিলেন একাসনে বসবার। এ-চাল শুধু যে অভিনব বলেই আজ পর্যন্ত তেমন সমাদৃত হয়নি তাই নয়, এ-ছন্দে হাত পাকাতে হ'লে খানিকটা গম্ভীর রসের অন্তঃশ্রুতিও অর্জন করতে হবে, নৈলে এ-যুগল মিলনের সৌন্দর্য ও রসে মন ঠিকমতন সাড়া দিতেন পারবেনা।

[ছান্দসিকী, ২য় সং, পৃ ১৭২]

মিশ্রবৃত্ত ছন্দ সম্পর্কে দিলীপকুমার মন্তব্য করেছেন, 'এ-ছন্দ হ'ল এক হিসেবে বাংলা ছন্দের শ্রেষ্ঠ ছন্দ।... এ-ছন্দের চারদিকে যুগযুগ ধ'রে গ'ড়ে উঠেছে ছন্দ-সাধনার যে সংহতি, পরিবেশ ও স্বপ্নমণ্ডল তার দাম কাব্যব্যঞ্জনায় খুবই বেশি।... এ ছন্দে বহুদিনের শব্দসাধনার অনিবার্য ঝঙ্কার সহজেই বেজে ওঠে গাম্ভীর্যের অনাহত তরঙ্গ কল্লোলে।' তিনি ভারতচন্দ্রকেই মধ্যযুগে এ-ছন্দের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলেছেন। উনবিংশ শতকে মধুসূদন অমিত্রাক্ষরে এই ছন্দের শক্তি পরীক্ষা করলেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের হাতেই কলাবৃত্ত ও দলবৃত্তের মতো এ ছন্দের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে। প্রবোধচন্দ্রের আদর্শে দিলীপকুমারও ধরেছিলেন, 'শব্দশেষে এ-ছন্দে রুদ্ধদল দুমাত্রা, শব্দের মাঝে সচরাচর একমাত্রা। দেশজ হসন্তমধ্য শব্দ একমাত্রা বা দু'মাত্রা—দু'রকমই হতে পারে।' তিনি এ-প্রসঙ্গে একটি সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন, 'অক্ষরবৃত্তে শব্দমধ্যস্থিত রুদ্ধদল যখন বহুক্ষেত্রেই বিকল্পে দ্বিমাত্রিক হয়ে দেখা দিচ্ছে তখন যুক্তাক্ষরে লেখা রুদ্ধদল সংস্কৃত শব্দই বা কেন বিকল্পে দ্বিমাত্রিকতার বৈচিত্র্য দাবি করতে পারবেনা?'—অবশ্য সে কাজ অল্পস্বল্প যে রবীন্দ্রনাথ-সহ এ-যুগের অধিকাংশ কবি করেছেন লেখক তারও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। মিশ্রবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্তের চাল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'এ-ছন্দ আগে দুটি কদমে লেখা হত: চারের ও তিনের। পয়ার, মালঝাঁপ, মালতী, দিগক্ষরা, দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু চতুষ্পদী প্রমুখ ছন্দ চলত দুই বা চারের কদমে। লঘুত্রিপদী, তরল ত্রিপদী, ললিত, একাবলি প্রভৃতি চলত তিন বা ছয়ের পদক্ষেপে।.... মাত্রাবৃত্ত প্রচলিত হবার পর তিনের কদম অক্ষরবৃত্ত থেকে বিদায় নিয়েছে বলা চলে। এখন অক্ষরবৃত্তে চারের চাল ছাড়া অন্য কিছুর প্রতিপত্তি নেই।' সত্যেন্দ্রনাথ আট মাত্রার/ছয় মাত্রার/দশ মাত্রার পদবিন্যাসে 'বিজোড়ে বিজোড় গাঁথো, জোড়ে গাঁথো জোড়'—যে শব্দ গ্রন্থনারীতির সূত্র দিয়েছিলেন, দিলীপকুমার সেটা মেনে নিয়েও ৩+২+৩ মাত্রায় বিন্যাসক্রমও যে মাঝে মাঝে চালানো যায় সেই অভিমত দিয়েছেন। সাক্ষ্য হিসেবে মধুসূদনের 'বাজিছে রাজ তোরণে' এবং রবীন্দ্রনাথের 'রাতের লতা বিতানে' দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন।[২] মিশ্রবৃত্তের প্রবহমানতা সৃষ্টিতে মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দান স্মরণ করে পরিশেষে মন্তব্য করেছেন,

> স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তেও প্রবহমানতা এসেছে এবং তার ক্ষেত্র দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে এও সত্য। কিন্তু তবু অক্ষরবৃত্ত এ প্রবহমানতার স্বাধীন সাবলীল ওজস্বিতায় এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মাত্রাবৃত্তের স্নিগ্ধ অঙ্গনে বাসা বেঁধেছে বাংলা গান—অক্ষরবৃত্ত ছন্দ গানকে একরকম বিদায় দিয়েছে তার খাস তালুক থেকে। কিন্তু ওজস্ গাম্ভীর্য ও বিস্তীর্ণ ধ্বনির সাগরকল্লোলে সে যেন আরও বেশি ক'রে ঠাঁই দিয়েছে এই প্রবহমানতার নিরঙ্কুশ গতিপ্রবাহে। এমন স্বচ্ছন্দে অন্য কোনো ছন্দই আজ অবধি প্রবহমান হতে পারেনি কখনো ছোটো চরণের স্বল্প পরিধির মধ্যে, কখনো দীর্ঘ চরণের বিস্তীর্ণ কল্লোলের মধ্যে।
>
> [ঐ পৃ ১২৩-২৪]

রবীন্দ্রনাথ এ-ছন্দের আশ্চর্য শোষণশক্তি সম্পর্কে যে উল্লেখ করেছিলেন দিলীপকুমারও তাকে মিশ্রবৃত্তের জীবনশক্তির নিদর্শন হিসেবে গণ্য করেছেন।

২। ছান্দসিকেরা সম্ভবতঃ উভয় দৃষ্টান্তকেই ছন্দ-দুর্বলতার নিদর্শন হিসেবে ধরবেন।

ছন্দ আলোচনায় দিলীপকুমার রবীন্দ্রনাথ ও প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে বোধহয় সবচেয়ে বেশি বিতর্ক চালিয়েছেন বাংলা কবিতায় 'লঘু-গুরু' ছন্দের প্রয়োগ সম্ভাবনার প্রশ্নে। এ-ছন্দ সম্পর্কে তাঁর দেওয়া সূত্রটি হল:

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে শুধু আ, ঈ, উ, এ, ও এই পাঁচটি স্বরবর্ণকে গুরু (অর্থাৎ রুদ্ধদলের মতো মতো দ্বিমাত্রিক) মর্যাদা দিলেই লঘুগুরু ছন্দ পাওয়া যায়। [ঐ পৃ ১৮৫]

তিনি লক্ষ করেছিলেন, বাংলা কাব্যের সুরু থেকে, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস থেকেই এ-ছন্দ প্রচলিত ছিল। 'বিদ্যাপতির আধা মৈথিলী আধা গৌড় ভাষায় দীর্ঘস্বর মুহুর্মুহু যথাবিধি দীর্ঘ উচ্চারিত হত। কিন্তু হলে হবে কি, এ-নিয়ম পাকা তো হয়নি, তাই ছন্দের প্রয়োজনে লঘুস্বর-ও গুরু উচ্চারিত হ'ত, গুরুস্বর-ও লঘু উচ্চারিত হত।' তাঁর মতে, 'ভারতচন্দ্র প্রথম এ লঘুগুরু ছন্দকে নিখুঁত ক'রে রচনা করেন। আমাদের বাংলা কাব্যে ছন্দের নিখুঁত ভিৎ তিনি নানা দিকেই গড়ে তোলেন।... বৈষ্ণব কবিদের কাছ থেকে পাওয়া লঘুগুরু ছন্দের শৈথিল্য তিনি শোধন না করলে এ ছন্দ আজ গানে যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সে প্রতিষ্ঠা পেত কিনা সন্দেহ।' [ঐ পৃ ১৮৬-৮৮]

দিলীপকুমার বাংলায় লঘু-গুরু ছন্দ চালাতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন প্রার্থনা করে (এই ছন্দে লেখা তাঁর কবিতা-সহ) যে পত্র লিখেছিলেন, তার উত্তরে কবি লেখেন,

'ছন্দ নিয়ে যে কথাটা তুলেছ সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্যটা বলি। বাংলার উচ্চারণে হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণভেদ নেই সেই জন্যে বাংলা ছন্দে সেটা চালাতে গেলে কৃত্রিমতা আসেই।

- - - - -
হেসে হেসে হল যে অস্থির
- - -
মেয়েটা বুঝি ব্রাহ্মণ বস্তির

এটা জবরদস্তি—

কিন্তু হেসে কুটি কুটি এ কী দশা এর
এ মেয়েটা বুঝি রায় মশায়ের—

এর মধ্যে কোনো অত্যাচার নেই। রায় মশায়ের চঞ্চল মেয়েটির কাহিনী যদি বলে যাই লোকের মিষ্টি লাগবে, কিন্তু দীর্ঘহ্রস্বে পা ফেলে চলেন যিনি তার সঙ্গে বেশিক্ষণ আলাপ চলেনা। যেটা একেবারে প্রকৃতিবিরুদ্ধ তার নৈপুণ্যে কিছুক্ষণ বাহবা দেওয়া চলে তার সঙ্গে ঘর করা চলে না।'

দিলীপকুমার সম্ভবত কবি-রচিত লঘু-গুরু উচ্চারণের 'জনগণমন' গানের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। উত্তরে কবে লেখেন,

> 'জনগণমন অধিনায়ক' ওটা যে গান, দ্বিতীয়ত সকল প্রদেশের কাছে যথাসম্ভব সুগম করবার জন্য যথাসাধ্য সংস্কৃত শব্দ লাগিয়ে ওটাকে আমাদের পাড়া থেকে জয়দেবীয় পল্লীতে চালান করে দেওয়া হয়েছে।

[দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৪ পৃ ২০]

দুদিন পরে লেখা আর একটি পত্রেও কবি এই একই মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। প্রবোধচন্দ্রও বাংলায় এ-ছন্দের ব্যবহার সম্পর্কে রবীন্দ্রমতেরই সমর্থক।

'ছান্দসিকী'তে এ-ছন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে দিলীপকুমার বিরোধী মত পোষণ-কারীদের তিনটি যুক্তির উল্লেখ করেছেন: (১) এ-ছন্দ কৃত্রিম, (২) এ-ছন্দে বেশির ভাগ পাঠক রস পাননা, (৩) দু-চারটি কবিতা-গান এ-ছন্দে রসোত্তীর্ণ হলেও সেগুলি ব্যতিক্রম মাত্র। কৃত্রিমতার প্রশ্নে তাঁর জবাব: 'ছন্দ মাত্রেই তো কৃত্রিম। যথার্থ শ্রুতিদীক্ষা ছাড়া ছন্দের কৃত্রিমতা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। এ-ছন্দে দীর্ঘস্বর টেনে পড়তে হয়,—সে ভঙ্গিটা কৃত্রিম যদি হয় তাহলে তো বলতে হয়, প্রাচীন বাংলা কবিতা সবটাই তো সুর করে পড়া হত।—সে রেশটা এখনো রয়ে গেছে,—রবীন্দ্রনাথও সে কথা বলেছেন।' তাঁর মতে, 'এ-ছন্দের যথার্থ ব্যবহার কঠিন বলে, এর কল্লোল ফোটানো সহজসাধ্য নয় বলেই এ-ছন্দ তেমন জনপ্রিয় হচ্ছেনা।'

দিলীপকুমার 'লঘু-গুরু' ছন্দের 'মিশ্র লঘুগুরু' নামে একটি বিভাগ করে তার সূত্র-ব্যাখ্যা দিয়েছেন,—

> যেহেতু বাংলা ছন্দে পর্বের দলে একটি স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে, সেহেতু মিশ্র লঘুগুরু ছন্দে যেখানে যেখানে গুরুস্বরের (অর্থাৎ আ ঈ উ এ ও) বিন্যাস হবে, পর্বের প্রথম দলে সেখানে সেখানে সে দ্বিমাত্রিক হবে, অন্যত্র বিকল্পে একমাত্রিকও হতে পারে কিম্বা দ্বিমাত্রিক হতে পারে।.... এ ছন্দের সুবিধা এই যে, গুরুস্বরের উদাত্ত কল্লোলকে তলব করা হ'ল বাংলা ছন্দের সহজ ঝোঁক বা প্রস্বনের মাধ্যমে। রুদ্ধদলে একটি সহজ ঝোঁক থাকে সবাই জানেন। গুরুস্বরেও সেই ঝোঁককে বহাল করা হলে সে ছন্দটির নাম হবে 'মিশ্র লঘুগুরু ছন্দ'। দৃষ্টান্ত দিয়েছেন,
>
> এসো । র্লক্ষ্মী ম । য়ী প্রাণ । র্মন্দিরে । র্মা !
> এসো । র্কৃষ্ণম । য়ী কৃপা । র্মঞ্জীরে । র্মা !
>
> [ঐ, পৃ. ২১০]

সত্যেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত চতুর্দল, ত্রিদল এবং দ্বিদল পর্বিক একশ্রেণীর দলবৃত্তে এমন ধরণের দলবিন্যাস রয়েছে সেগুলি বিকল্পে কলাবৃত্ত রূপেও পড়া চলে। তাকে দিলীপকুমার 'স্বরমাত্রিক ছন্দ' বলেছেন।

রুদ্ধদল উচ্চারণে যে প্রস্বন পাওয়া যায় তার সাহায্যে সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃত, ফার্সী, ইংরেজি প্রভৃতি নানা ছন্দের বাংলা রূপ দিয়েছেন। দিলীপকুমার এর নাম দিয়েছেন 'প্রস্বনী' ছন্দ। সত্যেন্দ্রনাথও তাঁর 'ছন্দসরস্বতী'তে নির্দিষ্ট রুদ্ধমুক্ত দলবিন্যাসের ছন্দের এমন ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করেছিলেন।—আসলে এ-ছন্দরূপগুলি উচ্চারণ-প্রকৃতি বিচারে দলবৃত্ত বা কলাবৃত্ত পর্যায়ের মধ্যেই পড়ে।

ছন্দ আলোচনার ক্ষেত্রে দিলীপকুমার রবীন্দ্রনাথের সম, অসম, বিষম শ্রেণীবিভাগ পছন্দ করেননি। বরং প্রবোধচন্দ্রের মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত নামকরণ এবং বিশ্লেষণ-রীতিই যুক্তিসম্মত মনে করেছিলেন। প্রবোধচন্দ্র অবশ্য এই ছন্দরীতিত্রয়ীর নাম বদল করে মাত্রাবৃত্তকে সরল কলাবৃত্ত, বা সংক্ষেপে কলাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্তকে প্রথমে যৌগিক, তারপর

বিশিষ্ট কলাবৃত্ত,—সবশেষে মিশ্র কলাবৃত্ত বা সংক্ষেপে মিশ্রবৃত্ত নাম দিয়েছিলেন। সিলেব্‌ল্‌কে তিনি প্রথমে স্বর বা ধ্বনি বলতেন, পরে 'দল' নামকরণ করেন। এবং সে কারণেই স্বরবৃত্তকেও দলবৃত্ত নাম দিয়েছিলেন। এখন তিনি এই নতুন নামগুলিই ব্যবহার করে থাকেন। প্রবোধচন্দ্র প্রথম কলাবৃত্তের ইউনিটকে 'মাত্রা', মিশ্রবৃত্তের ইউনিটকে 'অক্ষর' এবং দলবৃত্তের ইউনিটকে 'স্বর' বলতেন। পরে তিনি মাত্রা বলতে যে কোন পরিমাপককে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, বাংলা ছন্দে দু'রকম পরিমাপক বা মাত্রার ব্যবহার হয়: কলা এবং দল। 'কলা'বলতে তিনি একসময়ে 'হ্রস্বস্বরের উচ্চারণ-কাল' বোঝাতেন; এখন 'একটি হ্রস্বস্বরের সমপরিমাণ ধ্বনি' বুঝিয়ে থাকেন। কলাবৃত্ত এবং মিশ্রবৃত্ত ছন্দে 'কলা' পরিমাপক হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলেই এ-ছন্দরীতি দুটিকে তিনি যথাক্রমে সরল কলাবৃত্ত এবং মিশ্র কলাবৃত্ত নামকরণ করেছেন। আগেই বলেছি, দিলীপকুমার দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এই নতুন পরিভাষাগুলি পছন্দ করেননি। এমনকি 'ছান্দসিকী' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে (১৯৬৮) 'দল' নামটি স্বর বা ধ্বনির পরিবর্তে মেনে নিলেও, দু'রকম মাত্রার হিসাব পছন্দ করেননি। মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত নাম তিনটিই রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রবোধচন্দ্রের 'ছন্দপরিক্রমা' (১ম সং ১৯৬৫) হাতে পেয়ে তাঁকে দীর্ঘ এক পত্র লিখে পুনর্বার পরিভাষাগত এবং ছন্দরীতিগত সংশয়গুলি ব্যক্ত করেন। প্রবোধচন্দ্র সে পত্রের জবাবে, কেন দু'রকম 'মাত্রা'র ব্যবহার করেছেন, কেন পরিভাষাগুলি বদল করেছেন, তার কারণগুলি বিশদভাবে বুঝিয়ে পরিশেষে লেখেন,

> আমি মনে করি চালু পরিভাষা নিরর্থক হলেও কিংবা সামান্য খুঁত থাকলেও সর্বদা বর্জনীয় নয়। এগুলিকে রূঢ়ার্থক নাম হিসাবে রক্ষা করাই বাঞ্ছনীয়। তাতে কোনো ক্ষতি নেই, অথচ লোকের তাতে সুবিধা হয়।...তাই আমি বলি, অক্ষরবৃত্ত প্রভৃতি চলতি নাম চলুক, তার সঙ্গে থাকবে সে গুলির উন্নততর পারিভাষিক নাম। এই উভয়বিধ নামের সঙ্গে সেগুলির ব্যাখ্যা তো অবশ্যই থাকবে। ...আমি পরিভাষিক নাম হিসাবে 'দলবৃত্ত' নামটাই ব্যবহার করি, কিন্তু চলতি 'স্বরবৃত্ত' নামটাও উল্লেখ করে থাকি। তেমনি অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত নাম দুটোকেও দেশছাড়া করতে চাই না। [ছান্দসিকী, ২য় সং, পৃ ২৮১-৮২। পত্রের তারিখ ১৭ বৈশাখ, ১৩৭৩]

এ-পত্রের উত্তরে দিলীপকুমার লিখেছিলেন,

> আপনার চিঠিটাকে আমার ছান্দসিকী গ্রন্থে বিন্যস্ত করে প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করতে চাই যে, সব জড়িয়ে আপনি যে তিনটি পারিভাষিক নাম তথা ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমাদের ছন্দের মূল ত্রিধারার, সে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আমাদের সকলেরই সাদরে স্বীকার করা কর্তব্য, নৈলে প্রত্যেকেই স্ব-স্ব প্রধান হয়ে এক স্বনির্বাচিত পরিভাষা গড়ে তুলতে চাইলে সেটা হয়ে দাঁড়াবে—যাকে বলে confusion grown worse confounded. [ঐ, পৃ ২৮৮। চিঠির তারিখ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩]

সব মতবিরোধ প্রকাশ্যে মিটিয়ে নিলেও এই চিঠির শেষে 'পুনশ্চ' দিয়ে তিনি অবশ্য লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন,

কেবল একটি মতভেদ রইল। লঘু-গুরু ছন্দ সম্বন্ধে। বাংলা কাব্যকাননের বিশেষ করে গীতিকুঞ্জে এটি একটি অপরূপ ফুল বলে আমি মনে করি যে, কমনীয় বলেই বরণীয়। আপনি মনে করেন—বর্জনীয়, নয় কি? না, আপনাকে ভুল বুঝেছি? [ঐ]

এ-পত্রের প্রবোধচন্দ্র কোনো জবাব দিয়েছিলেন কিনা আমার জানা নেই।

দিলীপকুমারের ছন্দ আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিতে গিয়ে দেখা গেল, প্রবোধচন্দ্রের মতো তিনিও প্রায় আজীবনকাল অত্যন্ত ধৈর্য এবং নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা ছন্দের, এবং পাশাপাশি ইংরেজী ও সংস্কৃত ছন্দের চর্চা করে গেছেন। প্রবোধচন্দ্র দিলীপকুমারের ছন্দবোধের সবিশেষ প্রশংসা করেও 'কোনো কোনো ক্ষেত্রে দিলীপকুমারের আবাল্যঅর্জিত সংগীত-সংস্কার তাঁর কাব্যছন্দের স্বরূপ উপলব্ধিকে বিলম্বিত করেছিল' সেটা লক্ষ করেছেন। কিন্তু অন্যদিক থেকে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমার গানের তাল সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত ছিলেন বলেই বাংলা ছন্দের মৌল উপকরণস্বরূপ দুই ও তিন মাত্রার তাল বা ঝোঁক সম্পর্কে প্রথম থেকে সচেতন হতে পেরেছিলেন। ছন্দের চলনে তিনমাত্রার গতি ও দুইমাত্রার যতি যে কোন বিশেষ ধরণের মেজাজ ফুটিয়ে তোলে সে কথাটি রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমার নানাভাবেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন।

ছন্দচর্চায় যাঁদের মতের সঙ্গে বেশিটাই অমিল তাঁদের মতামত নিয়ে দিলীপকুমার আদৌ কোনো আলোচনায় যাননি। মুখ্যত রবীন্দ্রনাথ এবং প্রবোধচন্দ্রের মতামতকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রয়োজনমতো যুক্তিসহকারে তাঁদের মত গ্রহণ বা বর্জন করেছেন। একথা স্বীকার্য, দিলীপকুমারের বাংলা ছন্দবিষয়ক সর্বপ্রকার অভিমত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সমকালীন বা পরবর্তী যুগের ছান্দসিকগণ এবং ছন্দজিজ্ঞাসু কবিতানুরাগী পাঠকগণ হয়তো গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করেন। তবে বাংলা ছন্দচিন্তায় তাঁর বিশিষ্ট দানকে অবশ্যই সকলে সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করবেন।

তীর্থঙ্কর দিলীপকুমার

অলোক রায়

তীর্থঙ্কর বললেই জৈন ধর্মগুরুদের কথা মনে আসে। পার্শ্বনাথ, মহাবীর এঁরা ছিলেন তীর্থঙ্কর। অভিধানে শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শাস্ত্রকার, শাস্ত্রপ্রণেতা। দিলীপকুমার রায় 'তীর্থঙ্কর' বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় (১৯৪৪) জানিয়েছেন, 'তীর্থঙ্কর নামটি আমি "তীর্থ যে করে সে" এই অর্থেই নিয়েছিলাম—বইটির বর্ণিত মানুষগুলিকে তীর্থঙ্কর উপাধি দেবার উদ্দেশ্য ছিল না। নামটি দ্বিতীয় সংস্করণে বদলে দিয়ে "তীর্থযাত্রী" করতে পারতাম, কিন্তু তীর্থঙ্কর নামটি মধ্যে যে সাঙ্গীতিক ধ্বনি আছে তাকে ছাড়তে মন রাজী হল না কিছুতে।... একটি পুরনো শব্দকে নতুন অর্থে ব্যবহার করা অশাস্ত্রীয় নয়—ভাষার শক্তি বাড়ানোর এ একটি সর্বজনগ্রাহ্য কুলীন প্রথা।' অবশ্য দিলীপকুমারের অভিপ্রেত অর্থে শব্দটির বহুপ্রচলন হয়নি। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। বাংলা সাহিত্যে তীর্থঙ্কর একজনই, তিনি দিলীপকুমার।

দিলীপকুমার শুধু তীর্থদর্শন তথা মহাপুরুষসান্নিধ্য কাম্য বিবেচনা করেননি, তিনি তীর্থবর্ণন তথা মহাপুরুষদের বাণী সংকলনে সারাজীবন ব্যাপৃত ছিলেন। 'তীর্থঙ্কর'-এ (১৯৪১) যার সূচনা, পরবর্তী ভ্রমণকাহিনীগুলিতে তার বিস্তার (ভূস্বর্গ চঞ্চল, এদেশে ওদেশে, ভ্রাম্যমাণ, আবার ভ্রাম্যমাণ, দেশে দেশে চলি উড়ে); আর 'স্মৃতিচারণ' নামাঙ্কিত (বা অন্য নামে স্মৃতিচারণধর্মী রচনা) গ্রন্থমালায় সেই একই ভাবপ্রেরণা পরিণতি লাভ করেছে। দিলীপকুমারের বহুমুখী প্রতিভা নানাক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করেছে। কিন্তু কেন জানি না মনে হয়, 'মহাজন-দিলীপ-সংবাদ' রচনাই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তরুণ বয়স থেকে মহাজন-সঙ্গলাভের জন্য তাঁর মধ্যে ছিল প্রবল আকৃতি। দিলীপকুমার একে নিছক 'হিরো-ওয়ারশিপ' বলতে চাননি (যদিও তা একেবারে ছিল না তাও নয়), কারণ দূর থেকে আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হওয়া বা স্তুতিরচনার আগ্রহে ব্যক্তিকে দেবত্বদান এর উদ্দেশ্য নয়। তিনি ভালোবেসেছেন এবং ভালোবাসা ফিরেও পেয়েছেন। তাঁর নিজের ভাষায়, 'আমার জীবনে নানা দুরাশাই হাজারো বিফলতার মধ্যে দিয়ে আলোপদ্মের মতন প্রস্ফুটিত হয়েছে মহানুভব দ্রষ্টা ঋষি কবি কর্মী দার্শনিকের আশীর্বাদে। শুধু চলতি আশীর্বাদ নয়—স্নেহোচ্ছল সম্ভাষণ। [তীর্থঙ্করের] এই পাঁচজনের—আরো কয়েকটি মহাপুরুষের কাছে আমি গিয়েছিলাম সত্যই নম্রশীর্ষ হয়ে প্রণাম করে তাঁদের কাছে জ্ঞানের সম্পদ, কর্মের প্রেরণা, প্রেমের পাথেয় পেতে।...আমি মহাজনদের কাছে বৈদিক শিষ্যদের মতনই সমিৎপাণি হয়ে গিয়েছিলাম প্রাণের টানে। অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন—আমি জ্ঞানের পাথেয় পেতে গিয়ে তাঁদের কাছ থেকে স্নেহের বর পেলাম কেমন করে? এর একটিমাত্র উত্তর আছে; আমি তাঁদের সত্যই ভালোবেসেছিলাম ব'লে। প্রাণেই প্রাণ জাগে, প্রেমেই প্রেম।' দিলীপকুমার প্রাণবান

পুরুষ, তাঁর প্রাণশক্তির পরিচয় 'তীর্থঙ্করে'র পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। দিলীপকুমার প্রেমময় পুরুষ—তাঁর 'আনন্দবাদী' ভালোবাসাই তাঁকে আকৃষ্ট করেছে রোমা রোঁলা, মহাত্মা গান্ধী, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের প্রতি।

দিলীপকুমার অন্যক্ষেত্রে যথেষ্ট বিনয় প্রকাশ করলেও একটি ব্যাপারে সংগত কারণেই গর্ব করতেন—'আমি জীবনে বহু জ্ঞানী গুণী মহাজন ও প্রেমিকের ভালোবাসা পেয়েছি। আমার প্রিয়বন্ধু নীরেন [নীরেন্দ্রনাথ রায়]—তার সঙ্গে রুচিগত তথা ধর্মীয় অমিল সত্ত্বেও—আমাকে বারবার বলত যে এদেশে ওদেশে রকমারি প্রকৃতির অজস্র নরনারীকে কাছে টেনে আপন করে নেওয়ার প্রতিভায় সে আমার জুড়ি দেখেনি তার জীবনে। আমি কেবল একটুকু টুকব যে, এ ঠিক প্রতিভার কথা নয়, প্রকৃতির কথা।' (পত্র, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯)। তিনি সহজেই মানুষের সঙ্গে মিশতে পারতেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তো বটেই, এমন কি অসাধারণ মানুষদের সঙ্গেও। তরুণ বয়স থেকেই তাঁর মনে নানা প্রশ্ন জেগেছে, পরিণত বয়সে তিনি এই প্রশ্নগুলি এইভাবে সাজিয়েছেন—১. আমি কে? ২. কেন জন্মেছি জগতে? ৩. জীবনের কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছি কি না? ৪. কীভাবে চললে সে লক্ষ্যে পৌঁছে জীবন সার্থক হয়? এইজন্য তাঁর গুরুর সন্ধান, এবং শেষ পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দকে গুরু হিসাবে বরণ। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই বিখ্যাত স্বগতোক্তির কথা আমাদের মনে পড়বে (শিষ্য সামনে থাকলেও নিজের সঙ্গেই নিজের কথোপকথন), দিলীপকুমারও অনেকটা এই একইভাবে প্রশ্ন করেছেন উত্তর খুঁজেছেন - 'অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, "এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়?" সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি, এবং কার্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি।'

প্রসঙ্গত দিলীপকুমারের বহির্জীবনের প্রধান ঘটনাবলীর কথা আমাদের মনে পড়বে। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপকুমারের জন্ম ২২ জানুয়ারি ১৮৯৭। ১৯১৮ সালে গণিতে প্রথম শ্রেণীর অর্নাস নিয়ে বি.এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ১৯১৯ সালে বিলেত যান, কিন্তু আই. সি. এস বা চার্টাড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়া হলো না। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত এবং সংগীত নিয়ে পড়াশোনা করলেন, পরে বার্লিনে পাশ্চাত্য কণ্ঠসংগীত চর্চা—১৯২২ সালে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন। ১৯২২ থেকে ১৯২৭ ভারতব্যাপী সংগীত পরিক্রমা। ১৯২৭ সালে আবার ইউরোপ যাত্রা। এবার ইউরোপে স্থিতি অল্পদিনের। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে গায়ক ও সুরকার হিসাবে অসামান্য খ্যাতি অর্জন। কিন্তু ভিতরে অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা অস্থির করে তুলেছে, যার পরিণতি ১৯২৮ সালে পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের কাছে আশ্রয় লাভ—আশ্রম জীবনের সূচনা। তারপর প্রায় পঁচিশ বছর সেখানেই অবস্থান। ১৯৫৩ সালে দিলীপকুমারের তৃতীয়বার ইউরোপ যাত্রা। ফিরে এসে পুণায়

হরিকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা। ধর্মজীবনের সঙ্গে সংগীতজীবন—কোথাও কোনো বিরোধ নেই। সেই সঙ্গে চলেছে উপন্যাস, প্রবন্ধ, গান, কবিতা, 'অঘটনী'-গল্পমালা রচনা। প্রয়াণ ৬ জানুয়ারি ১৯৮০।

দিলীপকুমারের তীর্থযাত্রার সূচনা ১৯১৯ সালে, অর্থাৎ প্রথম ইউরোপ-প্রবাসকালে। অবশ্য তারও আগে তীর্থঙ্কর-মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে। তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় (১৯৫০) তিনি 'তীর্থঙ্কর' বই লেখার 'আদিম প্রেরণা'র কথা সবিস্তারে লিখেছেন—যখন তেরো বছর বয়স তখন তিনি শ্রীম তথা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কাছে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের উৎস প্রতিদিন লিখে রাখা সেই ঐতিহাসিক ডায়েরিগুলি দেখবার জন্য, আর তখনই শ্রীম তাঁকে বলেছিলেন, 'যখন তুমি কোন মহাপুরুষের কথা শুনবে—টুকে রাখবে যা কিছু তোমার মনে ধরবে, কেমন বাবা?...আমি জানি না কেন তিনি আচমকা এহেন অদ্ভুত উপরোধ করলেন—একটি তের বছরের বালককে। হিরো-ওয়ারশিপ যাদের স্বধর্ম তারা পরস্পরকে দেখতে না দেখতে চিনতে পারে না কি? বলতে পারি না। শুধু এইটুকু আমি বলতে পারি যে, তাঁর উপদেশ আমি ভুলি নি।' দিলীপকুমারের শুধু 'তীর্থঙ্কর' নয়, এই ধরনের মহাজনদের কথা লিখে রাখার নিদর্শন তাঁর অজস্র বইয়ের কথা মনে পড়বে। শেষ জীবনেও তিনি একই ধারায় লেখেন 'সাধু গুরুদয়াল ও কবি নিশিকান্ত' (১৩৮৩), 'স্মৃতিচারণে মহাযোগী অনির্বাণ' (১৩৮৬)। তবে একই ধারার রচনা হলেও 'তীর্থঙ্করে'র সঙ্গে এসব বইয়ের একটু তফাৎও আছে—'তীর্থঙ্কর'-এ বাণীসংগ্রহ মুখ্য উদ্দেশ্য, অন্যান্য বইতে সংলাপের সঙ্গে আছে চরিত্রচিত্রণে আগ্রহ। দিলীপকুমার এই সময়ে বলেন, 'আমি আমার স্মৃতিচারণে বিশেষ করে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি যেসব স্মরণীয় মানুষকে আমি দেখেছি কাছ থেকে। আমার কাছে মহনীয় চরিত্রই চিরকাল বেশি স্মরণীয় মনে হয়েছে। তাই আমার ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'স্মৃতিচারণে'র দুটি ভাগেই প্রধানত মহানুভব মানুষেরই ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছি।' (স্মৃতির শেষ পাতায়, ১৩৮১)। 'তীর্থঙ্কর' বইটির অন্তত চারটি সংস্করণ আমরা পেয়েছি (প্রথম সংস্করণ দেখবার সুযোগ পাইনি)। লক্ষণীয় যে, প্রত্যেকবার বইটির পরিবর্তন ঘটেছে, দিলীপকুমার সম্ভবত চেয়েছেন নতুন সংস্করণে বইটিকে তাঁর সাম্প্রতিক স্মৃতিচারণের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে। ফলে ১৯৪১ সালে প্রথম যা লিখেছেন, ১৯৭৫ সালে শেষ সংস্করণ প্রকাশকালে তার রূপান্তর অনিবার্য হয়েছে। যেমন রাসেলের সঙ্গে ১৯৫৬ সালে দিলীপকুমারের সাক্ষাতের বিবরণ পরবর্তী সংযোজন। শ্রীঅরবিন্দ-দিলীপ-সংবাদ অবশ্য 'তীর্থঙ্কর'য়েই শেষ হয়নি, দিলীপকুমারকে পরবর্তীকালে লিখতে হয়েছে 'শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে', 'যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ' 'ঋষি কবি গুণী শিল্পী'র মতো বই ('শ্রীঅরবিন্দ কেম্ টু মি' বইটির কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ না করলেও চলবে)। ইতিমধ্যে দিলীপকুমারের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তিনি অল্প বয়স থেকেই ছিলেন 'জিজ্ঞাসু', কিন্তু জিজ্ঞাসার বিষয় যেমন বদলেছে তেমনি বদল হয়েছে মানুষকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি। 'স্মৃতিচারণ'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি তাঁর নিজের পরিবর্তনের কথা ভারি সুন্দর করে লিখেছেন—'এ কথার মানে নয় যে, সাহিত্যে বা সংগীতে আমি রস পাইনি কোনোদিন। পেয়েছি বৈ কি। বিলেতে রোলাঁর জন ক্রিস্টফার পড়ে (১৯১৯) সালে এত অভিভূত হয়েছিলাম

যে তাঁকে চিঠি লিখে দেখা করতে চেয়েছিলাম। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের Roads to freedom পড়েও ঠিক তেমনি মনে হয়েছিল যে, এমন মহাপ্রাণ মানুষের সংস্পর্শ না পেলেই নয়। কিন্তু তারপরে শ্রীঅরবিন্দের দর্শন পেয়ে আর কোনো মহাজনের কাছে জীবনের চরম দিশা সম্বন্ধে উপদেশ চাওয়ার কথা ভাবতেও পারিনি।' দিলীপকুমারের জীবনে এই পর্বান্তর 'তীর্থঙ্কর'-এর শেষ সংস্করণটি পড়বার সময় স্পষ্ট বোঝা যায়। ১৯২০ সাল যখন রোলাঁ বা রাসেলের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, তখনও শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎ-দর্শন তিনি পাননি। তখনও তাঁর আগ্রহের বিষয় শিল্প সংগীত, এমন কি সমাজ বিশ্ব রাজনীতি। 'রুষদেশে নবতন্ত্র' বা লেনিনের বাণী ('সব মানুষকেই এখনি শিক্ষার ফলে বড় করে তোলা যায়') রোলাঁর সঙ্গে কথোপকথনকালে তাঁর আলোচনার বিষয়। গান্ধীর সঙ্গে তিনি গান, শিল্প, সন্ন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন ১৯২৪ ও ১৯২৬ সালে। পরে ১৯৪৭ সালে গান্ধীর সঙ্গে তাঁর আবার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, কিন্তু ততদিনে দিলীপকুমারের দৃষ্টিভঙ্গির বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটেছে, তখন দিলীপকুমারের ভাষায় 'আমি তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিক বলে মনে করতাম না,—এমন কি আক্ষেপই করতাম তাঁর জীবনের শেষ কয়বৎসরে তাঁর নেতৃত্বে দেশের সমূহ ক্ষতি হয়েছে বলে।.... তাঁর শেষজীবনের রাষ্ট্রনৈতিক নায়কত্বের দরুন আমার মন ক্রমশঃ তাঁর প্রতি এতই বিরূপ হয়ে উঠেছিল যে, যদিও তিনি আমার মন টানতেন তবু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পর্যন্ত আমার ভয় করত।' আসলে দিলীপকুমারের বিশ্বাস জন্মেছিল—'আমি একদা তাঁর প্রভাব-পরিধির মধ্যে পড়ে প্রায় তাঁর করতলগত হওয়া সত্ত্বেও যে তাঁর প্রভাব কাটিয়ে গিয়েছি সে শুধু আমার নিজের ইচ্ছাবলে নয়—তাঁর [গান্ধীর] চেয়ে বহুগুণ অধিক তপস্যাপ্রভাব ও জ্ঞানমহিমার [শ্রীঅরবিন্দের] সান্নিধ্যবলে।' অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দ-শিষ্য কখনও গান্ধী-অনুরাগী হতে পারেন না। রাসেলের সঙ্গেও প্রথমে তাঁর সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রনীতি নিয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে। কিন্তু 'নবসংযোজনা' অংশে ১৯৫৩ সালে রাসেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে দিলীপকুমার প্রথমেই জানিয়ে রাখেন, 'আমাদের আলাপ জমেছিল ঘন্টাখানেকের বেশি। কিন্তু আমি এ-কথালাপের হুবহু রিপোর্ট দেবার আর তেমন তাগিদ খুঁজে পাচ্ছি না মনের মধ্যে। হিরো-ওয়ারশিপর হয়ত এখনো আছি, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের কাছে আলো পাওয়ার পরে অন্য প্রণম্যদের প্রণাম করতে মন আজো তেমনি উৎসুক থাকলেও অন্য অন্য চিন্তানায়কদের আলোর বাণী আর তেমন কানের মধ্যে দিয়ে মরমে পশে না।' আসলে 'তীর্থঙ্কর' বইয়ের পরবর্তী সংস্করণে পরিবর্তন ও সংযোজন না করলেই বোধহয় ভালো ছিল। রোলাঁ বা রাসেল, এমনকি মহাত্মা গান্ধীও যখন তাঁর জীবনে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছেন তখন 'তীর্থঙ্কর' বইয়ের পুনঃপ্রচারই কি আর কাম্য ছিল?

অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ঠিক এই সমস্যা দিলীপকুমারের জীবনে ততটা প্রবল হয়নি। ১৯২৫ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎকার, আর দিলীপকুমার মানেই 'আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সবচেয়ে বকায়'—'জিজ্ঞাসু' আর কাকে বলে? রবীন্দ্রনাথ প্রায় প্রশস্তি রচনার ভঙ্গিতে রবীন্দ্র-দিলীপ-সংবাদের ভূমিকায় লেখেন—'দিলীপকুমারের একটি মস্ত গুণ আছে, তিনি শুনতে চান, এই জন্যই শোনবার

জিনিস তিনি টেনে আনতে পারেন। শুনতে চাওয়াটা অকর্মক পদার্থ নয়, সেটা সকর্মক। তার একটা নিজের শক্তি আছে, বলবার শক্তিকে সে উদ্বোধিত করে। যে মানুষ বলে তার পক্ষে সে বড় কম সুযোগ নয়। কেননা বলার দ্বারাই আপন মনের সঙ্গে আমাদের সত্যকার পরিচয় হয়। দিলীপকুমার অনেক সময়ে আমাকে এই আত্মচিন্তা-আবিষ্কারের আনন্দ দিয়েছেন। যখন তাঁকে কথা শুনিয়েছি তখন বস্তুত সে-কথা আপনিই শুনেছি।' (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৪) 'তীর্থঙ্কর' বইতে রবীন্দ্রনাথ এবং শ্রীঅরবিন্দের মুখে যে-সব কথা আমরা শুনি, সেগুলি তাঁদের বুঝতে সহায়তা করে সন্দেহ নেই, কিন্তু দিলীপকুমারকে বুঝতে তা কতটা সাহায্য করে? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংগীত নিয়ে আলোচনা থেকে এমন নতুন কিছু পাওয়া যায় না যা রবীন্দ্রনাথের 'সংগীতচিন্তা' বইয়ের বিভিন্ন রচনার মধ্যে নেই। অন্যদিকে দিলীপকুমারের 'সাঙ্গীতিকী' তাঁর সংগীতভাবনার নিদর্শন। 'তীর্থঙ্কর' পড়বার সময় সম্ভবত এই দুটি বই পাশে রেখে দুজনের চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্য বুঝে নেওয়ার দরকার আছে। কিংবা, পুরুষের জীবনে নারীর ভূমিকা, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, নারীর ভালোবাসা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সরাজীবনে অনেক লিখেছেন, যার সঙ্গে তুলনীয় দিলীপকুমারের প্রথম দিকে লেখা উপন্যাস। কিন্তু 'তীর্থঙ্করে' বলার থেকে শোনাই প্রধান হয়ে উঠেছে, আর যিনি বলছেন তাঁর কথা যে অবশ্য শ্রোতব্য তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। শুধু প্রশ্ন জাগে, দিলীপকুমারের লেখায় আমরা বক্তাদের কতটা পাই। অনেকটা নিশ্চয়ই, তবু অনেকটাই পরিবর্তিত আকারে (যেমন ঘটেছে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে)। 'তীর্থঙ্কর'-য়ের মাহাত্ম্য শেষ পর্যন্ত তাই তীর্থাধিপতির আত্মকথনে নয়, 'তীর্থ যে করে' তারই আত্ম-উন্মোচনে। আসলে মহাজন-দিলীপ সংবাদ তো শ্রুতিলিখন নয়, শ্রুতি ও স্মৃতি মিলে এর সৃষ্টি। দিলীপকুমার শুধু নিবিষ্ট শ্রোতা নন, তিনি উদ্দীপিত স্রষ্টাও বটে। রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে দিলীপকুমারকে লিখেছেন, 'আমি যে-কথা বলেছি ঠিক তার যন্ত্রকৃত প্রতিলিখনটা অসম্পূর্ণ—তোমার মনে যে সব চিন্তার উদ্রেক হয়েছে সেইটের যোগে সমস্তটা সজীব এবং সম্পূর্ণ। বাণীধারার উৎপত্তি যেখানেই হোক তার পরিণতি তোমারই মধ্যে। অর্থাৎ এটা নকল নয়, এটা রচনা। আলাপ-ব্যবহারে রসের রাসায়নিকতা সক্রিয় হয়ে ওঠে, দুটো মৌলিক পদার্থ মিলে হয়ে দাঁড়ায় যৌগিক, তোমার লেখাটিতে সেই যৌগিকতা প্রকাশ পেয়েছে এ কথাটাকে চাপা দিলে জিনিসটাকে খাটো করা হয়। যে প্রক্রিয়ায় রেডিয়ম হয়ে যায় শিষে সেটা শোচনীয় তা স্বীকার করি, এক্ষেত্রে তাহলে দুই হাত তুলে দোহাই পাড়তুম।

রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ভালোবাসা দিলীপকুমার পেয়েছেন প্রভূত পরিমাণে। কিন্তু দিলীপকুমারের রবীন্দ্রনাথ অনেক পরিমাণে তাঁর নিজেরই সৃষ্টি। 'তীর্থঙ্কর'এ রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-উপলব্ধির কথা স্থান পায়নি, পাওয়ার কথাও নয়। সংগীত শিল্প জীবন ছিল তাঁদের আলোচনার বিষয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ কখনও দিলীপকুমারের কাছে তাঁর 'আধ্যাত্মিক' পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন বলে মনে হয়না। 'স্মৃতিচারণে'ও রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ এসেছে, কিন্তু দিলীপকুমারের মনে হয়েছে রবীন্দ্রপ্রতিভার মূল পরিচয় সেখানে ধরা পড়েনি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা গান উপন্যাস তাঁর প্রতিভার একটি মাত্র দিককে তুলে ধরেছে, সেখানে তাঁর সত্য-পরিচয়ের সন্ধান মেলে না। দিলীপকুমার 'স্মৃতিচারণ'য়ের

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় বলেন, 'আমাদের এ-বৈজ্ঞানিক বস্তুতান্ত্রিক যুগের মানুষ রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা, ব্যক্তিরূপ ও শিল্পকারুর মহিমা সম্বন্ধে যতটা সচেতন তাঁর আধ্যাত্মিক ওরফে সত্যদ্রষ্টা রূপের মহিমা সম্বন্ধে ততটা সচেতন নন।' 'তীর্থঙ্কর'-এ তাই রবীন্দ্রপ্রয়াণদিবসের স্মৃতিচারণকালে অনিবার্যভাবে কিছু সংযোজন ঘটে-'একথা বারবার মনে করার দরকার আছে- (বিশেষ করে এ যুগের নিরীশ্বর অধর্মের ধর্ম পদবী পাওয়ার দিনে) যে রবীন্দ্রনাথের মূল স্বরূপ ছিল তাঁর আস্তিক্য। এমনকি তাঁর যে-প্রাণানন্দ তারো মূলে ছিল এই ঈশ্বরমুখিতা (Godwardness)।' শ্রীঅরবিন্দ-শিষ্য এইভাবেই রবীন্দ্রনাথকে দেখতে চেয়েছেন, যদিও তিনি জানেন রবীন্দ্রনাথের প্রাণ ছিল বহুভুক, মন ছিল বহুসন্ধানী (এমন কি বস্তুবাদী, জড়বাদী, দুঃখবাদী, গদ্যবাদী, দলবাদী, তারুণ্যবাদী, বিজ্ঞানবাদী আরো কতো কী-বাদী)। ফলে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে দিলীপকুমারের সমস্যা ছিল না একথা যেমন সত্য, তেমনি সমস্যা ছিল সে কথাও সত্য। ঈশ্বরমুখিতা বা যোগসাধনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনার কোনো সুযোগ পাননি তিনি।

শ্রীঅরবিন্দ দিলীপসাহিত্যের 'leitmotiv'– পণ্ডিচেরিতে অরবিন্দ আশ্রমে যোগ দেওয়ার পর থেকে তিনি একজনকেই জীবনের ধ্রুবতারা রূপে গ্রহণ করেছেন। দিলীপকুমারের সব জিজ্ঞাসা অধ্যাত্মজিজ্ঞাসায় পরিণত হয়েছে। তাঁর মনে হয়েছে 'শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে না এলেও হয়ত আমি সত্যনিষ্ঠ ও চিন্তাশীল লেখক হয়ে গড়ে উঠতাম, কিন্তু যে আত্মিক সমৃদ্ধির দিশা পেয়ে ধন্য হয়েছি তার চূর্ণচ্ছটাও পেতাম না। আমার নিছক বুদ্ধিবাদী বুদ্ধিসারথিদের সাথী হয়ে চললে আমার কী অবস্থা হত য়ুরোপের কয়েকজন খ্যাতনামা বুদ্ধিবাদী নাস্তিকের দশা দেখে বেশ কল্পনা করতে পারি—যাঁদের সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ মৃদু হেসে মন্তব্য করেছেন মগজী বুদ্ধিকে শাস্ত্রীকুক্কুর উপাধি দিয়ে।' (ধর্মবিজ্ঞান ও শ্রীঅরবিন্দ, ১৯৭০)। 'তীর্থঙ্কর' শুধু শ্রীঅরবিন্দের বাণী-সংগ্রহের জন্য মূল্যবান নয়, দিলীপকুমারের অন্তর্জীবন তথা অধ্যাত্মজীবনের পরিচয় গ্রহণেও অরবিন্দ-দিলীপ-সংবাদের তাৎপর্য অপরিসীম। প্রথম সাক্ষাৎকারেই, সেই ১৯২৪ সালে, দিলীপকুমার শ্রীঅরবিন্দকে বলেছেন—'১৯১৯ থেকে ১৯২২ অবধি আমি ছিলাম য়ুরোপে। বহুলোকের সঙ্গেই দেখা হয়েছে—মনস্বী, গুণী, জ্ঞানী, ভাবুক নানা লোকের কাছেই গিয়েছি আমি—সত্য কী, এই জিজ্ঞাসা নিয়ে।.... গিয়ে আমার লাভও হয়েছে প্রচুর—*মহাত্মাজি, রাসেল, রোলাঁ, দুহামেল ; রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, ভাতখণ্ডে*—এ ছাড়া আরও কত অখ্যাত মহাত্মা মানুষের সংস্পর্শে।.... যখনই কোনো মহৎ মানুষের কাছে এসেছি মনে প্রশ্ন জাগত—ইনি কি সত্য পেয়েছেন? শান্তি? অন্তরের অতল থেকে পরিষ্কার এক স্বর উঠত—না তো।' তাই শেষ পর্যন্ত তিনি শ্রীঅরবিন্দের শরণার্থী, তবে প্রথম দিকে অনেকদিন পর্যন্ত পূর্ণযোগসাধনায় আত্মনিয়োগের সময় আসেনি—'তোমার মধ্যে যে-তৃষ্ণা জেগেছে সে হল মনের জিজ্ঞাসা—কিন্তু অন্তত আমার যোগে দীক্ষা পেতে হলে এর চেয়ে বেশি কিছু চাই।' রোলাঁ, রাসেল, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের কাছে দিলীপকুমার গেছেন 'মনের জিজ্ঞাসা' নিয়ে। অবশেষে প্রাণের জিজ্ঞাসা তথা অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা জেগেছে, তখন শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে গ্রহণ করেছেন। ১৯২৮ সালে ২২

নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে গুরুদেবের চরণচ্ছায় আশ্রয় নেওয়ার কথা বলেই 'তীর্থঙ্কর' শেষ হতে পারতো। কিন্তু দিলীপকুমার আরও কিছু দিতে চেয়েছেন, তাই কাহিনীকে ১৯৪৭ সালে লেখা শ্রীঅরবিন্দের চিঠি পর্যন্ত বিস্তার দিয়েছেন। নিজের সংশয় অবিশ্বাস যন্ত্রণার কথা বলতে হয়েছে, তা নাহলে উত্তরণের কথা বলা হয় না। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দিলীপকুমারের শিল্প সাহিত্য এমন কি সংগীত ও ছন্দ নিয়েও অনেক আলোচনা হয়েছে (হয়তো তার বেশি অংশ পত্রে), কিন্তু 'তীর্থঙ্কর'-এ সংগত কারণেই সে সব প্রসঙ্গ প্রাধান্য পায়নি। 'অতিমানস শক্তির অবতরণ' অরবিন্দ-দর্শনের মূল কথা। দিলীপকুমার চেয়েছেন যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করতে, এবং সেই সঙ্গে জানাতে—'এ হেন যুগপ্রবর্তকের কথায় আমি সংশয় প্রকাশ করেছি, তাঁর সঙ্গে গল্পালাপ তর্কাতর্কি করেছি এই অধিকারে যে আমাকে তিনি সম্বোধন করেছিলেন তাঁর চিঠিতে 'a friend and a son' ব'লে।' এখানেই 'তীর্থঙ্কর' নামের সার্থকতা।

দিলীপকুমার একাধিকবার জানিয়েছেন 'তীর্থঙ্কর' তাঁর বড় 'প্রিয় বই' এবং 'তীর্থঙ্করের এত আদর হবে আমি মনে করিনি সত্যিই।' 'তীর্থঙ্কর' দিলীপকুমারের প্রিয় বই, কারণ এখানে তাঁর জীবনের একটি মহৎ অভীপ্সা ফুটে উঠেছে—মহাজন সঙ্গলাভ। কিন্তু আমরা দেখেছি 'তীর্থঙ্কর' দিলীপসাহিত্যধারায় ব্যতিক্রমী রচনা নয়। তবে 'তীর্থঙ্কর' বইটির স্বতন্ত্র কিছু আকর্ষণ আছে। মহাজনদের বাণী তাঁদের রচনাবলীর মধ্যে ছড়িয়ে আছে, তাদের মূল্য অপরিসীম। দিলীপকুমার তাঁদের বই থেকে উদ্ধৃতিও অনেক ব্যবহার করেছেন। তত্ত্বালোচনা স্বতন্ত্রভাবে দামি জিনিস। অথচ সাধারণ মানুষ সে সব বই পড়ে না। তাহলে উপায়? মহাজনদের প্রতি আকর্ষণ আছে, কাছে পৌঁছনোর পথ সহজ নয়। 'তীর্থঙ্কর'য়ের মতো বই কথালাপের মধ্য দিয়ে মহাজনসঙ্গলাভের সুযোগ করে দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত এদিক থেকে দিলীপকুমারের আদর্শ।

দিলীপকুমার সেই বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী, যিনি দেশে বিদেশে শ্রেষ্ঠ মনীষীদের স্নেহসান্নিধ্যলাভের সুযোগ পেয়েছেন। জিজ্ঞাসু মন নিয়ে তিনি তাঁদের কাছে গেছেন, তাঁদের কথা শুনেছেন, তাঁর নিজেরও কিছু বলবার কথা ছিল। সংলাপের আকারে সেই কথালাপ ধরা আছে 'তীর্থঙ্কর' বইতে। দিলীপকুমার জানিয়েছেন, অধিকাংশ কথালাপের অনুলিপি তিনি মহাজনদের দেখিয়ে নিয়েছেন। তবু এই ধরণের স্মৃতিধর্মী বিবরণ (দিলীপকুমার অসামান্য শ্রুতিধর মানুষ হওয়া সত্ত্বেও), এমন কি দিনপঞ্জীও, সম্পূর্ণভাবে লেখকের আত্মপ্রক্ষেপ বর্জিত নয়। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। দিলীপকুমার সারাজীবন স্মৃতিচারণী ঢঙে উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধ-ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন। রচনাশৈলীর দিক থেকে এগুলির মধ্যে দুটি গুণ বিশেষভাবে চোখে পড়ে। দিলীপকুমার খুব বেশি নাটক না লিখলেও (তাঁর লেখা নাটকের সংখ্যা পাঁচ), তাঁর মধ্যে একধরণের নাট্যপ্রতিভা না হলেও নাট্যবোধ ছিল। পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল বালকপুত্রকে বলেছিলেন, 'ড্রামাটিস্টের কুলতিলক তো তুই—ড্রামা ভালোও বাসিস স্বভাবে—কাজেই যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' 'তীর্থঙ্কর' শুধু সংলাপশ্রয়ী নয়, নাট্যলক্ষণাক্রান্ত রচনাও বটে। আসলে কাহিনীর সঙ্গে চরিত্র, চরিত্রের সঙ্গে সংলাপ, আর কিছু নাট্যমুহূর্ত—জীবন্ত হয়ে ওঠে সব কিছু চোখের সামনে। 'তীর্থঙ্কর' প্রায় গল্পের বইয়ের

মতো পড়তে পারি আমরা। তবে সে-গল্পে গভীর জীবনজিজ্ঞাসা আছে, নিসর্গপ্রকৃতির অসামান্য বর্ণনা আছে, আর আছে দিলীপকুমারের স্বতোৎসারিত পরিহাসরসরসিকতা। এই পরিহাস ভঙ্গি বিষয়বস্তুকে তরল না করে উপভোগ্য করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের তো কথাই নেই—কৌতুকবোধ তাঁর প্রাণশক্তিরই পরিচয়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে হাসিঠাট্টাকে মিলিয়ে নেওয়া সহজ নয়,—দিলীপকুমার পরিহাসমুখর গান্ধীকে, অন্তরঙ্গ গান্ধীকে জীবন্ত করে তুলেছেন তাঁর কথালাপে। এমনকি যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দও হাসতে জানতেন, হয়তো 'সারা শরীর কাঁপিয়ে' হাসি নয়, কিন্তু 'একগাল হাসি' তাঁর মুখেও দেখা গেছে। আসলে দিলীপকুমার 'আবাল্য পিতৃদেবের অতুলনীয় দিলদরিয়া হাসির আবহাওয়ায় মানুষ', সেইজন্য মহাজনদের সঙ্গে কথালাপেও হাসিঠাট্টা বর্জন করেন নি। 'তীর্থঙ্কর'য়ের জনপ্রিয়তার অনেক কারণের মধ্যেও এটিও একটি।

সুর বনাম সুরবিহার

শঙ্খ ঘোষ

ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে, স্কুলপড়ুয়া দুটি ছেলের দীর্ঘকালীন একটা তর্ক চলছিল রবীন্দ্রসংগীতের সুরব্যবহার বিষয়ে। উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা মিলে তারা অভিনয় করেছিল 'গুরু' নাটকের, তার্কিকদের মধ্যে একজন ছিল সে-নাটকে পঞ্চকের ভূমিকায়। পঞ্চক হলে তো গাইতে হবে গান, আর গাইতে গেলে চাই সুর। দূর মফস্বলের একজন স্কুলছাত্রের পক্ষে এসব গানের সুর সংগ্রহ করে ফেলা সে-আমলে খুব সহজ ছিল না। কিন্তু তবু সেটা অনায়াস হয়ে এল তার এক বন্ধুর উৎসাহে। সে-বন্ধুর কোনো এক গীতশিল্পী কাকা তখন এসেছেন এ-শহরে চাকরি নিয়ে, হিজ মাস্টার্স ভয়েসে একখানা রেকর্ডও আছে তাঁর। একেবারে রেকর্ড? মফস্বল শহরে তাঁর মহিমা তো তবে আকাশছোঁয়া প্রায়। আর, গানের রেকর্ডও যাঁর আছে, তিনি তো নিশ্চয় শেখাতেই পারবেন রবীন্দ্রনাথের গান। বন্ধুর প্ররোচনায় সেই গায়ক-কাকার কাছে পৌঁছতেই অভয়মুদ্রায় তিনি আশ্বাস দেন যথাসম্ভব সাহায্যের আর কয়েকদিনের চেষ্টায় শিখিয়েও দেন গানগুলি। কেবল, অভিনয় সুসম্পন্ন হবার পর কোনো-এক সমঝদার দর্শকের কাছে ছেলেটি জানতে পারে যে তার গাওয়া গানগুলির সুর ঠিক রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া সুরের মতো নয়।

সে কী কথা! রবীন্দ্রনাথের সুর নয়? বেশ অপমান বোধ হলো ছেলেটির। এ তো প্রায় প্রবঞ্চনা! কেন এমন করলেন সেই হিজমাস্টার্সের শিল্পী? কোন্ সাহসে? এ নিয়ে বন্ধুকে যখন প্রবল ক্ষোভ জানাচ্ছে সে, তখন, কী আশ্চর্য, বন্ধুটি কোনো দোষই দেখল না তার কাকার এই আচরণে। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীতে যে অবিকল রবীন্দ্রনাথেরই সুর চাই, এ কথা বলে দিল কে? এই ছিল কাকার পক্ষে বন্ধুটির চমকপ্রদ যুক্তি। আর ঠিক সেইখান থেকে শুরু হলো তাদের মীমাংসাহীন তর্ক : রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তাঁর গানে সুর দিতে চেয়েছিলেন, সেটাকে সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখাই কি রবীন্দ্রসংগীত-গাইয়েদের পক্ষে অবশ্যপালনীয় ধর্ম, না কি গাইয়ে তাঁর ইচ্ছেমতো স্বাধীনতাও নিতে পারেন অনেকটা?

সে-তর্ক অবশ্য কোনো শমে পৌঁছয়নি সেদিন, আর সেজন্য বেশ দুঃখও ছিল ছেলেটির। কিন্তু দুঃখের অপনোদন হলো বছর পাঁচেক পরে, যখন সে অল্পে অল্পে জানতে পারল যে তাদের ওই মতবৈষম্য কোনো বিচ্ছিন্ন অথবা আকস্মিক ঘটনা নয়, বড়ো বড়ো চিন্তাশীলেরা বহুদিন ধরে মেতে আছেন এ-তর্কেরই রকমফেরে, এমনকী দিলীপকুমার রায় আর রবীন্দ্রনাথের প্রধান একটা মানসিক দূরত্ব গড়ে উঠেছিল এইরকমই এক মতবৈষম্যে। অল্পবয়সের অস্ফুট তর্কোদ্যমকে সে তখন রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় পরিণতভাবে দেখতে পাচ্ছিল তখন, আর তার বন্ধুর যুক্তিগুলিকেই যেন সে দেখছিল দিলীপকুমারের কথায়, তাঁর তর্কে।

দিলীপকুমারের সেই তর্কে এই ছিল যে গানের মধ্যে গায়কের অনেকটা স্বাধীনতা চাই। না যদি থাকে সেই স্বাধীনতা, তাহলে গানের বিকাশ কোথাও থমকে যেতে বাধ্য। কত আন্তরিক আর বদ্ধমূল ছিল তাঁর এই বিশ্বাস, এর একটা পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে মহাজাতিসদনের এক অনুষ্ঠানে, যে-অনুষ্ঠানে দিলীপকুমার গাইছিলেন গান। খুব অল্প বয়স থেকে তাঁর গানের অনুরাগী আমরা অনেকে, 'অকূলে সদাই/চলো ভাই/ছুটে যাই' গানের ধ্বনিভঙ্গিমায় বেশ আলোড়িত থাকতাম আমরা। তখন জানতাম না যে রুশ নৃত্যসংগীত থেকে নেওয়া ও-গানের সুর, দিলীপকুমার নিজেই তা বলে না দিলে হয়তো সেটা জানতাম না আজও। কিন্তু দিলীপকুমার এর যে 'বেপরোয়া গতিভঙ্গি'র কথা বা 'সুর লাফাঝাঁপি'র কথা বলেছেন, যে 'প্রাণশক্তি'র কথা, সেটা অনুভব করা যেত সেই অল্পবয়সেই। তিনি চেয়েছিলেন সুরের আর্কিটেকচার, দিলীপকুমারের গান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এই বর্ণনাই একটা যথার্থ পরিচয়, আর সেই আর্কিটেকচারে আর সুরের গতিভঙ্গিতে আকৃষ্ট আমরা কেউ কেউ সেদিন মহাজাতিসদনে খুবই আগ্রহভরে শুনতে গিয়েছিলাম তাঁর গান।

কিন্তু গানের সেই অনুষ্ঠানটি স্মরণীয় হয়ে রইল গান শোনার চেয়েও ভিন্ন এক কারণে। বলা যায়, গান না শোনার কারণে। সভায় কেউ একজন তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কোনো গান গাইবার জন্য, কিন্তু দিলীপকুমার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সেই প্রার্থনা। কেন-যে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যথাসম্ভব সৌজন্যে বুঝিয়েও দিয়েছিলেন সেটা। বলেছিলেন, যে-গানে গায়কের কোনো শিল্পস্বাধীনতা নেই, কোনো আপনস্ফূর্তি নেই, সে-গান তিনি গাইবেন না কখনো। আর সেইসঙ্গে বলেছিলেন আরও এক বিস্ময়কর ভবিষ্যবাণী : স্বাধীনতার এমন অভাব আছে বলেই রবীন্দ্রসংগীতের বিলয় হবে অচিরে, তুলনায় অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়বে একদিন দ্বিজেন্দ্রলালের গান।

এ ভবিষ্যকথন যে সত্যি হয়নি সেকথা আমরা জানি। রবীন্দ্রসংগীতের সমাদরের সূচনালক্ষণগুলি তখনই ছিল বেশ স্পষ্ট, আর তার দশ বছর পর থেকে, রবীন্দ্রশতবর্ষের উন্মাদনাকাল থেকে, বাঙালির সংস্কৃতিতে ওতপ্রোত জড়িয়ে গেছে আজ রবীন্দ্রসংগীত। যে আশঙ্কার প্রকাশ করেছিলেন দিলীপকুমার, এইভাবে তা নিশ্চয় অমূলক প্রমাণ হয়েছে আজ। কিন্তু যে অভিমানের প্রকাশ ছিল তাঁর কথায়, শিল্পীর স্বাধীনতা নিয়ে যে উৎকণ্ঠার, তার চিহ্ন কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের জগৎ থেকে আজও একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি।

তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যেই ছিল দিলীপকুমারের এই শঙ্কার ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথের গানে সুনির্দিষ্ট সুরকাঠামোর জন্য তিনি নিজেও যেমন বাধা বোধ করতেন, তেমনি বাধা তিনি দেখেছিলেন তাঁর সমকালীন আরও কোনো কোনো শিল্পীর মধ্যে। শোনা যায়, রাধিকামোহন মৈত্রের কাছে শুনেওছিলাম একবার, 'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়' গানটিকে তানবিস্তারে গেয়ে শুনিয়েছিলেন জ্ঞান গোঁসাই, কিন্তু রেকর্ড করবার অনুমতি পাননি তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে। আর সেইজন্যেই না কি নজরুলকে অনুরূপ সুরে একটা গান বেঁধে দিতে বলেছিলেন তিনি, রচিত সেই গান তিনি নিজের মতো করেও গেয়েওছিলেন 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয় ফিরে

আয় ফিরে আয়', রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে কোনোদিন আর উৎসাহ হয়নি তাঁর। এ কি কোনো ভবিষ্যতের ইঙ্গিত নয়? আর, এ উদাহরণ কোনো একক উদাহরণও নয়, এ-রকমই বার বার ঘটছিল বলে দিলীপকুমার এক সময়ে দরবার করছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে, জানতে চাইছিলেন কেন তাঁর গানে থাকবে না কোনো ইম্প্রভাইজেশনের স্বাধীনতা। 'আমাদের গানের যারা রূপকার—performer—তাঁরা সুরকারকে—composerকে এতটুকু লঙ্ঘন করলেও,পান থেকে চুনটি খসলেও, 'মহতী বিনষ্টিঃ' এইরকমই রবীন্দ্রনাথ ভাবেন বলে দিলীপকুমারের অভিযোগ। কিন্তু ওস্তাদি গানের দীর্ঘজীবিতার একটা প্রধান কারণ কি এই নয় যে সেখানে রূপকারের সেই স্বাধীনতা আছে—সুরকারকে লঙ্ঘন করবার স্বাধীনতা? রূপকারও তাঁর কণ্ঠে তখন সুরসৃষ্টি করে তুলতে পারেন সৃষ্টির আনন্দে, সৃষ্টির সেই আনন্দ বা শক্তিকে দিলীপকুমার নাম দেন সুরবিহার, improvisation। এই সুরবিহারে কি গানের ঐশ্বর্য বাড়ে না? এই হলো দিলীপকুমারের প্রশ্ন। সেইসঙ্গে আরও এক প্রশ্ন এই যে, এই সুরবিহারে কি রূপকার—performer নিজেকে অনেকখানি প্রকাশ করতে পারেন না?

দিলীপকুমার রায় বা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুরবিষয়ক বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ অনেকসময়ে এমন মন্তব্য করেন যাতে মনে হয় তাঁদের কোনো কোনো কথা মেনেই নিচ্ছেন তিনি। যেমন এই সুরবিহারের প্রশ্নে। দিলীপকুমারকে উত্তরে বলছেন তিনি : 'এ-ও আমি ভালোবাসি। এতে যে গুণী ছাড়া পায় তা-ও মানি। আমার অনেক গান আছে যাতে গুণী এ-রকম ছাড়া পেতে পারেন অনেকখানি।' কিন্তু ঠিক তার পরেই জিজ্ঞাসা করছেন রবীন্দ্রনাথ : 'কতখানি ছাড়া দেব? আর কাকে?' এ-জিজ্ঞাসা উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ছাড়া দেবার কথাটা হয়ে যায় অবান্তর। কেননা গুণের বিচারটা খুবই আপেক্ষিক। কেইবা করবেন তার বিচার, আর কীভাবেই বা ঘটবে সেটা?

'কাকে' আর 'কতখানি'র ওই সংশয়টা যদি না-ও উঠত, তাহলেও কি বলা যেত রবীন্দ্রনাথ এখানে দিলীপকুমারের মত মেনে নিচ্ছেন তত্ত্বগতভাবে? অর্থাৎ, বাংলা গানে সুরবিহারের ধারণায় তাঁর অনাস্থা নেই, কিন্তু যোগ্য রূপকার মিলবে না বলেই সেই বিহারে তাঁর আপত্তি—এইভাবে কি বলতে পারতাম আমরা? মনে হয় না·তাও। এইজন্যে মনে হয় না যে ওই কথাগুলির একটু পরেই তিনি বলবেন সাহানা দেবীর গায়নের উদাহরণ। 'গায়ককে খানিকটা স্বাধীনতা তো দিতেই হবে, না দিয়ে গতি কী?' এখানে 'স্বাধীনতা' শব্দে ঠিক কতদূর বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সাহানা দেবীর নামোচ্চারণে তা বুঝতে পারি। বলেন তিনি, 'সাহানার মুখে যখন আমার গান শুনতাম তখন কি আমি শুধু আপনাকেই শুনতাম? না তো। সাহানাকেও শুনতাম—বলতে হ'ত—আমার গান সাহানা গাইছে।' গায়কে গায়কে এক্সপ্রেশনের ভেদ থাকবেই, থাকবে ইন্টারপ্রেটেশনের স্বাধীনতা, বলেন তিনি। এই এক্সপ্রেশন, এই ইন্টারপ্রেটেশন-এর ভিন্নতা বা স্বাধীনতা আমরা পেয়েই যাই সুবিনয় রায় বা দেবব্রত বিশ্বাসের গাওয়া গানে, সুচিত্রা মিত্র বা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে। তারও চেয়ে বেশি কিছু কি বলছিলেন রবীন্দ্রনাথ? 'আমি যা ভেবে অমুক সুর দিয়েছি তোমাকে গাইবার সময়ে সেই ভাবেই ভাবিত হতে হবে' এটা যে তিনি চাননি তা বলেই দেন রবীন্দ্রনাথ। ইন্টারপ্রেটেশনের স্বাধীনতা বলতে

তিনি বুঝেছিলেন স্বরোচ্চারণের গায়নভঙ্গিমা, বুঝেছিলেন গায়কের নিজস্ব উপলব্ধির মধ্য দিয়ে বাণীর অন্তর্গত বোধের উন্মোচন। আর দিলীপকুমার চেয়েছিলেন সুর সঞ্চারণের বিস্তারভঙ্গিমা, বুঝেছিলেন গায়কের নিজস্ব আনন্দের মধ্য দিয়ে সুরের অন্তর্গত ঐশ্বর্যের উন্মোচন।

ধূর্জটিপ্রসাদের ঝোঁক ছিল হিন্দুস্থানি সংগীতের বিশিষ্টতার দিকে; রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক বাংলা গানের বিশিষ্টতায়; আর, মুখে বারবার বাংলা গানের কথা বললেও, দিলীপকুমারের ঝোঁক এ-দুয়ের মধ্যবর্তী এক স্তরে। আর সেইজন্যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তর্ককালে হয়তো তিনি সবসময়ে লক্ষ করেন না যে রূপকারের স্বাধীনতার কথা বলতে গিয়ে যখন ওস্তাদি গানের কথা তোলেন তিনি, তখন আবদুল করিম জোহরা বাই মোতি বাই সুরেন্দ্র মজুমদারের মতো গুণীদের তিনি কিন্তু 'রূপকার' না বলে 'সুরস্রষ্টা'ই বলেন। অর্থাৎ, প্রকারান্তরে, তিনি চান রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রেও রূপকারই হয়ে উঠুন সুরকার। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একথা মেনে নেওয়া যে শক্ত ছিল তা নিশ্চয় বুঝতে পারি আমরা, কেননা রবীন্দ্রনাথতো কয়েকটি রাগরাগিণীর সৃষ্টি করেননি, তিনি সৃষ্টি করেছিলেন গান।

কিন্তু, কাকে বলে গান?

২

দিলীপকুমার রায়ের কাছে লেখা একখানা চিঠিতে (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮) রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন চমকলাগানো জোরলাগানো দুটোমাত্র শব্দে : 'মত বদলিয়েছি'। এক ঝোঁকে অনেকখানি লিখে যাবার পর, পরিবর্তিত মতের অনেকখানি ব্যাখ্যানের পর, সে-চিঠির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ শুরু হয়েছিল আবার সেই স্পষ্ট আর জোরালো স্বীকারোক্তিতে : 'মত বদলিয়েছি। কতবার বদলিয়েছি তার ঠিক নেই।'

অভিজ্ঞতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের পুরোনো ধারণাগুলিকে নতুনভাবে যাচাই করে দেখতেই হয় অনেকসময়ে, সেভাবে দেখাই মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে সংগত, সেভাবে দেখাই সজীব আর সচল মনের পরিচয়। তাই, কোনো বিষয়ে যদি বহুবার মত বদলিয়ে থাকেন রবীন্দ্রনাথ, আর তা স্বীকার করে নেবার সাহসও যদি থাকে তাঁর, তাহলে কেবল এই বোঝা যায় যে তিনি নিজেকে কেবলই প্রসারিত করে নিতে জানেন। এই প্রবণতা তাঁর ছিল বলেই কোনো এক প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেছিলেন যে তাঁর 'গ্রেটেস্ট ভাইস' হলো 'ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্সি' আর তাঁর 'গ্রেটেস্ট ভার্চু'ও হলো সেই একই 'ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্সি'।

কিন্তু এখানেও কি তেমন কোনো ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্সি কাজ করছিল রবীন্দ্রনাথের ভাবনায়? কোন্ মতটা এখানে কীভাবে তিনি পালটালেন? এখানে যে বদলের কথা আছে তা যে রবীন্দ্রনাথ আপনা থেকেই লিখেছিলেন তা নয়, লিখেছিলেন দিলীপকুমারেরই এক জিজ্ঞাসার উত্তরে। দিলীপকুমারের মনে হয়েছিল 'জীবনস্মৃতি'তে (১৯১২) একদিন রবীন্দ্রনাথ গান বিষয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন, ১৯৩৮ সালে পৌঁছে নিশ্চয় আর তিনি মানেন না সেটা, নিশ্চয় এখন আর তিনি বলবেন না 'সুর কেন কথার

দাস হবে?' সুরকে এখন নিশ্চয় কথার চেয়ে অনেক বড়ো বলে আর ভাবেন না তিনি? সুরের তৃষ্ণাকেই 'সর্বেসর্বা' করে দেখা ঠিক নয়—দিলীপকুমার বলছেন তাঁর 'সাঙ্গীতিকী'র ভূমিকায়, বলছেন : 'সুরে কিছু খোয়াতেও সে রাজি—যদি কথা সুরের মিলনে সমৃদ্ধতর আনন্দ পায়।' আর এইখানেই দিলীপকুমার তোলেন রবীন্দ্রনাথের মতের প্রসঙ্গ, বলেন : 'সুরের আনন্দ এত স্নিগ্ধ এত সুন্দর যে যখন সে অভিভূতি আনে তখন একথা ভুলিয়ে দেয়' অর্থাৎ ভুলিয়ে দেয় যে কথা আর সুরের মিলনেই সমৃদ্ধতর আনন্দ। রবীন্দ্রনাথও সাময়িক ভাবে তা ভুলেছিলেন বলেই 'জীবনস্মৃতি'তে গান বিষয়ে ভুল মন্তব্য করেছিলেন তিনি, দিলীপকুমার ভাবেন। তিনি অবশ্য এও জানেন যে এখন আর এ মত মানেন না রবীন্দ্রনাথ, আর তাই তাঁর পরিবর্তিত মত সকলের সামনে নতুন করে জানিয়ে দেওয়া উচিত। 'জীবনস্মৃতি'র কথাই যে তাঁর শেষ কথা নয়, দিলীপকুমার তা বোঝেন। অন্য সকলেরও কি বুঝতে হবে না সেটা? 'কবি তাঁর সে প্রাগৈতিহাসিক মত বদলিয়েছেন, কিন্তু এটা আজ স্পষ্ট ক'রে বলা অত্যন্ত দরকার' একথা কবিকে তিনি লিখেছিলেন এক চিঠিতে, আর তারই ত্বরিত উত্তরে রবীন্দ্রনাথ জানান : 'মত বদলিয়েছি। কতবার বদলিয়েছি তার ঠিক নেই।'

কিন্তু সত্যিই কি খুব বড়ো রকমের কোনো মতবদলের ইতিহাস আছে এখানে? কথা আর সুরের মিলনে যে সমৃদ্ধতর আনন্দ আছে, রবীন্দ্রনাথেরই কাছে একাধিক যুগে আমরা শুনেছি এই কথা। সেকথা কি সাময়িকভাবে ভুলে গিয়েছিলেন তিনি?

মতবদলের ওই স্বীকারোক্তিতে ঠিক কী বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, প্রথমে তার একটা পরিচয় নেওয়া যাক। ১৯৩৮ সালের ওই চিঠিতে বলেছেন তিনি যে হিন্দুস্থানি কালোয়াতিকে তিনি তারিফ করেন, তার রসভোগ থেকে বঞ্চিত হতে চান না, কিন্তু খাঁচার পাখির মতো কেবল সেই বুলি আউড়ে গেলে সংগীতের মুক্তি নেই। চাই নবসৃষ্টির পথ, গণ্ডিভাঙা নবজীবনের পথ। বাংলাদেশে সে-পথের দিশা ছিল পদাবলীর গানে, যেখানে সেই পদাবলী তার গীতকলাকে সঙ্গিনী করে জাগিয়ে তুলেছিল। সুর হবে কথার সঙ্গিনী। এই যুগলমিলনেই সংগীতের সার্থকতা।

মতবদলে পাওয়া গেল তাহলে দুটো কথা। বাংলা গান হিন্দুস্থানি কালোয়াতিতে বাঁধা থাকবে, এটা চান না রবীন্দ্রনাথ (কবেই বা চেয়েছিলেন?), তিনি চান গানের মুক্তি (কবেই বা চাননি?)। মুক্তি আছে সেইখানে, যেখানে কথা আর সুরের সুষম এক মিলন আছে।

'জীবনস্মৃতি'তে কি তবে এর উলটো কোনো কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ? মতবদলের কথা যখন উঠেছে, তখন বুঝতে হবে দিলীপকুমারের এই অনুযোগ রবীন্দ্রনাথও মানেন যে একদিন তিনি পোষকতা করেছেন এর বিপরীত কোনো মতের। কিন্তু কী ছিল 'জীবনস্মৃতি'র সেই মত?

'জীবনস্মৃতি'র 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' নামের পরিচ্ছেদটি অবশ্য শুরু হয়েছিল অন্য একটা মতবদলের কথায়। বেশ স্বচ্ছভাবেই সেখানে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ : 'যে মতটিকে তখন এত স্পর্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলাম সে মতটি যে সত্য নয়, সে কথা আজ স্বীকার করিব। গীতকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে।

গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহনমাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো, বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে?' বোঝা যায়, 'গান' এ-বাক্যগুলিতে 'সুর' শব্দের সমার্থক, 'বাক্য' যেমন 'কথা'র। রবীন্দ্রনাথ এখানে নিশ্চয় বলতে চান : কথার দাসত্ব করবে না সুর। এ পর্যন্ত সহজ। কিন্তু সেইসঙ্গে কি এখানে এও তিনি বলতে চান যে সুরের দাসত্ব করবে কথা? অর্থাৎ, সুর এত প্রবল হয়ে উঠবে যে কথার কোনো মর্যাদা থাকবে না আর? যেমনটা ঘটে হিন্দুস্থানি কালোয়াতিতে? একথাই যদি রবীন্দ্রনাথ বলে থাকেন 'জীবনস্মৃতি'তে তাহলে দিলীপকুমারের কাছে তাঁর মতবদলের কথাটা অনেকখানি গুরুত্ব পায় ঠিকই। কিন্তু সত্যি কি তা বলেছিলেন তিনি?

'কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহনমাত্র'—'জীবনস্মৃতি'র এই বাক্যটিকে যদি সমস্ত প্রসঙ্গ থেকে বিচ্যুত করে নিয়ে দেখি, তাহলে অবশ্য 'বাহনমাত্র' শব্দটির চাপে ধরে নেওয়া যায় কথার ভূমিকা অনেক গৌণ হয়ে এল, কথা আর সুরের মিলনের কোনো ভাবনা এখানে নেই। কিন্তু, 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ'র সমস্ত বিশ্লেষণটা কি ঠিক সেই কথাই বলে? 'রাগিণী যেখানে শুদ্ধমাত্র স্বররূপেই আমাদের চিত্তকে অপরূপভাবে জাগ্রত করিতে পারে সেইখানেই সংগীতের উৎকর্ষ', আর বাংলাদেশে বহুকাল থেকেই কথার আধিপত্য বেশি, একথাও অবশ্য বলা আছে 'জীবনস্মৃতি'তে। কিন্তু সেই একইসঙ্গে আছে এই কথাও যে 'আমাদের দেশে স্ত্রী যেমন স্বামীর অধীনতা স্বীকার করিয়াই স্বামীর উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে, এ দেশে গানও তেমনি বাক্যের অনুবর্তন করিবার ভার লইয়া বাক্যকে ছাড়াইয়া যায়।' এখানে কি কথা আর সুরের সঙ্গীসম্পর্কের কথাই বলা হলো না, স্বামী-স্ত্রীর উপমানের মধ্য দিয়ে? সুর যে একইসঙ্গে অধীন এবং অতিক্রমী, বলা হলো না কি সেই কথা?

নিজেরই একটি গান লেখার অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি'র ওই অধ্যায়ে। গুন গুন করতে করতে একটা লাইন যখন লিখলেন তিনি, তখনই দেখলেন 'সুর যে জায়গায় কথাটা উড়াইয়া লইয়া গেল, কথা আপনি সেখানে পায়ে হাঁটিয়া গিয়া পৌঁছিতে পারিত না।' ছোটোবেলায় শুনেছিলেন একটা গান 'তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে', আর সেই গানের ওই একটিমাত্র পদ 'মনে এমন একটা অপরূপ চিত্র আঁকিয়া দিয়াছিল যে, আজও ওই লাইনটা আমার মনে গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়'। লক্ষ করতে আমরা নিশ্চয় ভুলব না যে কুড়ি লাইনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার ব্যবহার করলেন 'অপরূপ' শব্দটা, শুদ্ধ স্বররূপে রাগিণী আমাদের চিত্তকে 'অপরূপভাবে' জাগিয়ে তুলেছিল, আর গানের একটা পদ 'অপরূপ' ছবি এঁকে দিল মনে। এই অপরূপতায়, সুরগুঞ্জনের সঙ্গে ভেসে এল নতুন এক লাইন 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।' আমাদের অতিপরিচিত এই গানটির সৃষ্টি-ইতিহাস বলতে গিয়ে আরও একবার—পাঁচ লাইনের মধ্যেই আরও একবার—প্রয়োগ করতে হলো তাঁকে 'অপরূপ', বলতে হলো 'ওই সুরের মন্ত্রগুণে বিদেশিনীর এক অপরূপ মূর্তি মনে জাগিয়া উঠিল। আমার মন বলিতে লাগিল আমাদের এই জগতের মধ্যে একটি কোন্ বিদেশিনী আনাগোনা করে, কোন্ রহস্যসিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপরে

তাহার বাড়ি, তাহাকেই শারদপ্রাতে মাধবীরাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই, হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পাতিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কখনো-বা শুনিয়াছি। সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ববিমোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে আমার গানের সুর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং আমি কহিলাম—ভুবন ভ্রমিয়া শেষে/এসেছি তোমারি দেশে/আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী।'

এই বর্ণনায় এসে, 'রহস্যসিন্ধুর পরপারে' পৌঁছবার এই অভিজ্ঞতায় এসে বোঝা যায় কেন রবীন্দ্রনাথ এ-অধ্যায়ের সূচনার দিকে লিখেছেন 'বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ'। কথাটা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে কারও মনে পড়তে পারে আধুনিক এক ভাবুক জর্জ স্টেইনারের 'Silence and the Poet' প্রবন্ধের (১৯৬৬) তুলনীয় একটি লাইন : Where the word of the poet ceases, a great light begins। ঠিক একই কথা কি হলো? 'বাক্য' শব্দটি গানের বাণীকেই বোঝাচ্ছে বলে ও-দুই উক্তির প্রথমাংশ যে একইরকম তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু দ্বিতীয়াংশ? স্টেইনার বলেছেন আলোর কথা, আর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'সেইখানে গানের আরম্ভ'। দুটো কি ভিন্ন কথা নয়? ভিন্ন যে নয়, সেটা বুঝবার জন্য দিলীপকুমারেরই সঙ্গে তাঁর ভিন্ন-এক আলাপচারি থেকে খানিকটা টুকরো মনে করা যাক এখানে : 'গানে যে আলো মনের মধ্যে বিছিয়ে যায় তার মধ্যে আছে এই দিব্যবোধ যে, যা পাবার নয় তাকেই পেলাম আপন করে নতুন করে' (৯ জুন ১৯৩৮)। এই আলোয় এই গানে পৌঁছতে হলে কি শব্দকে বর্জন করতে হবে? তুচ্ছ করতে হবে শব্দকে? তা কখনো নয়। শব্দের ভিতরকার নিঃশব্দকে জাগিয়ে তোলে সুর, কথা আর সুরের সেই ওতপ্রোত মিলনেরই কথা বলা ছিল 'জীবনস্মৃতি'র অভিজ্ঞতায়। তা যদি না হতো, তাহলে রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারতেন না তাঁর নিজেরই গানের লাইন, বিশেষত 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে'র মতো কথাবিশিষ্ট লাইন; তা যদি না হতো তাহলে তিনি এখানে সাক্ষ্য হিসেবে আনতে পারতেন না বাউলগানেরও প্রসঙ্গ।

তাই মনে হয়, 'জীবনস্মৃতি'র পর্বে সুরের তৃষ্ণাকেই 'সর্বেসর্বা' করে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ, দিলীপকুমারের এ অনুমান যথার্থ ছিল না। সে-পর্বেও কথা আর সুরের মিলনের কথা ভোলেননি কবি, 'মত বদলিয়েছি'র মতো অতখানি উচ্চকিত স্বীকারোক্তি তাঁর না করলেও হয়তো চলত। এ স্বীকারোক্তির চারমাস আগেও (৬ অক্টোবর ১৯৩৭) ধূর্জটিপ্রসাদকে তিনি লিখেছেন 'কথাও সুরকে বেগ দেয়, সুরও কথাকে বেগ দেয়, উভয়ের মধ্যে আদান প্রদানের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে', সতেরো বছর আগেও (আমাদের সংগীত, ১৩২৮) বলেছেন 'সংগীতের সঙ্গে বাণীর মিলন সাধনই এখন আমার প্রধান সাধনা হয়ে উঠেছে।' কিংবা, অত দূরেই বা যেতে হবে কেন, 'তীর্থঙ্কর'-এর মধ্যে দিলীপকুমার নিজেই ধরে রেখেছেন ১৯২৬ সালে কবির সঙ্গে তার কথোপকথন, তারও মধ্যে তো রবীন্দ্রনাথ বলছিলেন তাঁকে : 'কীর্তনে বাঙালির গানে সঙ্গীত ও কাব্যের যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, বাঙালির অন্য সাধারণ গানেও তাই।' আর এ অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে, কথা-সুরের মিলনে, সমৃদ্ধতর আনন্দ তৈরি করবার জন্য 'সুরে কিছু খোয়াতেও সে রাজি'—'সাঙ্গীতিকী'র ভূমিকায় (১৯৩৮) একথা লিখবার সময়ে দিলীপকুমার

হয়তো ভুলে যাচ্ছিলেন যে এর অনেক আগেই (১৯২১) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : '...বাংলাদেশে কাব্যের সহযোগে সংগীতের যে বিকাশ হচ্ছে, সে একটি অপরূপ জিনিস হয়ে উঠবে। তাতে রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা থাকবে না, যেমন কীর্তনে তা নেই; অর্থাৎ গানের জাত রক্ষা হবে না, নিয়মের স্খলন হতে থাকবে, কেননা তাকে বাণীর দাবিমেনে চলতে হবে। কিন্তু এমনতরো পরিণয়ে পরস্পরের মন জোগাবার জন্যে উভয় পক্ষেরই নিজের জিদ কিছু কিছু না ছাড়লে মিলন সুন্দর হয় না।' দিলীপকুমারের 'কিছু খোয়াতেও সে রাজি'র সঙ্গে একথার তো দূরত্ব কিছু নেই।

সুর আর কথার অঙ্গাঙ্গি মিলনের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় তাহলে তেমন কোনো দোলাচল আমরা লক্ষ করি না। কেবল, সে-ভাবনার প্রকাশের সময়ে কখনো হয়তো সুরকে সামনে রেখেছেন তিনি, কখনো কথাকে। 'জীবনস্মৃতি'র লাইনকটির মধ্যে কথাকে অগ্রাহ্য না করেও সুরকে অগ্রাধিকার দেওয়া, কথা থেকে সুরের দিকে না এগিয়ে তাঁর আলোচনায় সুর থেকে কথার দিকে এগোনো, একেই দিলীপকুমার ভেবেছিলেন কথার অবমাননার অথবা সুরের প্রাধান্যের দিকে ঝোঁক।

কিন্তু সত্যিই যদি থাকত সেই ঝোঁক, তাহলেও কি রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় কোনো বিরোধিতা করা সংগত হতো দিলীপকুমারের পক্ষে? এই দিলীপকুমারই কি অন্য এক তর্কবৈঠকে (৩১ ডিসেম্বর ১৯২৬) রবীন্দ্রনাথকে একথা বলেননি যে 'গানে আমি সুরের আরো ঐশ্বর্য চাই'? সেদিন কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হলো এইখানে যে 'আপনি গানে সুরের যতটা দাবি মানতে রাজি আমি সুরকে তার চেয়ে বড়ো স্থান দিয়ে থাকি।' একেবারে কি উলটে গেল না পুরোনো তর্কটা? স্পষ্টভাবে বুঝে নেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ তখন বলেছিলেন, 'অর্থাৎ নালিশটা এই যে, আমার রচিত অধিকাংশ গানেই আমি সুরকে খর্ব করে কথার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করে থাকি...।' কিন্তু তখনও, এ-নালিশটাকে মেনে নেননি রবীন্দ্রনাথ, বরং বলেছেন যে তাঁর গানের কবিতাগুলিতে 'সেইসব কথা ব্যবহার করেছি সুরের সঙ্গে যারা সমানভাবে আসন ভাগ করে বসবার জন্যেই প্রতীক্ষা করে।' তবু কেন সেই বিশেষ সময়টাতে দিলীপকুমারের মনে হচ্ছিল যে সুরকে অবজ্ঞা করছেন রবীন্দ্রনাথ (অন্য সময়ে যেমন ভেবেছেন, কথাকেই অবজ্ঞা করছেন তিনি)? মনে হচ্ছিল এই কারণে যে রবীন্দ্রসংগীতে ব্যবহৃত সুরকে তিনি দেখছিলেন বড়ো সরল, আর তাই, রিক্ত। এই রিক্ততার বিপরীতে যে ঐশ্বর্য, সুরবিহারে মেলে যে ঐশ্বর্য, তার দিকে দিলীপকুমারের টান। এ-তর্কের সময়ে তিনি হয়তো ততটা লক্ষ করেননি যে ঐশ্বর্যের এই টানই কথাকে অবান্তর করে দিতে পারে অল্পে অল্পে, মন চলে যেতে পারে সুরের কারুকাজে বা মহিমায়, যাকে তিনি নিজে বলেন কম্প্লেক্স স্ট্রাকচার, আর রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন আর্কিটেকচারাল প্যাটার্ন।

৩

প্রথম প্রসঙ্গটিতে এইবার তাহলে ফিরে আসতে পারি আবার। হিন্দুস্থানি সংগীতে কথার তেমন মর্যাদা যে নেই, বাংলা গানের পক্ষে তেমন অবস্থানটাকে বরণীয় বলে ভাবতে পারেন না দিলীপকুমার। কথার গরিমা চাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চাই সুরের

ঐশ্বর্যকে নানা দিকে খেলিয়ে তুলবার সুযোগ, এইরকম তিনি ভাবেন। আর এই ভাবনা থেকেই রবীন্দ্রনাথের গানকে নিজের গলায় তুলে নিতে বাধা বোধ করেন তিনি, এইখানেই তাঁর মনে হয় রূপকারকে গ্রস্ত করে দিচ্ছেন সুরকার, দিলীপকুমারকে রবীন্দ্রনাথ, কেননা রবীন্দ্রনাথ কোনো রূপকারকেই দিতে চান না তেমন কোনো সুযোগ।

বিবেচনার ভুলটা ঘটছিল কোথায়? 'সাঙ্গীতিকী'র এক অধ্যায়ে বাংলা গানের ব্যক্তিস্বরূপের কথা বলেছিলেন দিলীপ। 'নিজের স্বভাবে স্বভাবস্থ' হওয়াকে তাঁর মনে হয়েছিল এই ব্যক্তিস্বরূপ। তাঁর মতে, আধুনিক বাংলা গানের বিচার হবে এই ব্যক্তিস্বরূপ দিয়ে।

কিন্তু গানের সেই ব্যক্তিস্বরূপটা তৈরি হবে কোথায়? দিলীপকুমার ভেবেছিলেন সেটা তৈরি হবে রূপকারের গলায়, আর রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন সেটা তৈরি হয়ে আছে সুরকারের সৃষ্টিতে। যে-কাঠামো গড়ে দিয়েছেন সুরকার, তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে যে-ব্যক্তিস্বরূপ, রূপকার তাকে শুধু প্রাণ দেন তাঁর স্বরের মধ্যে। সে-স্বরে যোগ্য প্রকাশ-আভা না থাকলে স্খলিত হয়ে পড়ে সেই ব্যক্তিস্বরূপ, সে-স্বরে যথার্থ প্রকাশ থাকলে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে সেই ব্যক্তিস্বরূপ : এইরকমই ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাবনা। কেননা রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে বিশেষ কথার ভাব চায় বিশেষ সুরের রেশ, সেই কথা যদি হয় কারও আপন সৃষ্টি তবে তার সুরও জানেন তিনি, সুরেকথায় মিলিয়ে একখানা পূর্ণ গান তিনি ধরে দেন আমাদের সামনে। নিছক সুরটাই তাঁর গান নয়, নিছক কবিতাটাও নয় তাঁর গান, তাঁর গান এ-দুয়ের ওতপ্রোত সম্মিলন। ভিন্ন সুরের যোজনায়; কিংবা সুরবিহারের বিস্তারে, সে হয়ে ওঠে ভিন্ন এক গান, তাকে আর রবীন্দ্রনাথের গান বলা যাবে কেমন করে? কথা আর সুরের পূর্ণ সাযুজ্য চেয়েছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ ভাবতে পেরেছিলেন এভাবে। আর, মাঝে মাঝে সাযুজ্যের কথা বলেও দিলীপকুমারেরা ছিলেন সুরে মজ্জমান, কথাকে চাইছিলেন তাঁরা মূলত সুরবিস্তারেরই বাহন হিসেবে, হিন্দুস্থানি সংগীতের অনুরূপ না হলেও তার অনেকখানি অনুগামীই ছিল বিস্তারের সেই পথ।

দিলীপকুমারের গান

সুধীর চক্রবর্তী

বাংলা গানের ইতিহাসে দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০) একমাত্র গীতিকার-সুরকার-গায়ক, যাঁর ছিল তিনপুরুষের গীতিপরম্পরা। পিতামহ কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন কলাবন্ত গায়ক। 'গীতমঞ্জরী' নামে গানের বইতে তাঁর গান রচনা ও সুরকৃতির উচ্চস্তরের উদাহরণ রয়েছে। পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন যশস্বী গায়ক, গীতিকার ও সুরকার। নাট্যসংগীতে ও হাসির গানে তাঁর দক্ষতা ছিল কিংবদন্তীর মতো প্রসিদ্ধ। সব অর্থেই তিনি ছিলেন কম্পোজার বা সংগীতস্রষ্টা, যেমন কম্পোজার রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ আর দ্বিজেন্দ্রলাল সাবেকি রীতি মেনে রাগরাগিণীর বাঁধা ছকে বাণী ঢালাই করেন নি। বরং গানের বাণীর আভায় সুরের আসনখানি পেতেছিলেন। রাগরাগিণী তাঁরা এড়িয়ে যাননি, পেরিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের রচিত গানের কথা ও সুরে প্রথম আমরা গানের আধুনিকতা ব্যাপারটা বুঝতে শিখি, যে-আধুনিকতার মূলকথা ব্যক্তিতন্ত্র এবং সুরমিশ্রণের সাহস। দেশিবিদেশি সুরকারুর সমন্বয় তাঁদের গানে এমন একটা আলাদা গোত্রচিহ্ন ফুটিয়ে তোলে, যা পরবর্তী বাংলা গানকে সাবালক করে দেয়। দিলীপকুমার রায় পরম্পরাসূত্রে কার্তিকেয়চন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ধারাবাহী কিন্তু তাঁর গানের বনিয়াদ, ধরণ ও চলন একেবারে অন্যরকমের। ঐতিহ্যের চেয়ে ব্যক্তিপ্রতিভা তাঁর গানে অনেক বেশি। তাঁর গায়নরীতি, যাকে 'দৈলীপি ঢং' বলে, বাংলা গানে সম্পূর্ণ নতুন এবং অনুকৃতিবর্জিত। স্বচ্ছন্দ, স্বতোচ্ছল সুরময়তায় আচ্ছন্ন তাঁর গান সাবলীল কিন্তু গায়নের পক্ষে আয়াসসাধ্য। দিলীপকুমারের গান কণ্ঠলাবণ্য ও কণ্ঠবাদনের বিপুল সামর্থ্যে ব্যাপক কিন্তু অন্যের পক্ষে ততটা আয়ত্তাধীন নয়। তিনি ছিলেন সংগীতের সাধক ও তত্ত্বদর্শী। গানের সরণি বেয়ে তাঁর আত্মদর্শনের নানা ধাপ পার-হওয়া, গানের প্রতি ভালবাসা তাঁকে এগিয়ে দেয় ঐশ অনুভূতির গহন আনন্দে। 'তুই গান গেয়ে যা গান গেয়ে যা আজীবন' অতুলপ্রসাদের এমনতর অনুজ্ঞা তাঁর নিজের জীবনে সত্য হয়নি, হয়েছে তাঁর অনুজকল্প সখা দিলীপের জীবনে। 'স্মৃতিচারণ' বইতে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে দিলীপকুমার লেখেন :

> পিতৃদেব সুগায়ক ছিলেন একথা বলা চলে শুধু এই হিসেবে যে, তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল দরাজ ও মধুর। কিন্তু গানে তাঁর গলা অল্প অল্প খেললেও তিনি 'গাইয়ে' বলতে যা বোঝায়—অর্থাৎ সুরের হাওয়ায় উড়ে চলা যার স্বধর্ম—তা তিনি ছিলেন না...। পিতৃদেব স্বধর্মে ছিলেন সুরকার—এবং প্রথম শ্রেণীর সুরকার।

পুত্রের নির্মোহ বিশ্লেষণে পিতার মূল্যনিরূপণ একেবারে নিখুঁত কিন্তু এমনতর মন্তব্য থেকে আমরা একটা অন্য নিগূঢ় ইঙ্গিত খুঁজে নিতে পারি। রবীন্দ্রনাথও সম্ভবত সুরের হাওয়ায় উড়ে চলার পন্থী ছিলেন না, অততা সময়ই বা তাঁর জীবনে ছিল কই? আর

অতুলপ্রসাদ সেন তাঁর তেষট্টি বছরের জীবনে গান লিখেছেন তো মোটে দুশো আটটি, সেটাও কি আজীবন গান-গেয়ে-যাওয়ার আত্মসঙ্কল্পের সঙ্গে মানায়? বাকি থাকলেন দিলীপকুমারের সমসাময়িক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৯৬), হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩), তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৭) এবং কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। এঁদের মধ্যে প্রথম তিনজন পুরোপুরি সৌখিন শিল্পী কিংবা বিনোদনমুখী। নজরুলই এঁদের মধ্যে একমাত্র আদ্যন্ত গানের মানুষ, গানপাগল এবং স্বভাবে উদাসী। গানের হাওয়ায় উড়ে চলা হয়ত নজরুলেরও স্বভাবধর্ম ছিল, তবে তাঁর স্বভাবধর্ম তো ছিল সবকিছুরই হাওয়ায় উড়ে চলা। তাঁর গানের ভ্রমর সৃষ্টির শতদলে বুঁদ হয়ে বসেছিল কবেই বা! তাই তাঁর গান আছে অজস্র, কিন্তু গানের কোনো পরিণতি নেই, তত্ত্ব নেই। সুরের অজস্রতা ও বৈচিত্র্য তাঁর গানে অভাবনীয় কিন্তু নিজস্ব বন্দিশ তাঁর কোন্ গানে—এ প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। আসলে প্রমত্ত সদাচঞ্চল জীবনযাত্রা আর নানাস্থানী জীবিকার টানে নজরুলের গানের সাধনা কোনো ভরকেন্দ্র পায়নি। বিশেষ করে নাট্যসংগীত নিয়ে তাঁর কোনো ভাবনা ছিলনা। তাঁর গান সমসাময়িক বাঙালিকে মাতিয়ে দিয়েছে কিন্তু তাতে সৃজন চিন্তার তেমন গভীরতা আমরা দেখি না। তাঁর গান সমকালে ও পরে, অন্যের কণ্ঠকে আশ্রয় করে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে যে তিরিশের দশকে কলকাতার শ্রোতাদের কাছে নজরুলের গান প্রথম জনপ্রিয় হয়েছিল দিলীপকুমারের গায়নসৌজন্যে।

দিলীপকুমার সারাজীবন ধরে নানাধরণের গান গেয়ে গেছেন। ভজন কীর্তনের পাশাপাশি মৌলিক বাংলা গানের বিচিত্রচারী একরকম সুরকারু আমাদের অভিভূত করে। 'রূপে বর্ণে গন্ধে' বা 'প্রিয় তোমার কাছে যে-হার মানি'-বর্গের আধুনিক গান তাঁর সৃষ্টিস্বভাবের নৈপুণ্য প্রমাণ করে। তবু প্রধানত তিনি বহুরকম গানের গায়ক এবং গানের ভাবুক। এককালে নজরুল ও হিমাংশু দত্তের গান তিনি নিজে গেয়ে প্রচার করেছেন। কলকাতায় অতুলপ্রসাদের গান তাঁর ও সাহানা দেবীর গায়নে প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি পেয়েছে। অতুলপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের গানের স্বরলিপিও তাঁর কৃতি। পরবর্তী সাধক জীবনে নিশিকান্ত দিলীপকুমারের প্রেরণাতেই হয়েছিলেন গীতিকার। তাঁর বাণীতে দৈলীপি সুর এক অসামান্য ফসল। জীবনের প্রৌঢ়ি-পর্বে ইন্দিরা দেবীর লেখা ভজনে দিলীপকুমার সুর দিয়ে প্রাণসঞ্চার করেছেন। ফলে, সর্বত্র এবং সর্বদা গায়ক দিলীপকুমার সামনের সারিতে এসে যান। কিন্তু বাংলাগানের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যে দিলীপকুমার শুধু কি একজন গায়ক? এ-প্রশ্নের জবাবে দিলীপকুমারে রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেব। লিখছেন :

> আমাদের বাংলাদেশে তিনশ্রেণীর গায়ক বহুদিন থেকেই সমাদৃত : কীর্তনীয়া, বাউল ও বৈঠকী গায়ক ওরফে ওস্তাদ বা কালোয়াৎ। আগে কীর্তন বাউল সচরাচর অবজ্ঞাত হত, সম্মান পেতেন ওস্তাদ কালোয়াৎ—ধ্রুপদী ও সঙ্গীতজ্ঞ মহলে খেয়ালী।
>
> ....বাংলায় হিন্দী ঠুংরি গান অল্প-স্বল্প চালু হয় তখন প্রথমদিকে আমি ভেবেছিলাম যে এরি নাম নবসৃষ্টি। সে-সময়ে রবীন্দ্রনাথই আমাকে বুঝিয়ে বলেন—কেন হিন্দী ঠুংরি গায়ককে সুরকার উপাধি দেওয়া যায় না। তিনিই আমাকে নানা যুক্তি দিয়ে

বুঝিয়ে দেন যে, গানে সুরকার হতে হলে সে-গানের মধ্যে সব থেকে আগে থাকা চাই একটি বিশিষ্ট সুরস্বাতন্ত্র্য। আমি প্রথম প্রথম এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করলেও সত্যনিষ্ঠ ছিলাম বলে পরে ভুল স্বীকার করি এ-কথা মেনে যে এমনকি আমাদের এ-যুগের কীর্তনীয়ারাও সুরকার পদবী পেতে পারে না—বাউলরা তো নয়ই—যেহেতু তারা পড়ে পাওয়া সুর শিখেই গেয়ে বেড়াত গ্রামে গ্রামে। পাঁচালী কথকতা জাতীয় গানের বেলায়ও ঐ কথা : নব সুরসৃষ্ট কোনো স্বাতন্ত্র্যই সেসব গানে ফুটে উঠত না।...রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালী, সারি প্রভৃতি গ্রাম্য গানের সুরও নিজের নিজের চলতি খাতেই বয়ে চলত—গানের জাতিধর্মকেই ফুটিয়ে তুলে—সুরবৈশিষ্ট্যকে নয়।

এই বোধ আর বিচারপ্রবণতা দিলীপকুমারকে বরাবর স্বতন্ত্র করে রেখেছে, শুধু গায়ক পরিচয়ে আবদ্ধ রাখেনি। গান গাওয়া তাঁর বিনোদন ছিল না, ছিল চৈতন্যের অংশ। সেইজন্য নানা বর্গের গান গাইতে গাইতে আত্মদর্শন, ভক্তিমার্গ, সুরের নিসর্গ ছুঁয়ে দিলীপকুমারের গান বাংলা গানের ইতিহাসে নিজেকে সনাক্ত করে। শুধু বাঙালি শ্রোতা নয়, রোমা রলাঁ, মহাত্মা গান্ধি বা য়ুরোপীয় অনেক শ্রোতাদের শুশ্রূষা দিয়েছে তাঁর গায়ন। এর কারণ তাঁর গান গাওয়া কেবল সুরের অনায়াস নৃত্য বা তাল লয়ের ছন্দ বা কণ্ঠধ্বনির মাধুর্য নয়, অনেকটাই যেন ইনটেলেক্‌চুয়াল ব্যাপার। গায়কের বোধবুদ্ধি সেখানে প্রধান ভূমিকা নিতো। এর কারণ গান তাঁর কাছে শুধু আউড়ে যাবার বিষয় ছিল না, ছিল তাঁর মানসতার অঙ্গ. যে-মানস বিদ্যার অনুশীলনে ও রসের স্পর্শে উজ্জীবিত এবং নিত্য নিরীক্ষাশীল।

'গানের মধ্যে থাকা চাই সুরস্বাতন্ত্র্য' এমন প্রতীতি যাঁর ছিল তাঁর রচনা সেই সুরস্বাতন্ত্র্যের সন্ধানী হবে এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু দিলীপকুমারের ক্ষেত্রে অনন্য হয়ে উঠেছিল সংগীত সম্পর্কে বংশগত উত্তরাধিকারের সঙ্গে বিদেশী কণ্ঠমার্জনার কৃৎকৌশল। ফলে তাঁর গানের সুররচনা ও গায়কিতে সুরস্বাতন্ত্র্য ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছিল কলানৈপুণ্য ও কণ্ঠকন্ডূতি। এতে তাঁর গান অভিজাত ও বিশিষ্ট হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেইসঙ্গে তাতে জনপ্রিয়তার অনুষঙ্গ কমে গেছে। দিলীপের গান আমাদের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সামগ্রী, অনুপাতে পরবর্তীদের কাছে তেমন অনুকরণীয় বা নবসৃষ্টির ইঙ্গিতবাহী নয়। তাঁর গান যেন তাঁর মতোই নিঃসঙ্গ। বাঙালি সেই গানে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন কিন্তু সে-গান তাঁরা গাইলেন না পরম্পরাগতভাবে।

এমন সব সিদ্ধান্তমূলক মন্তব্য তলিয়ে বুঝতে গেলে আগে দিলীপকুমারের জীবনতথ্য বিশেষ করে সংগীতসাধনার বিবরণ জেনে নেওয়া জরুরি। তাঁর অতি শৈশবে মাত্র ছ'বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়, ফলে সংগীতজ্ঞ পিতার সান্নিধ্য তথা দ্বিজেন্দ্রগীতি তাঁকে গীতিসচেতনতায় প্রথম থেকে সজাগ রেখেছে। লালচাঁদ বড়ালদের অর্থহীন তানবাজি যে প্রকৃত সংগীত নয় একথা তাঁর পিতা তাঁকে ছোটবেলাতেই বুঝিয়ে দেন। অথচ পাশাপাশি পিতামহ কার্তিকেয়চন্দ্রের হিন্দুস্থানী সুরের ছকে বোনা গানের মহত্ত্ব তিনি উপলব্ধি করেন। দ্বিজেন্দ্রগীতির লীলাচপল সুরবিহার এবং ওজঃ গুণ, বাণীপ্রাধান্য ও নাট্যরস তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু বাংলা গানের চেয়ে তাঁর মন মজে যায় হিন্দুস্থানী নানা রকম গানে ও রাগরাগিণীতে। এ সম্পর্কে তাঁর আত্মপক্ষ এই রকম :

হিন্দুস্থানী গানে আমার প্রথম অনুরাগ হয় যার অপরূপ খেয়াল শুনে তিনি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন পিতৃদেবের বিশেষ বন্ধু।...তাঁর বড় সম্পদ ছিল কণ্ঠলাবণ্য। অমন মিষ্ট কণ্ঠ আমি আর শুনিনি ওস্তাদদের মধ্যে।

এই হিন্দুস্থানী খেয়াল দিলীপকুমারের মধ্যে জেঁকে বসে এবং তিনি তানের রসে প্রমত্ত হন। পিতার সতর্কবাণী সত্ত্বেও তানবাজি তাঁকে গ্রস্ত করে। লিখেছেন :

আমি গানের ও বিশেষ করে আমার তানবাজির প্রতিভার জন্যে বহুলোকের কাছে স্তুতি পেয়ে বেশ একটু অহংকারী হয়ে উঠি।...তানবাজির দরুণ আমার মাথা গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাগানে তানের বেশি অবকাশ না পাওয়ার ফলে হিন্দুস্থানী গানে আমার ভক্তি যতই বাড়তে লাগল ততই বাংলাগানে এসে গেল অবজ্ঞা।

বিপত্নীক পিতার সান্নিধ্য ও স্নেহ বাৎসল্যে তাঁর কৈশোর ভরে ওঠে। দ্বিজেন্দ্রলালের উদারপন্থা ও উদাসীস্বভাব দিলীপকুমারের স্বাধীন মনের যথেচ্ছ বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। নানারকমের বই পড়া, তর্ক করা আর বহুতর গানের সংসর্গ তাঁকে সমৃদ্ধ করে। পড়াশুনাতেও ছিলেন মেধাবী। ইত্যবসরে বারো তেরো বছর বয়সে 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' বইটি তাঁকে অধ্যাত্মপথের সংকেত দেয়, যা পরবর্তী জীবনে হবে তাঁর চিরবন্ধু চিরনির্ভর। পিতৃবন্ধু খগেন্দ্রনাথ মিত্রের কণ্ঠে কীর্তন শুনে তিনি সেই গানের ধারায় ব্রতী হন। এ সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিচারণ :

বাংলা কীর্তনের প্রতি আমার শ্রদ্ধাবান্ হবার আদি কারণ পিতৃদেবের কীর্তনানুরাগ হলেও আমি ছেলেবেলায় ওস্তাদি সংগীতের এমনি গোঁড়া ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম যে তাঁর মতামত আমার কাছে প্রামাণ্য হওয়া সত্ত্বেও আমার কীর্তনে এত শীঘ্র রুচি হত না যদি সে-সময়ে খগেনকাকার মিষ্ট কণ্ঠে মধুর কীর্তন না শুনতাম। ...খগেনকাকার মতন বোদ্ধা আমার কণ্ঠের অনুরাগী ছিলেন—এতে আমার কিশোর আত্মাভিমান বেশ একটু নধরকান্তি হয়ে উঠেছিল বৈকি। তাই বেশ খুশি হয়েই ঝুঁকেছিলাম উচ্চাঙ্গ কীর্তন শিখতে। দেখাই যাক না—কীর্তনে কিছু সুরের পাথেয় মেলে কিনা!

কিন্তু ইতিমধ্যে কেটে গেছে তর্কমুখর বেশ ক'বছর।

খগেনকাকার সঙ্গে সে-সময়ে আমি তর্ক করতাম বালসুলভ অজ্ঞানতাবশেই যে, সাহিত্যের দিক থেকে কীর্তন পদাবলীর মূল্য থাকলেও সঙ্গীতের দিক দিয়ে হিন্দুস্থানী ওস্তাদি তানালাপের সঙ্গে তুলনাই হয়না।

সতেরো বছর বয়সে দিলীপকুমারের পিতৃবিয়োগ হয়। মাতুলালয়ের স্নেহাশ্রয়ে থেকে তাঁর বিদ্যা ও গানচর্চা স্ফূরিত হতে থাকে। ১৯১৮ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গণিতে প্রথমশ্রেণীর সাম্মানিক হয়ে পড়তে যান কেম্ব্রিজে। কিন্তু এরই ফাঁকে :

বি. এসসি পাশ করে গণেশ দাস ও রেবতীমোহন সেনের অপূর্ব কীর্তন শুনে অভিভূত হয়ে যখন উচ্চাঙ্গ কীর্তনে তালিম নেব ঠিক করি, তখন খগেনকাকাই আমাকে নিয়ে যান তাঁর গুরু নবদ্বীপ ব্রজবাসী মহাশয়ের কাছে। ...তাঁর কাছে উচ্চাঙ্গের কীর্তন শিখতে না শিখতে আমি বুঝতে পারি কীর্তনের মহিমা...আমি

দেখতে পাই যে, ওস্তাদি সঙ্গীতের সুখবিলাস আমাদের অন্তরে খানিকটা আবেশ জাগালেও সে-আবেশ স্থায়ী হতে পারেনা এই জন্যে যে সে কিছুতেই ভুলতে পারেনা যে সমঝদার শ্রোতার সাড়া তার চাইই চাই। কিন্তু ভজনকীর্তনের বেলায় গুণী রূপান্তরিত হন পরম ভাগবতে।...ফের মনের সেই দোলা সুরু হল : তবে ওস্তাদি গান শেখা কি ছেড়ে দেব?

কিন্তু তাও তো পারি না। শেষে ঠিক করলাম—উপস্থিত সময়কে ভাগাভাগি করে শ্যাম কুল দুইই রাখি—কীর্তনও শিখি, ওস্তাদি গানও শিখি। তারপরে দেখা যাবে।

এমত সংকল্প থেকে তাঁর খেয়াল শেখা সুরু হল বেহালার বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে, আর টপ্পা চন্দননগরের রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে।

গানের সেই মগ্ন জগৎ থেকে তিনি অবসৃত হলেন ১৯১৯ সালে বিলাতে যেতে হল বলে। এবারে তাঁর সামনে উদ্‌ভাসিত হল গানের এক মহাবিশ্ব—প্রতীচ্য সংগীত। দিলীপকুমার খুব নৈমিত্তিক ভঙ্গীতে লিখেছেন :

বিলেতে—মানে ইংলণ্ডে ছিলাম প্রায় দু'বৎসর। এরমধ্যে প্রায় দেড় বৎসর কাটিয়েছি কেম্ব্রিজে, বাকি সময়টা কখনো লণ্ডনে, কখনো নানা রম্যস্থানে, কখনো প্যারিসে, সুইজার্লণ্ডে, হল্যাণ্ডে, রাইন উপত্যকায়। তৃতীয় বৎসরে যাই বার্লিনে গান ও জার্মান ভাষা শিখতে। তারপরে লুসানো, ভিয়েনা, প্রাগ, বুদাপেস্ত প্রভৃতি নানা শহর নিমন্ত্রিত হয়ে গান গেয়ে ও গানের সম্বন্ধে বক্তৃতাদি দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি ১৯২২-এর শেষে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর য়ুরোপে ভ্রাম্যমাণ হয়ে।

কথাগুলি যত অনায়াসে উচ্চারণ করেছেন দিলীপকুমার কাজটা তত সহজ ছিল না। প্রতীচ্যের শ্রোতাদের সামনে ভারতীয় রাগদারী গান পরিবেশন, এমনকি বাংলা গান বিশেষত অত তরুণ বয়সে বেশ দুঃসাহসী প্রয়াস। শুধু তো গান শোনানো নয়, বক্তৃতা দিয়ে বিশ্লেষণ করে তার বিশেষ সাংগীতিক ধরণ বুঝিয়ে দেওয়া। ভাষাশিক্ষার স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে তিনি আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন ফরাসি ও জর্মান ভাষা। সে ভাষায় বাংলাগান অনুবাদ করে শোনাতেন। মেধাবী যুবক কেম্ব্রিজে গণিতশাস্ত্রে ট্রাইপসের প্রথম ভাগ (১৯১৯) এবং পাশ্চাত্যসংগীতে প্রথম ভাগ উত্তীর্ণ হন। জর্মানি ও ইতালিতে গিয়ে পাশ্চাত্ত্যপন্থায় স্বরক্ষেপ ও কণ্ঠ মার্জনাতেও তাঁর সিদ্ধি আসে। লেখাপড়া শিখতে বিলেত যান, কিন্তু ফিরে আসেন একেবারে গানের মানুষ হয়ে। সুভাষচন্দ্র বসুর মতো রুচিমান ও দেশপ্রেমী সহপাঠীর সান্নিধ্য প্রবাসে তাঁকে আরও পরিশীলিত করে। জাতীয়তাবাদী চারণ দ্বিজেন্দ্রলালের সন্তান দেশে ফেরেন স্বদেশের গানের জাগৃতির স্বপ্ন নিয়ে। তেইশ বছরের উচ্চাশাসম্পন্ন সাহসী তরুণ গান শুনিয়ে দেন রোমা রলাঁকে তাঁর বাড়ি গিয়ে। কী গান? মালকোষ রাগে 'রাঙা করে রাঙা কমল রাঙা পায়'। গান শুনে রলাঁ মন্তব্য করেন :

দিলীপকুমার আমাকে সুন্দর দুটি গান শোনালেন—শুনলে অভিভূত হতে হয় বৈকি। গানটির সুরবিহার থেকে ঝড়ে পড়ছে উম্মাদনা, মিনতি, করুণা—মনকে চমকে দেয়। কখনো কণ্ঠ তারসপ্তক থেকে অবতরণ করে মন্দ্র সপ্তকে, তারপরেই আবার ফিরে আরোহণ করে পুলকোচ্ছ্বাসের স্তরে।

শুধু রলাঁ নয়, পরে বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে গান শোনান তিনি। গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ, শ্রী অরবিন্দ, সকলকেই তাঁর গান নাড়া দেয়। সতেজ গায়কী, আত্মনিবিষ্ট, কলানিপুণ ও সমর্থ সেই রচনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান শুনে চিঠিতে লিখেছিলেন—

> তোমার সুকণ্ঠে হিন্দি, গৌড়ীয় এবং কীর্তন বাউল ধারার ত্রিবেণী সঙ্গম হয়েছে— এর প্রভাবের চিন্তা করে আমার মন আনন্দিত।

রলাঁ এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দিলীপকুমারের বেশ কিছু পত্রবিনিময় ঘটেছিল সংগীতের উদ্দেশ্য আর তত্ত্ব নিয়ে। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রবল মতভেদ হয়, বিশেষত রবীন্দ্রসংগীতের গায়নে শিল্পীর স্বাধীনতা প্রসঙ্গে। দিলীপকুমার চেয়েছিলেন ভারতীয় গানের প্রচল অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের গানেও তান ও সুরবিহারের স্বচ্ছন্দতা আনতে। রবীন্দ্রনাথ তাতে সায় দেননি। তাঁদের দু-জনের পত্রবিতর্ক বেশ স্বাদু ও উপভোগ্য। দিলীপকুমারের বক্তব্য ছিল :

তিনি রবীন্দ্রনাথের গানের 'সুরে একটা অনড় রূপ বজায় রাখার বিরোধী'। তাঁর দাবি : রবীন্দ্রসংগীতের 'গায়ককে গানের সুরের Variation করবার স্বাধীনতা দিতে হবে'। তার কারণ 'ভারতীয় গানের ধারায় শিল্পী চিরকাল কমবেশি স্বাধীনতা পেয়ে এসেছেন।' তাছাড়া কবিতার মতো গানেরও একটা আবেদন আছে। সেই আবেদন অনুযায়ী গায়ক যদি সুরবিহার করেন তাতে আপত্তি কোথায়?

রবীন্দ্রনাথের আত্মপক্ষ :

> তাই বলে কি বলতে চাও যে, আমার গান যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনিভাবে গাইবে?...হিন্দুস্থানী সংগীতকার, তাঁদের সুরের মধ্যেকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটা যে চেয়েছিলেন। তাই কোনা দরবারী কানাড়ার খেয়াল সাদমাটাভাবে গেয়ে গেলে সেটা নেড়া-নেড়া না শুনিয়েই পারে না। কারণ, দরবারী কানাড়া তানালাপের সঙ্গেই গেয়, সাদা-মাটাভাবে গেয় নয়। কিন্তু আমার গানে তো আমি সেরকম ফাঁক রাখি নি যে, সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।

দিলীপকুমার-এর জবাবে বলতে চান : রবীন্দ্রসংগীতে তান দেওয়া অসমীচীন কিনা তা 'ফলেন পরিচীয়তে'। কেউ যদি রবীন্দ্রসংগীতে তানালাপ দিয়ে গেয়ে দেখিয়ে দেন তার সৌন্দর্য তবে 'সত্যের খাতিরে স্বীকার করে নিতেই হবে যে, হিন্দুস্থানী ও বাংলা গানের মধ্যে যে একটা অনপনেয় গণ্ডি আপনি টানতে চান' তা থাকবে না। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রয়োগজ্ঞান আবশ্যিক।

আসলে গানের রূপায়ণ বিষয়ে ঐ বিতর্কের সময়ে দিলীপকুমার ছিলেন হিন্দুস্থানী গানের পন্থী। তাই তাঁর ধারণা ছিল 'গানের মূল কাঠামোটা বজায় রেখে...ইচ্ছামত স্বরবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে' রবীন্দ্রনাথের গানকে 'একটা নতুন সৌন্দর্যে গরীয়ান' করে তোলা যায়। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি জেনে তিনি লেখেন : 'আপনি এতে করে বাজে শিল্পীর দ্বারা আপনার গানের caricature নিবারণ করতে পারবেন না' এবং

'মনে হয় না যে, আপনি শুধু ইচ্ছা করলেই আপনার মৌলিক সুর হুবহু বজায় থেকে যাবে।'

রবীন্দ্রনাথের গানে কথা ও সুরের সামঞ্জস্য নিয়েও তাঁর মনে খটকা ছিল। তাই তিনি স্পষ্টভাবে লিখেছেন :

> ১. আপনি যেমন সুরের পক্ষে কথাকে ছাড়িয়ে যাওয়াটা অপরাধ বলে মনে করেন, আমিও তেমনি কথার পক্ষে সুরকে দাবিয়ে রাখার দোষ দেখাতে চাই এইমাত্র।
>
> ২. আমার মনে হয় আপনি গানে সুরের যতটা দাবি মানতে রাজি, আমি সুরকে তারচেয়ে বড়ো স্থান দিয়ে থাকি। এটা শুধু আমার তর্কের খাতিরে বলা নয়—এ নিয়ে আমি সত্য সত্যই যাকে বলে এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করতে করতে নিত্য নূতন আলো পাচ্ছি বলে মনে করি। কাজেই আমার এই অনুভূতিকে কেমন করে অস্বীকার করি?

এসব মন্তব্য কেবল সংগীত সমালোচনা নয়, একজন অগ্রজ স্রষ্টার কাজকে আরেকজন অনুজ স্রষ্টার বোঝবার প্রয়াস। সে প্রয়াস আসলে নিজেরই পথ কাটার জন্য। রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা গানের ধরণ কেমন হবে তা নিয়ে দিলীপকুমারের আবেগ আর আকুতির ক্ষান্তি ছিল না। তাঁর প্রশ্ন ছিল :

> আমি কেবল বলি এই কথা যে, আর-এক শ্রেণীর বাংলা গান কেন সৃষ্টি করা অসম্ভব হবেই হবে যার মধ্যে হিন্দুস্থানী সংগীতের, সম্পূর্ণ না হোক, অনেকখানি সৌন্দর্য আমদানি করা চলবে? আমার সম্প্রতি অতুলপ্রসাদ সেনের কতকগুলি গান শুনে আরও বেশ করে মনে হয়েছে যে, এটা শুধু সম্ভব তাই নয়, এটা হবেই।

অতুলপ্রসাদের প্রসঙ্গে দিলীপকুমারের নাম বাংলা গানের ইতিহাসে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। ১৯২২ সালে বিলেত থেকে দেশে ফিরে দিলীপকুমার সারাদেশ ঢুঁড়তে থাকেন ভাল গান আর কলাবন্তদের সন্ধানে। ভ্রাম্যমাণ এই সংগীতপিপাসু সিদ্ধান্ত করেন : 'আমি প্রায় সারা ভারত খুঁজে এত কম ভাল গায়কের গান শুনেছি যে, ভাবলে মনটা বিস্ময়ে ও আক্ষেপে অভিভূত না হয়েই পারে না।' এর থেকে তাঁর অনুসিদ্ধান্ত : 'আমাদের সঙ্গীতের অবস্থা আজ মুমূর্ষু—অশিক্ষিত পেশাদারের হাতে সঙ্গীতের সহস্রদল যে প্রস্ফুটিত হতে পারে না, এ সত্যটি সম্বন্ধে সচেতন না হলে আমাদের সঙ্গীতের মুক্তি নেই।' এইরকম এক মানসবেদনার দিনে ১৯২৩ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে গিয়ে তিনি পেয়ে গেলেন অতুলপ্রসাদ ও ধূর্জটিপ্রসাদের সংসর্গ ও বন্ধুতা। ধূর্জটি সম্পর্কে দিলীপকুমার সকৃতজ্ঞ মন্তব্য করেছেন :

> ১৯২২ থেকে ১৯২৮ ও আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়।...১৯২৮-এ আমার পণ্ডিচেরি যাওয়ার পর থেকেই ওর সঙ্গে আমার খানিকটা ব্যবধান মতন আসে, প্রধানত আমার ধর্মজীবনের সঙ্গে ওর কোন দরদের যোগ ছিল না ব'লে। কিন্তু ১৯২২ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত আমার সঙ্গীত-জীবনের বিকাশে ধূর্জটির উৎসাহ, সমালোচনা ও দরদী প্রেরণা আমাকে চলার পথে আনন্দ পাথেয় দিয়েছে অঢেল।...আজো মনে পড়ে আমার মুখে নিত্যনতুন খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি ও বাঙলা গান শুনে ওর উচ্ছ্বাস, আমার হলক তান, মিড় গমক ও সূক্ষ্ম খোঁচ শুনে ওর মহোৎসাহে মাথা নাড়া।

অতুলপ্রসাদ সেন দিলীপকুমারের চেয়ে ছাব্বিশ বছরের বড় কিন্তু তিনি ছিলেন দিলীপের 'অতুলদা'। পিতৃবন্ধু, তবু মনের সৌকুমার্য এবং স্বভাবের সারল্যে তিনি হয়ে উঠলেন দিলীপের সখা। এবং :

> অতঃপর যা হবার তাই হল—ভবিতব্য—কিনা আমি অতুলদাকে তথা তাঁর গানকে ভালোবেসে ফেললাম, শুরু করে দিলাম তাঁর গানের প্রচার, আমার নানা কন্‌সার্টে গাওয়ানো আরম্ভ করলাম তাঁর নানা সুন্দর সুন্দর গান আমার ছাত্রছাত্রীকে দিয়ে। অতুলদার গান আমার কাছে ঠিক সময়েই এসেছিল, কেননা, সে সময়ে আমি নানা ওস্তাদের ও বাঈজির কাছে, বিশেষ করে হিন্দি ঠুংরিতেই তালিম নিচ্ছিলাম। তাই বাংলায় ঠুংরির রস পরিবেশন করে আমি নির্খর্চায় নাম কিনলাম।
>
> 'নির্খর্চায় নাম কিনলাম' বলাটা অবশ্য অত্যুক্তি, কারণ অতুলদার গান প্রচার করতে আমাকে কম খাটতে হয়নি, এমনকি স্বরলিপিও করতে হয়েছিল তাঁর অনেক গানের।

অতুলপ্রসাদের সূত্রেই লক্ষ্ণৌতে দিলীপকুমার শোনেন অচ্ছনবাইয়ের অপরূপ চালের ঠুংরি এবং তাতে মুগ্ধ হয়ে অবিলম্বে 'তাঁর কাছে দিনের পর দিন গিয়ে' অনেকগুলি ঠুংরি শিখে নেন। অচ্ছনবাইয়ের নানা মর্মস্পর্শী মিড়, কম্পন ও সূক্ষ্ম কারুকাজ তাঁকে বিগলিত করে তোলে। এমনতর অলংকৃত গানের প্রেমিক পরে অনিবার্যভাবে একবার রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে লেখেন :

> সব ললিতকলার বিকাশধারাই যে অতিমাত্রায় সরলতার দিকে হবে এমন কথা জোর করে বলা যায় না, কেননা, অনেক শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ললিত সৃষ্টি দেখা যায়, যার মধ্যে একটা complex structure, একটা বৃহৎ সুষমা, একটা সমষ্টিগত মনোজ্ঞ সমাবেশ পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ জবাবে লেখেন :

> আমি গান রচনা করতে করতে, সে গান নিজের কানে শুনতে শুনতেই বুঝেছি যে, দরকার নেই 'প্রভূত' কারুকৌশলের। যথার্থ আনন্দ দেয় রূপের সম্পূর্ণতায়—অতি সূক্ষ্ম অতি সহজ ভঙ্গিমার দ্বারাই সেই সম্পূর্ণতা জেগে ওঠে।

এসব চাপান উতোর থেকে বোঝা যায় সংগীতের অনুভব রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমারের স্বতন্ত্র বর্গে ছিল। দুজনের মতামতই প্রণিধানযোগ্য যেহেতু দুজনেরই সংগীত সৃষ্টি ও ব্যাপক গায়নের অভিজ্ঞতা ছিল। তবে দিলীপকুমার গান গেয়ে দেশে বিদেশে ঘুরেছেন অনেক বেশি, গেয়েছেন বহু রকমের ভারতীয় ও বাংলা গান। তাঁর প্রত্যয় বা অনুভূত সত্যকে তাই উপেক্ষা করা কঠিন। অবশ্য রবীন্দ্র-দিলীপ সংগীত-বিতর্কের ফলে দিলীপকুমার পরবর্তীকালে আর কোনোদিন প্রকাশ্যে রবীন্দ্রসংগীত করেননি, গায়নের স্বাধীনতা পাননি বলে। ফলে তাঁর প্রযত্ন কেন্দ্রীভূত হ'ল অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের গানের প্রচারে। হিমাংশু দত্তের বহু গানের তিনিই প্রথম গায়ক। হরেন চট্টোপাধ্যায়ের মধুর কণ্ঠের গান তিনিই প্রথম রেকর্ড করান। পণ্ডিচেরির আশ্রমিক জীবনে নিশিকান্তকে দিয়ে নানা রূপে ছন্দে গান লিখিয়ে তাতে সুর দিয়ে তিনি বাংলা গানে একটি অন্যতর

স্পন্দ নিয়ে আসেন। আর নিজের গান তো ছিল অজস্র ও বিচিত্র। অপরিমিত ও বিস্ময়কর ছিল তাঁর সৃষ্টি প্রতিভা। বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত, ইংরাজি, ফরাসি ও জর্মান ভাষায় গান লিখে বা অনুবাদ করে তিনি গেয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদের গানের বেশির ভাগ স্বরলিপি দিলীপকুমারের করা। বিদেশে তিনিই ছিলেন ভারতীয় গানের, বিশেষত বাংলগানের, অনন্য ও সুযোগ্য বার্তাবাহী গায়ক। গানের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মসম্পদ তিনি বৃহত্তর বিশ্বে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুদীর্ঘ জীবনে। সাহানা দেবী, উমা বসু ও মঞ্জু গুপ্তের কণ্ঠে তাঁর গান রূপে ছন্দে আনন্দে বর্ণিল হয়েছে। গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও মাধুরী মুখোপাধ্যায়ের গায়নে দিলীপকুমারের গান যথার্থ ঢঙে পরিবেশিত হতে শুনেছি আমরা। কিন্তু দিলীপকুমারের সাংগীতিক কৃতির জন্য প্রাপ্য সম্মান ও স্বীকৃতি বঙ্গবাসী সঠিকভাবে যে দিয়েছে এমন মনে হয় না। সংগীতের এই কিন্নর, সুরসাধক রসবেত্তা ও তাত্ত্বিক কোনো অজ্ঞাত কারণে বরাবর আমাদের সৎ বিবেচনার আড়ালেই রয়ে গেছেন যেন।

দিলীপকুমার সম্পর্কে আমাদের বিস্মরণের একটা বড় কারণ হল তাঁর দীর্ঘ পণ্ডিচেরি প্রবাস। ১৯২২ সালে বিলাত থেকে ফিরে তিনি সারাভারত পরিক্রমা করেন সুরের সন্ধানে, তারই মনোমুগ্ধকর ইতিহাস 'ভ্রাম্যমাণের দিন পঞ্জিকা' (১৯২৪)। তারপর ১৯২৭ সালে আবার ইউরোপ যান। ১৯২৮ সালে তিনি শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর অধ্যাত্মপথের আচার্য মেনে পণ্ডিচেরি চলে যান। ১৯৫০ পর্যন্ত সেখানে থাকেন। জীবনের প্রান্তপর্বের তিরিশ বছর (১৯৫০-১৯৮০) তিনি প্রধানত ছিলেন পুণের হরিকৃষ্ণ মন্দির আশ্রমবাসে। তার মাঝে মাঝে ঘুরতেন দেশে দেশে, ঝলকদর্শন ও মূলত ভক্তিসংগীত শোনার সৌভাগ্য জুটত কারোর কারোর, সংবৃত আসরে বা অভিজাত গৃহে। আমজনতার কাছে, বিশেষত বাংলার সংগীতভুক্ পিপাসু মানুষের কাছে, দিলীপকুমার ছিলেন অপ্রাপণীয় ও সুদূরবর্তী। তাঁর কটি অমূল্য গান রেকর্ড-মাধ্যমে আমরা পেয়ে, শুনে, ধন্য হয়েছি। 'সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবই', 'তোমার আঁধার নিশা', 'ঘুম যাই মা'—এমনতর অনতিপরিমাণ তাঁর রেকর্ড-ধৃত গান আমাদের একমাত্র সঞ্চয়। তার পাশে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে রেকর্ডে গাওয়া তাঁর কণ্ঠে দ্বিজেন্দ্রলালের বেশ কটি গান। তবে দিলীপকুমারের সর্বভারতীয় শ্রোতাদের পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি এম. এস. শুভলক্ষ্মীর গাওয়া দিলীপকুমারের সুরে অনবদ্য মীরার ভজন, যা 'মীরাবাই' চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে তৈরি হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। এ ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন দিলীপকুমার। মীরার গান দিলীপকুমারের সুররচনার ও রাগ-রাগিণী-দক্ষতার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। 'বসো মোরে নয়নন মে' (হাম্বীর), 'হরি আবন কী আওয়াজ' (পিলু), 'ঘনশ্যাম আয়া রি' (মিশ্র বাহার), 'ম্যায়নে চাকর রাখো জি' (বেহাগ খাম্বাজ), 'পগ ঘুঙ্গরু বাঁধ মীরা নাচে রে' (মিশ্র তিলক কামোদ), 'দরশ বিনা দুখন লাগে নয়ন' (দেশ), 'মেরে তো গিরিধর গোপাল' (ঝিঁঝিট), 'য়াদ আওয়ে বৃন্দাবনকী মঙ্গল লীলা' (ভৈরবী)—এমত গানগুলি চিরকালের সম্পদ। ভারতীয় চলচ্চিত্রের গানের ইতিহাসে 'মীরাবাই'-য়ের গীতিসম্ভার এক আলোকস্তম্ভ এবং এই ছবি আমাদের একটি উল্লেখযোগ্য 'মিউজিকাল'। অনেক পরে বাংলা 'মাথুর' চলচ্চিত্রে তিনি সংগীত পরিচালনা করেছিলেন কিন্তু সেই সব গান রেকর্ডে সংরক্ষিত হয়নি।

দীর্ঘকাল প্রবাসজীবন যাপন করলেও মাঝখানে ১৯৩৭ সালে তিনি কলকাতার সাহিত্য-সংস্কৃতির মহলে হঠাৎ চলে আসেন। ১৯২৮ সাল থেকে একাদিক্রমে পণ্ডিচেরির যোগসাধনা গানের জগৎ থেকে দিলীপকে নিষ্ক্রান্ত করেছিল। 'আমার সে-সময়ে বৈরাগ্য প্রবল এবং আশ্রমভক্তি খানিকটা গোঁড়ামির কোঠায় পৌঁচেছিল' লিখছেন তিনি। '১৯৩৭ সালে—পণ্ডিচেরি আশ্রমের সম্বন্ধে একটু একটু করে নিরাশ হতে আরম্ভকরি...গুরুদেবের অমত সত্বেও খানিকটা আবদার ধরেই কলকাতায় চলে আসি...ফেব্রুয়ারিতে।' ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ পাঁচ বছর তাঁর গানের স্বর্ণযুগ এবং তা কলকাতাকে ঘিরে। গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখনীতে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন ঐ পাঁচবছরে দিলীপকুমারের গীতিপ্রয়াসের অনন্যতা, এই বলে যে,

> গান সেদিন ছিল শুধু ধনাঢ্যদের বিলাসমাত্র এবং তার পরিবেশক ছিলেন শুধু ওস্তাদ ও বাইজিদের দল। কোনো ভদ্রসন্তানের যদি গায়ক হবার দুর্মতি দেখা দিত তাহলে তিনি সমাজে হেয় ও অপদার্থ বলেই গণ্য হতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখেরা গান-বাজনার প্রতি সমাজের এই প্রতিকূলতা দূর করতে সচেষ্ট হলেও তা তাঁদের পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের গোষ্ঠী ছাড়িয়ে বেশি দূর ছড়িয়ে যেতে পারেনি। ধনীদের বিলাস-নিকেতন ছাড়া জনজীবনে গানের কোনো স্থানই ছিল না। গানের সঙ্গে জনগণের নাড়ীর যোগ সংস্থাপনে ছিল একজনেরই অনন্য প্রয়াস। দিলীপকুমারই বলতে গেলে মধ্যবিত্তদের ঘরে ঘরে, শিক্ষিত সমাজে গানকে ছড়িয়ে দিলেন এবং ওস্তাদি গানের পাশাপাশি বাংলা গানকেও পাংক্তেয় করে তুললেন বা জাতে ওঠালেন। বাংলা গানের এই অভ্যুদয় এক বিস্ময়কর বৈপ্লবিক ঘটনা। অভিন্নহৃদয় বন্ধু সুভাষচন্দ্র যেমন রাজনৈতিক বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন দিকে দিকে, দিলীপকুমার তেমনি আগুন লাগালেন গানে গানে। 'অগ্নিলীলার সঞ্জীবনী বিলাই সকলখানে' এই যেন তাঁর জীবনের ব্রত।

প্রাক্-পণ্ডিচেরি পর্বে তাঁর নিজের গান বড় একটা গাইতেন না দিলীপকুমার। তখন অন্যের গান প্রচার করা ছিল তাঁর নেশা। এ ব্যাপারে তাঁর সহযোগী ছিলেন সাহানা দেবী। রবীন্দ্রসান্নিধ্যে সাহানা গায়িকা হিসাবে যশস্বী ছিলেন। তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান আলাদা স্ফূর্তি পেত। দিলীপকুমারের শিক্ষায় সাহানার গান অলংকরণে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছিল। বাংলা গানের পরিবেশে নতুনতর চিন্তা এবং সুরের বনিয়াদ গড়বার জন্য তিনি অর্থব্যয় করতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি। বঙ্গজনের সংগীতরুচি উন্নত করবার জন্য তিনি নিজের খরচে বাংলায় নিয়ে এসে গান শোনান আব্দুল করিম খাঁ ও শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরদের। মাসোহারা দিয়ে অনুজ রবীন্দ্রলাল ও হেমেন্দ্রলালকে লক্ষ্ণৌর মরিস কলেজে পাঠান হিন্দুস্থানী গান শিখতে। ১৯৩৭ সালে কলকাতায় এসে তাঁর দুটি প্রাপ্তি হল। দেখলেন যে কলকাতার সমাজ আগের মতো আর সংগীতছুট নেই। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, হিমাংশু দত্ত ও শচীনদেব বর্মন তৈরি করে তুলেছেন উন্নত মানের বাংলা গানের আবহ। দিলীপকুমারের কৃষ্ণনাগরিক বন্ধু সুগায়ক হরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁকে সন্ধান দিলেন উমা বসু নামে তাঁর নিজের এক গুণবতী ছাত্রীর। উমা বসুর কণ্ঠ শুনে দিলীপকুমার উজ্জিয়ে উঠলেন। তৈরি হতে লাগল গানের পর গান। দিলীপকুমারের

সুররচনার সামর্থ্য এবং উমা বসুর স্বতঃস্ফূর্ত গায়ন আধুনিক বাংলা গানকে উত্তরণের পথে যখন স্পষ্টলক্ষ্য করেছে তখন আকস্মিক মৃত্যু শিষ্যাকে ছিনিয়ে নিলো। থমকে গেল গুরুর উচ্ছল অনর্গলিত সুরের ধারা, সৃষ্টির লাবণ্য। ১৯৪২ সালে তাই তিনি পণ্ডিচেরি ফিরে গেলেন আবার।

বস্তুত পণ্ডিচেরি থেকে ১৯৩৭ সালে কলকাতায় এসে দিলীপকুমার গ্রামোফোন রেকর্ডে দু'খানি গান গেয়ে সবাইকে আবেগাপ্লুত করে দেন। প্রথম গান টপ্পা অঙ্গের শ্যামা সংগীত : 'রাঙা জবা কে দিল তোর পায়', দ্বিতীয় গান দ্বিজেন্দ্রলালের কীর্তন-ভঙ্গিম 'ছিল বসি যে কুসুমকাননে'। কলকাতা তথা বাংলার সংগীত শ্রোতাদের সমাজ এই গান দুটিতে একেবারে সম্মোহিত হয়ে যান। সেই থেকে সুরু হয় বাংলা গানে দৈলীপি ঢং এবং দিলীপকুমারের যুগ। এমন মনে হতে পারে যে দিলীপকুমারের প্রথম দু-খানি গানের দু-রকম রীতি—টপ্পা এবং কীর্তন, তাঁর গীতিস্বভাবের সার্থক দ্যোতনা। দিলীপকুমারের কমকণ্ঠ তার পেলব সৌকুমার্যে ও সূক্ষ্ম অন্তর্মগ্ন অলংকরণে টপ্পা ও কীর্তনের চমকপ্রদ এক যৌগ যেন। নবদ্বীপ ব্রজবাসীর কাছে কীর্তন শেখা এবং খগেন মিত্রের কণ্ঠে কীর্তনের শ্রুতিজাত অভিজ্ঞতা এবারে নতুন রসসম্পদে স্পৃষ্ট হয়ে বাঙালি শ্রোতার কানে অমৃতবর্ষণ করল। প্রথম রেকর্ডের বিপণন সফলতাও জনাদর থেকে দিলীপকুমার উৎসাহিত হয়ে দ্বিতীয় রেকর্ড করলেন 'এই পৃথিবীর পথের পরে' এবং 'জ্বলবার মন্ত্র দিলে মোরে'। প্রথম গানটি কোমল মধুর ও শ্রুতিসুখকর, দ্বিতীয়টি ওজস্বী আবেগে স্পন্দিত। তাঁর তৃতীয় রেকর্ড, যার দু'পিঠে ধরা আছে চিরন্তন গান 'সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম', বাঙালি শ্রোতাদের পক্ষে যেমন অভিনব তেমনই অতি জনপ্রিয়। এই গানটি শোনেন নি বা শুনে আপ্লুত হননি এমন রুচিমান বাঙালি গীতিরসিক নেই। এতে এমন একটা প্রত্যয় ও বিশ্বাসের ভূমি আছে, আছে নিঃসন্দিগ্ধ ভক্তিরস এবং কীর্তনের অনিবার্য আকর্ষণ যে, একেবারেই ভক্তচিত্ত নন, এমন শ্রোতাও এ-গানে দুলে ওঠেন সুর মাধুর্যে, আখরের নিপুণ নির্মাণে এবং গানের নাটকীয় ওঠাপড়ায়। দিলীপকুমার সারাজীবন ধরে যত গান রেকর্ড করেছেন (হায়, তার সংখ্যা বড় স্বল্প) তার সব কটিকে ছাপিয়ে এই বৃন্দাবনের স্মৃতিকাতর গানখানি এখনও সকলের মনে জেগে আছে।

আজীবন গান গেয়ে যাবার গভীর আত্মসংকল্পে আবদ্ধ দিলীপকুমার একদা ১৯৩৭ সালে যখন কলকাতায় পাবলিক কনসার্ট করেন তখন টিকিট কেটে গান শোনার কোনো পূর্ব ইতিহাস ছিল না বঙ্গদেশে। দিলীপকুমার তার পথপ্রদর্শক এবং অল্পায়াসে তাঁর কনসার্টে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে যেত। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে তাঁর গানের সঙ্গে শ্রীমতী রেবা রায়ের নাচও ছিল পরিকল্পনার দিক থেকে সাহসী। 'শনিবারের চিঠি' তার কার্টুন ছেপেছিল—বিষয়টি ছিল সেকালের দিনে এতটাই উত্তেজনাকর। পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সাহায্যকল্পে দিলীপ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে কনসার্ট করেছেন এবং বহু টাকা তুলে দিয়েছেন গুরুপ্রণামী। কিন্তু তাঁর গান আমরা তেমন করে উত্তরাধিকার সূত্রে নিইনি কণ্ঠে, প্রচার করিনি, এর কারণ কি? গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মতে :

> দিলীপকুমার বাংলা গানে যে নতুন সুরের আমেজ আনলেন, তার মধ্যে বিদেশী গন্ধ তত বেশী ছিল না, যত ছিল হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের সৌরভ, নানা ছোট

ছোট অলংকরণের ঝিকিমিকিতে এক তারাভরা আকাশের বিস্ময়। বাংলা গানকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের সমকক্ষ করে তুলতে চেয়েছেন। এনেছেন গমক, মূর্চ্ছনা, আশা, মুড়কি, খরজবদল, তালফের প্রভৃতি নানা চমকপ্রদ বৈচিত্র্য। তাই দৈলীপি ঢঙে গান গাওয়া সহজসাধ্য নয়। তাঁর গান সেইজন্য কোনোদিনই খুব জনপ্রিয় হবে বলে মনে হয় না। বাংলা গানকে জাতে তুলতে গিয়ে সেই অপরাধে তাঁকেই যেন জাতিচ্যুত, একঘরে হতে হয়েছে—এমনই ভাগ্যের বিড়ম্বনা।

আসলে তাঁর গান তেমন যে প্রচার পায়নি তার প্রধান প্রশ্ন প্রচার করবে কে? অর্থাৎ তাঁর গান যথার্থ তানালাপে, স্বরসংস্থানে ও সুরবিহার করে গাইতে সমর্থ কজন? আরেকটি বড় কারণ তাঁর পণ্ডিচেরিবাস। ১৯৪২ সাল থেকে দিলীপকুমার হয়ে গিয়েছিলেন আশ্রমবাসী, ১৯৫০ সাল পর্যন্ত। গুরুর মৃত্যু তাঁকে আশ্রম থেকে চ্যুত করল। শিষ্যদের সহায়তায় নতুন আশ্রম গড়লেন পুণেতে। ১৯৮০ সালে সেখানেই তাঁর প্রয়াণ ঘটে। ততদিনে তিনি অধ্যাত্ম চর্যায় বহুপথ পেরিয়ে পেয়ে গেছেন ভক্তিগানের দিশাসরণি। সচেতনভাবেই শেষ জীবনের দুই দশক ভক্তিগীতি ছাড়া আর কিছু গাইতেন না। ফলে বাঙালির চিত্তে তাঁর গৈরিকশোভিত বৈরাগীমূর্তি চিরস্থায়ী হয়ে গেল। কীর্তনের চেয়ে ভজনেই তাঁর আসক্তি গড়ে উঠল। তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠল অনিবার্য ভক্তবলয়। ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, ঈশ্বরে পরানুরক্তি এই সন্ত সাধককে বিচ্ছিন্ন করে দিল আধুনিক বাংলা গানের বিষয়গত সচল কেন্দ্রভূমি থেকে। গায়ক নয়, স্রষ্টা নয়, সবাই তাঁকে ভাবল সাধক।

১৯৯৭ সালের ২২শে জানুয়ারি দিলীপকুমারের আসন্ন জন্মশতবর্ষের পুণ্য সূচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর জীবন ও গানের নির্মোহ মূল্যনির্ধারণ করতে গেলে আমাদের বুঝে নিতে হবে বাংলা গানের এই দিশারী কী দিয়ে গেছেন। প্রথমেই বলতে হয় যে, দিয়ে গেছেন তাঁর মেধা ও নিত্যনব পরিশীলনের ফসল। সে তো কেবল যন্ত্রবদ্ধ রেকর্ডেই ধরা নেই, কেননা রেকর্ড তাঁর কটাই বা! কিন্তু তাঁর অজস্র বিচিত্র সংগীতসম্পর্কিত রচনা ও স্মৃতিচারণ, তাঁর গান শোনার অমূল্য স্মরণীয়তা এবং গন্ধর্বের মতো তাঁর উজ্জ্বল অস্তিত্বের অস্মিতা আর স্বর্ণকণ্ঠ, বাঙালি কি কোনদিন ভুলতে পারবে? এই বস্তুসর্বস্ব সময়ে, বাস্তবের ত্রাসে শংকিত প্রহরে, লঘু চপল পরিকল্পনাহীন গানের ভাবাবহে, দিলীপকুমারের গান যেন অন্য কোনো বিশ্বাসী জগতের উদ্দীপ্ত জাগরণী, যা শুনলে মনে আসে শমতার বোধ ও আত্মসর্জনের স্বস্তি। তাঁর গানে আমাদের সন্তপ্ত ও দ্বিধান্বিত সময়ের জন্য ভরা আছে শুশ্রূষা ও সান্ত্বনা। কেমন করে সেই দানের গৌরব তিনি অর্জন করলেন তা বোঝার জন্য 'স্মৃতিচারণ' বই থেকে উদ্ধৃতি দেব। লিখেছেন :

> ১৯২৮ সালে আমি যোগজীবন বরণ করি। তারপর লক্ষ্য করি যে, ওস্তাদি সংগীতের অজস্র তানকর্তব ও কণ্ঠের কসরতে আর আমার মন তেমন ভিজে উঠছে না। এমন সময় একদিন আবদুল করিম খাঁ এলেন পণ্ডিচেরি। তিন চার দিন গাইলেন তিনি...। এ কী ব্যাপার? প্রশ্ন করল আমার প্রবীণ মন। ...আবদুল করিমের কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য কালোয়াতি আমার মনে বিস্ময় জাগালেও এমন কোনো রসাবেশ যোগাতে পারেনি যাতে হৃদয় সাড়া দিতে পারে।...এ অন্তর্বিপ্লবের জন্যে অবশ্য সব আগে

দায়িত্ব আমার ইষ্ট—যাঁর গুণকীর্তনে আমি ক্রমশঃ গভীর আনন্দ পাবার সঙ্গে দেখি যে, তার সঙ্গে ওস্তাদি সঙ্গীতের আনন্দের তুলনাই হয় না...

এই সময়েই আমি রচনা করি 'বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবি'—অন্তরে তাঁর বাঁশি শুনে, প্রাণে মনে তাঁর স্পর্শ পেয়ে।...এই সময়ে আমি পেলাম আমার একটি মূল জিজ্ঞাসার উত্তর : যে, সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে গায়ক কৃতার্থ হয়ে ওঠেন তখনই যখন সে-সঙ্গীত আমাদের প্রাণ-মন অন্তরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাঁর পানে। প্রাণের ও গানের এই পরম প্রিয়তম প্রথমদিকে আমাদের সৌন্দর্যবোধের মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ করলেও এ-বোধের গভীরায়মান লগ্নে আমাদের কণ্ঠকে গাওয়ান : 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে'।

ওস্তাদি গানের সুখবিলাস আমাদের অন্তরে খানিকটা আবেশ জাগালেও সে-আবেশ স্থায়ী হতে পারে না এই জন্যে যে সে কিছুতেই ভুলতে পারে না যে সমঝদার শ্রোতার সাড়া তার চাইই চাই। কিন্তু ভজনকীর্তনের বেলায় গুণী রূপান্তরিত হন পরম ভাগবতে।

দিলীপকুমারের আত্মমূল্যনির্ধারণ একেবারে যথাযথ। গানের সরণি বেয়ে অবশেষে এমন চেতনার কূলে তিনি পৌঁচেছেন। তাঁর গান তাই তেমন করে অনুসরিত বা প্রসারিত হয়নি বলে, আমরা তাঁর গানের যথার্থ সমাদর করিনি বলে, তাঁর অন্তর্লীন চৈত্যপুরুষের (Phychic being) কোনো ক্ষোভ ছিল না। কারণ তিনি নির্দ্বিধভাবে জানতেন : 'ওরা গানে চায় রাগিণীবিলাস, আমি চাই তব চরণতীর'। তাই বলে দিলীপকুমারের বিগ্রহ বাঙালির কাছে যে হয়ে রইল গেরুয়াধারী বৈরাগ্যপন্থীর সেটাই কি ঠিক?

এই জায়গাটায় এসে অনেকে হিসাবে ভুল করে বসেন। ভাবেন, দিলীপকুমার যদি পণ্ডিচেরির যোগজীবন বা হরিকৃষ্ণ মন্দিরের সাধকজীবন বরণ না করতেন তবে বাংলা গান অন্য নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ হত। এটা ঠিকই যে রবীন্দ্রোত্তর কালে আধুনিক বাংলা গানের ক্ষেত্রে আর যাঁরা স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছন যেমন নজরুল, হিমাংশু দত্ত, ভীষ্মদেব, জ্ঞান গোঁসাই, শচীনদেব বর্মন, সুধীরলাল, সতীনাথ, সলিল চৌধুরী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, সুধীন দাসগুপ্ত—তাঁদের সকলের চেয়ে সাংগীতিক সামর্থ্যের বিচারে দিলীপকুমার ছিলেন অনেক উঁচু মানের স্রষ্টা। কিন্তু তাঁর গান প্রধানত ভক্তিমার্গকে ঘিরে ধাবিত হয়েছে বলে আমাদের জীবনের দৈনন্দিনে তেমন ব্যবহৃত হয়নি। ভক্তিপথকে নানাকারণে আমরা সাম্প্রতিক জীবনের চলার পথে একটা অত্যজ্য বা অবশ্যম্ভাবী সূত্র বলে ভাবিনা। সেই কারণেও হয়ত দিলীপকুমারের ভজন বা কীর্তন আমাদের প্রণিধানের বিষয় নয়। কিন্তু বোঝা দরকার যে, আশ্রমিক পর্বেও দিলীপকুমার ছিলেন বাংলাগানের অবিরল সাধক ও স্রষ্টা। সুররচনার নিরীক্ষা কখনও তাঁর থামেনি কেবল নতুন নতুন পথে বাঁক নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া তথ্য দেখা যেতে পারে। তিনি বলেছেন,

আমরা ভুলে যাই যে দিলীপকুমার সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী হয়ে সংগীতের জগৎ থেকে নিজেকে নির্বাসিত করেননি কোনোদিন। গানই ছিল তাঁর প্রাণ। পণ্ডিচেরী গিয়ে সে গানই হয়ে উঠল বন্দন আরাধন, যোগ সাধনারই অপরিহার্য অঙ্গ,

অন্তর্বিকাশের অভ্রান্ত রাজপথ। যোগ সাধনায় দীক্ষা প্রার্থী হয়ে যখন তিনি শ্রী অরবিন্দের চরণাশ্রয় ভিক্ষা করলেন, গুরু তাঁকে সর্তক করে দিয়ে বলেছিলেন, 'এ-যোগের পথে পা বাড়াতে হলে সব ছাড়তে হবে, তুমি কি তাতে রাজি?' উত্তরে দিলীপকুমারের আকুল জিজ্ঞাসা : 'গানও কি ছাড়তে হবে?' শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, 'প্রয়োজন হলে তাও ছাড়তে হবে।' দিলীপকুমার দ্বিধায় পড়লেন। অবশ্য শেষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন তিনি। সর্বত্যাগের প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যোগে দীক্ষা নিলেন। কিন্তু গুরু শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন তাঁর এই শিষ্যটির সাধনপথের বিকাশ ঘটবে গানের মাধ্যমে, কাব্যের অনুশীলনেই। তাই নিজে হাতে ধরে শেখালেন ইংরেজি নানা ছন্দ, নিরন্তর পরিবর্তন, পরিবর্জন, পরিমার্জন করে দিতে লাগলেন তাঁর নানাবিধ কবিতা রচনার প্রাথমিক প্রয়াসকে। 'সমস্ত জীবনই যোগ' এই উদার মহাবাণীর যিনি উদ্‌গাতা তাঁর আশ্রয়ে তাই দিলীপকুমারের দ্রুত বিকাশ ও রূপান্তর ঘটতে লাগল সংগীত ও কাব্যের স্বধর্ম অনুসরণ করেই।

পণ্ডিচেরিতে তাঁর গানের মাধ্যমে যোগ সাধনা স্ফূর্তি পেল দুই প্রতিভার সান্নিধ্যে। একজন সাহানা দেবী, আর একজন কবি নিশিকান্ত। সাহানা আর দিলীপকুমার আশ্রমকে সুরমূর্চ্ছনায় ভরিয়ে দিলেন। তাঁদের দুজনেরই গায়ন প্রতিভা ছিল প্রথমশ্রেণীর। আশ্রমিক পর্বের আগে সাহানার ঘটেছিল রবীন্দ্রসংগীতে দীক্ষা দিনেন্দ্রনাথের প্রয়াসে। রবীন্দ্রনাথ ভালবাসতেন সাহানার কণ্ঠে তাঁর গানের রূপায়ণ। এবারে দিলীপকুমারের সান্নিধ্যে তাঁর কণ্ঠে রূপ পেল দৈলিপী গান ও অতুলপ্রসাদের গান। অন্যদিকে কবি নিশিকান্তকে দিলীপকুমার বানালেন গীতিকার। তাঁর লেখনীতে ভক্তিগীতির একটা স্বতন্ত্র স্বাদ আমরা পেলাম। নানারকম গানের ধরণ, তালফের ও লঘুগুরু উচ্চারণের ঢং দিলীপকুমার নিশিকান্তের সামনে রেখে তাঁকে বলতেন সেইভাবে বাণী রচনা করতে। এই কাজটি নিশিকান্ত আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারতেন। তাঁরও ছিল রাবীন্দ্রিক এক পরম্পরা, কারণ পণ্ডিচেরিতে আসবার আগে তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমে। সেখানে রবীন্দ্রসান্নিধ্যে স্ফুট হয়েছিল তাঁর কবিতার জগৎ। সে-কবিতা নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত, স্বচ্ছ সাবলীল ও স্বাবলম্বী। তাঁর গানের বাণী সেই কারণে রবীন্দ্রোত্তর ধরণ নিতে পেরেছিল অনায়াসে। দুটি উদাহরণ পেশ করছি :

১. এ দেশের দিক্‌দিগন্ত নীল অনন্তে
আপন-হারা।
এখানে তৃণের কানে
সমীরণ কোন্ সুদূরের
অমল সুরের মন্ত্র আনে
সবুজের মর্মে ফোটে
শুভ্র সুনীল ফুলের তারা।

২. এ যে কোন্ কর্মনাশা গানের ভ্রমর
মর্মেতে মোর বাঁধল বাসা।

সে যে গো দিনে রাতে সকাল সাঁঝে
গান করে আর আমায় গাওয়ায়
থামায় না গান থামে না যে
তারি সেই দূর শুনে মোর মন লাগে না
এ সংসারের কোনোই কাজে—
বুঝি বা বিফল হবে
এই তোমাদের কাজের ভবে
আমার এ-গান গাইতে আসা।

এ-গানদুটি যাঁরা শুনেছেন তাঁরা মনে করতে পারবেন সুরের স্বতঃস্ফূর্ত চলন ও প্রবহমানতা। বাংলা গানের রূপরীতি ভাঙার একটা শক্তি গানদুটির বাণী ও সুরে স্বপ্রকাশ। রবীন্দ্রগীতির প্রধান যে-প্যাটার্ন, অর্থাৎ ধ্রুপদ ধাঁচের স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগের বন্ধন, এখান তার নির্মল মুক্তি। বাংলা গানের ধরণধারণ নিয়ে যাঁরা ভাবতে চান তাঁদের কাছে দিলীপকুমার ও নিশিকান্ত-র অনেক যুগলবন্দি রচনা চিন্তার খোরাক জোগাবে। এই সূত্রে মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদ ইত্যাদির ননারকম গান নিশিকান্তকে দিয়ে দিলীপকুমার তার ধাঁচে নতুন গান তৈরি করিয়ে নিতেন। এমন এক উদাহরণ তাঁর 'গীতশ্রী' নামে স্বরলিপির বই থেকে দেখাচ্ছি :

ভৈরবী-ঠুংরি

হে ক্ষণিকের অতিথি
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া,
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া!
কোন্ অমরার বিরহিনীরে
চাহনি ফিরে,
কার বিষাদের শিশির নীরে
এলে নাহিয়া!
ওগো অকরুণ! কী মায়া জানো
মিলন ছলে বিরহ আনো!
চলেছ পথিক, আলোক-যানে
আঁধার পানে
মন ভুলানোর মোহন তানে
গান গাহিয়া!

এ পরাণের মাধুরী
আজি নিশীথে পড়ে ঝরিয়া—
কারে মিলনের সাথী করিয়া!
কোন্ অলকার শশীরে ধরি,
বাজে বাঁশরী!
সুরে সুরে তার এ-বিভাবরী
গেল ভরিয়া!
হে মনোমোহন! আলোক-তালে
কত জনমের ঘুমে জাগালে!
সফল-স্বপন-শিহর আনি'
দিলে গো বাণী
উজল-গানে জীবনখানি
ঝল-মলিয়া!

রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীর অনুকরণে নিশিকান্তের রচনাটি কৌতূহলপ্রদ। 'গীতশ্রী'-তে এর স্বরলিপি করেছেন সাহানা দেবী। এমনতর বহু গানের নমুনা 'গীতশ্রী'-তে আছে, যা নিশিকান্তের গীতিকার হয়ে ওঠার নানা স্তর ধরে রেখেছে, সেইসঙ্গে ফুটে রয়েছে বাংলা গান নিয়ে দিলীপকুমারের নিরন্ত আগ্রহের দ্যোতনা। তিনি নিজেও অনন্য সুরের আভায় বাণী লিখতেন, তাতে প্রয়োজনে ওজগুণের চমৎকার সমন্বয় থাকত। বিদেশীসুরের ঘন রব ও উদারার গাম্ভীর্য ফুটেছে 'বন্ধন নাশো মন্ত্রবরে' গানটিতে।

আরেকটি দৈলিপী গানের বাণী :

> মন্ত্র জ্বালাও মন্ত্রময়ী! লক্ষ্যহীন নিভৃত্ত প্রাণে
> ক্লান্তে কর দিগ্বিজয়ী তোমার দুঃসাহসের গানে,
> অবিশ্বাসের পাষাণ কারা
> ধ্বংস কর বিশ্বে সারা
> জাগিয়ে তোমার তমোজয়ী জ্যোতির প্লাবন বিজয়তানে—
> অন্ধকারে হিরণ্ময়ী বহ্নিমন্ত্র জ্বালাও প্রাণে।

এই গানে বাণী উচ্চারণে একটা আলাদা জোর লাগে, সুর সেই উদাত্ততার সঙ্গে জোড়া বিদেশি গান গাওয়ার ও স্বরক্ষেপের যে-বিশিষ্ট কৌশল বিদেশে শিক্ষানবিশি পর্বে দিলীপকুমার আয়ত্ত করেছিলেন 'মন্ত্র জ্বালাও' গানে তার প্রয়োগ বিস্ময়কর। পাশাপাশি ফরাসি জাতীয় সংগীত 'লা মার্সেই'-র সুরে বোনা তাঁর গান 'ভারত রাত্রি প্রভাতিল যাত্রী' অসামান্য এক সাংগীতিক পরীক্ষা। অথচ এই বীররসের দৃপ্ত গানের পাশে আমরা যখন 'সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবই' দিলীপকুমারের গায়নে শুনি তখন চমক লাগে তার কোমল আর্দ্র সুষমায়। তাঁর গান প্রধানত বিশ্বাস আর আত্মনিবেদনের সমর্পণে মধুর ও একান্তী। তাই গানের বাণীতে এক্‌ধরণের অন্তরঙ্গতা বা লৌকিক বুলির প্রয়োগ ঘটেছে যা বাংলা ভক্তিগীতিতে বেশ নতুন। যেমন বৃন্দাবনের অবিস্মরণীয় রাধাকৃষ্ণলীলা কথার সত্যতা প্রসঙ্গে তাঁর বাচন :

> ওরা জানে না তাই মানে না
> আমি জানি তাই মানি।
> আমি অন্তরে তোমার বাঁশরী শুনেছি
> তাই বঁধু আমি মানি।

এই বাঁশির ধ্বনি দিলীপকুমারের বেশির ভাগ গানের Leit motif। বাঁশির ধ্বনি শুনে 'আসি আসি করে' তাঁর প্রাণ। এমন অলক্ষ বংশীধরের সঙ্গে ভক্তগীতিকারের সম্পর্কটি অন্যোন্য, তাই শুনি :

> বঁধু! তোমার পানে কি নিতি আমরাই ধাই পথহারা শ্রান্ত
> চঞ্চল উদ্‌ভ্রান্ত?
> তুমিও কি ভালবাসো না?
> নিতি বিছায়ে স্নিগ্ধ ছায়াখানি তব তুমিও কি কাছে আসো না
> যবে আমরা আতপ-ক্লান্ত
> মিছে ঘুরি মরি পথভ্রান্ত?

গানের ভাবাবেগ এত বেশি, সুর এত গভীর ও বিচিত্র যে তুলনায় তাঁর গানের বাণী কিছুটা পুরোনোপন্থী ও দুর্বল মনে হয়। তবু তাঁর গানে বাণীরই জোর বেশি সুরের চেয়ে। ব্যাপারটা সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এইভাবে যে,

> তাঁর সঙ্গে আলোচনায় যতটা বুঝেছি তাতে মনে হয় তিনি কথাকে আঁকড়ে থাকতে চান। কারণ অনুমান করি ভক্তির সেন্টিমেন্ট। ভক্তির সঙ্গে আমার লড়াই নেই,

কারণ ওখানে যুক্তির পাত্তা পাওয়া যায় না। মতের গরমিল থাক, এইটুকু সান্ত্বনা আছে, তিনি সুরকে নতুনভাবে গ্রহণ করেছেন, নতুন রূপে সাজিয়ে তুলেছেন। নব রস-চেতনার তাগিদ আপন সত্তা প্রতিষ্ঠা করেছে, কথার চাপে ধ্বনি কাবু হয়ে যায়নি। গোঁড়ামির অপদৃষ্টি এড়াতে পারলে আমার বিশ্বাস তাঁর দান সুররসিক অস্বীকার করতে পারেন না।

কথাকে আঁকড়ে থাকার কারণ দিলীপকুমারের ভক্তিবাদ। সবাই জানেন, ভক্তির প্রকাশ কেবল সুরে ধরা পড়ে না তাতে চাই ভক্তের হৃদয়মথিত কথার অভিব্যক্তি। তবে সেই কথা বা বাণী, Symbolic যতটা তারচেয়ে বেশিরকম Emotive। তাই শ্যামল, অমল, প্রেমল, মঞ্জুল এমনতর ধ্বনিময় গীতল শব্দ তাঁর গানে ভক্তের বিশ্বাসে অনেকটাই দ্রব। তাঁর বাণীরচনার প্রগল্‌ভতা ও ধ্বনিবাহুল্য দৈলিপী গানকে একটা আলাদা চারিত্র্য দিয়েছে। সুরের দিক থেকে তো সুনিশ্চিত, এমনকি তাঁর গানের বাণীও অভ্রান্তভাবে তার স্রষ্টাকে সনাক্ত করে।

দিলীপকুমার রায়ের সংগীতপ্রতিভা ও প্রয়াসের প্রসঙ্গে এসে পড়ে তার সর্বভারতীয়তারও কথা। বাঙালি গীতিকার-সুরকারদের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে বেশি প্রচার ও প্রসিদ্ধি ঘটেছে দেশে-বিদেশে। তাঁর কারণ তার গান শুধু বাংলা বাণীতে সীমাবদ্ধ নয়। বিশিষ্ট নানা বাংলা গান, তাঁর নিজের ও অন্যদের, হিন্দি, সংস্কৃত, ইংরিজি, জর্মান ও ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করে অথচ মূল সুরকাঠামো বজায় রেখে তিনি পরিবেশন করেছেন বহুবার বহুজন সমক্ষে। প্রধানত তাঁর প্রয়াসে এদেশে প্রচারিত হয়েছে দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের। তবে দিলীপকুমারের প্রধান সুরকাঠামো নিজের গানে নিশ্চয়ই কীর্তন। কীর্তনকে বাংলার নিজস্ব আঙ্গিক বলে প্রথম সনাক্ত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর গানের রূপবন্ধে কীর্তন ও ভাঙা কীর্তনের নানাতর সূক্ষ্ম প্রয়োগকৌশল আমরা পাই। কিন্তু কীর্তন যেন দিলীপকুমারের সবচেয়ে সাবলীল মাধ্যম। কীর্তন নিয়ে বহুরকম পরীক্ষা, আখরের নানা চমৎকার প্রয়োগ তাঁর গানকে সুষমাময় করে তুলেছে। ভক্তিসমর্পিত তাঁর কবিচিত্ত ভক্তিগানের পাশাপাশি সুরান্বিত করে পরিবেশন করে গেছে কতরকমের সংস্কৃত স্তোত্র। তাঁর কণ্ঠে দেবভাষায় গুরুস্তোত্র, শঙ্করাচার্যের ভবানীস্তোত্র, নির্বাণাষ্টক, ভাগবতের গোপীগীত প্রভৃতি চিরায়ত রচনা নতুন রূপ পেয়েছে ভাবানুগ সুর মহিমায়। সেইসঙ্গে নিজেও রচনা করেছেন অনেক সংস্কৃত স্তোত্র এবং গণপতি শর্মার উমাসহস্রম্ থেকে শ্লোক সংকলিত করে বা শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের রচনায় সুর বসিয়ে তার প্রচার করেছেন। এসব গীতসম্ভার বৃহত্তর ভারতীয় শ্রোতাদের কাছে দিলীপকুমারকে পরিচিত করেছে। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতি হল বাংলাদেশে ভজনের সূচনা। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের কাছে তিনি উত্তরভারতীয় ভজন গানের সংবাদ পেয়ে তার অনুসন্ধান করে, তাতে সুর দিয়ে বাঙালি শ্রোতাদের কাছে পরিবেশন করেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রথম প্রয়াস মীরাবাইয়ের 'ম্যয়নে চাকর রাখো জি' এককালে সারাদেশকে উদ্বেলিত করে দেয়। পরে ক্রমে ক্রমে নানক, কবীর, তুলসীদাস, সুরদাস, মীরা প্রভৃতি মধ্যযুগের ভক্তিপথের সন্তদের রচনা তাঁকে নতুন ভাবমার্গ টানে। তিনিও সুরে সুরে সেসব রচনাকে বরণ করে নেন, যার চরমোৎকর্ষ

মীরাবাই ফিল্মে শুভলক্ষ্মীর কণ্ঠলাবণ্যে চিরন্তন হয়ে আছে। কর্ণাটকী শিল্পীর কণ্ঠে উত্তরভারতীয় ভজনের যে-উৎসার তিনি গ্রথিত করে গেছেন তা ভারতীয় সংগীতের একটি স্বর্ণস্তম্ভ। পরবর্তীকালে নিজের রচিত হিন্দি ভজনের সঙ্গে সুর দিয়ে পরিচিত করে গেছেন মহারাষ্ট্রের তুকড়োদাস বা গুজরাটের রৈহান তায়েবজির রচনা। জীবনের শেষ দু'তিন দশক তো শুধুই সুর দিয়ে গেছেন ইন্দিরা দেবীর রচিত বাণীতে। এখন সারাদেশের ভক্তমণ্ডলী তাঁকে মনে রেখেছে দিলীপকুমার রায় বলে নয়, সাধনার জগতে সিদ্ধ এই গায়কের নাম 'দাদাজি'। কিন্তু বাংলায় তিনি দিলীপকুমার। অনর্গলভাষী, সুরসিক, ভক্ত ও অশান্ত গায়ক দিলীপকুমার বিশ্বাস করতেন Art for Divine's Sake তত্ত্বে। তাঁর জীবনস্বপ্ন আর গান একটি বিন্দুতে মিলে গেছে।

দিলীপকুমার রায়ের সুর

সুমন চট্টোপাধ্যায়

সুরকার দিলীপকুমার রায়কে গায়ক দিলীপকুমার রায় থেকে পৃথক করা খুব দুরূহ কাজ। তাঁর বেশীর ভাগ সুর তিনি নিজেই গেয়ে গিয়েছেন। এইখানেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল ইসলাম, হিমাংশু দত্তর সঙ্গে দিলীপকুমার রায়ের সবচেয়ে বড় তফাৎ—সুরকার হিসেবে। তাঁর আগে, তাঁর সময়ে এবং তাঁর পরে আমরা বাংলা কাব্যসংগীত ও আধুনিক গানের যে সুরকারদের পেয়েছি, তাঁদের সৃষ্টিগুলি শ্রোতাদের কানে পৌঁছেছে প্রধানত অন্য কণ্ঠশিল্পীদের মাধ্যমে। দিলীপকুমার ব্যতিক্রম। তাঁর সঙ্গে গ্রামোফোন রেকর্ডে কয়েকজন স্মরণীয় কণ্ঠশিল্পী দ্বৈত কণ্ঠে গেয়েছেন। সেই শিল্পীদের ক্ষমতাও বড় মাপের। কিন্তু দিলীপকুমারের উপস্থিতি, তাঁর দেওয়া তালিম, তাঁর গায়কির বাইরে গিয়ে কোনো সহশিল্পী কাজ করেছেন বলে মনে হয় না। ফলে দিলীপকুমারের গায়নভঙ্গি, গায়ক দিলীপকুমারই প্রাধান্য পেয়েছেন, দ্বৈতকণ্ঠে গাওয়া গানগুলিতেও।

গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রকাশিত গানগুলির বাইরেও দিলীপকুমার রায়ের লেখা ও সুর করা অনেক গান আছে। এগুলির কয়েকটি আমার শোনার সুযোগও হয়েছে। প্রায় সবকটিই তিনি নিজে গেয়ে গিয়েছেন, কেউ হয়তো তাঁকে না জানিয়ে চুপিচুপি রেকর্ড করে নিয়েছেন। বার্দ্ধক্যে পৌঁছেও কণ্ঠের ওপর তাঁর এতটাই দখল ছিল, গাওয়ার আঙ্গিক তিনি এমনই বজায় রেখেছিলেন যে সুরকার-গায়কের অভিন্নতার বৈশিষ্ট্যটি থেকেই গিয়েছে।

অতএব দিলীপকুমারের সুরগুলি নিয়ে আলোচনা করার সময়ে তাঁর গাওয়ার ভঙ্গি একদম এড়িয়ে যাওয়া খুবই কঠিন কাজ। সুখের বিষয় কিছু গানের স্বরলিপি আমি পড়ার সুযোগ পেয়েছি। স্বরলিপি থেকে সুরের কাঠামোটা বুঝে নেওয়া যায়। যদিও নিজে গানগুলি গাইতে গিয়ে দিলীপকুমার থেকে থেকেই সুরবিহারের পথ ধরতেন, স্বরলিপিতে নেই এমন স্বর ও সুরের টুকরো জুড়ে দিতেন। সন্ধানে সতত অস্থির এই শিল্পীকে বাঁধা ছকে বিচার করা দুঃসাধ্য। নিজের ছক তিনি নিজেই ভেঙেছেন, গড়েছেন বারবার। আখর জুড়ে দিয়েছেন। কথার টুকরো নিয়ে খেলায় মেতেছেন। গাওয়ার অপার ক্ষমতা ছিল। তাঁর অত প্রবল ক্ষমতা ও সৃজনশীলতাকে আসরে গাইতে ব'সে বেঁধে রাখা দুষ্কর। তিনি বোধহয় তা চাইতেনও না। নিজেরই একটি সুরকে কতটা বাড়ানো যায়, একই কলির ভেতর থেকে কতরকমের সুরের সম্ভাবনার হদিস নেওয়া যায়, কত রকম ক'রে সুর ও গায়কির পথে নিজের ভাবনা ও ভাবগুলিকে প্রকাশ করা যায়, তারই এক একটি চ্যালেঞ্জ তিনি যেন নিজের দিকেই ছুঁড়ে দিতেন সমানে। চকিতে মোকাবিলা

করতেন তিনি সেই চ্যালেঞ্জের। ফলে দিলীপকুমারের সুরগুলি একদিকে যেমন এক একটি নির্মাণ, অন্যদিকে তেমন এক একটি সম্ভাবনার খনি। এটিও তাঁর সুররচনাশৈলীর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

খতিয়ে দেখলে আমরা হয়তো দিলীপকুমার রায়ের সুরচিন্তায় তিনটি বড় প্রভাব দেখতে পাব : কীর্তন, হিন্দুস্থানী রাগসংগীত ও পাশ্চাত্য সংগীত। তিনি আধুনিক সুরকার। কোনো একটি বিশেষ সংগীতধারা বা প্রভাবের প্রতি আনুগত্য জাহির করা তাঁর স্বভাব ছিল না। বরং একাধিক ধারা, বিভিন্ন উপাদান মেশানোই ছিল তাঁর পছন্দ। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'যদি দিয়েছ বঁধুয়া' গানটি বিবেচনা করা যায়।

হিন্দুস্থানী সংগীতের হিসেবে এই গানে কল্যাণ ঠাটের প্রাধান্য। শুদ্ধ রেখাব, শুদ্ধ গান্ধার, তীব্র মধ্যম, পঞ্চম, শুদ্ধ ধৈবত ও শুদ্ধ নিখাদ—প্রধানত এই স্বরগুলিকে অবলম্বন ক'রেই গানটির সুর বাঁধা হয়েছে। দুএকটি জায়গায় শুদ্ধ মধ্যম যে প্রয়োগ করা হয়েছে, তা কল্যাণ ঠাটের মেজাজ বজায় রেখেই। হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের এই আবহ সত্ত্বেও গানের ধরতাই—এ কিন্তু ঐ সংগীতরীতির আলঙ্কারিকতা পাই না আমরা। পেয়ে যাই তিনটি মাত্র ঐকিক স্বরের সরল প্রয়োগ :

- - সা রে গ গ গ - - - সা রে .....ইত্যাদি।
- - য দি দি য়ে ছ - - - য দি.....

তালের হিসেবে এ-গান প্রথমে আট মাত্রায় বাঁধা হলেও কাহারবার গতানুগতিকতা এতে নেই। আটের বদলে চারমাত্রার ঝোঁক রাখলে তাল উল্টে তো যায়ই না বরং যেন গানের চলন, গতি আরও টানটান হয়ে ওঠে। আজকের যন্ত্রানুষঙ্গের হিসেবে এই গানের জন্য আটমাত্রার চেয়ে চার মাত্রার সঙ্গতই বোধহয় বেশী মানানসই। সঙ্গতের বিচার ছাড়াও শুধু গানের বিচারেও আটের বদলে চারের চালটাই প্রাধান্য পায় অন্তরায়। 'আমি যুগ যুগ আছি পথ চাহিয়া/তুমি এলে যদি মনোরথ বাহিয়া'—এই দুটি সুরের পংক্তিতে চারের ঝোঁকটিকে অবহেলা করার কোনো উপায়ই আর থাকে না। তার পরেই 'আমি যাচিব সাধিব ঊষর জীবনে করুণার বারি'-তে 'আমি'র দুটি মাত্রার পর 'যাচিব', 'সাধিব', 'ঊষর', 'জীবনে' এই চারটি শব্দের প্রত্যেকটিই চার মাত্রায় বাঁধা। চার মাত্রার এই প্রাধান্য হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চেয়ে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ছন্দ-বৈশিষ্ট্যের ইংগিতই বেশী করে দেয়।

সঞ্চারিতে এসে এ-গানে পেয়ে যাই আমরা তাল ফেরতা। আট বা চার থেকে ছয় মাত্রা। এই 'ছয়'ও ঝোঁকের হিসেবে আসলে তিন। তবলা যদি বাজাতেই হয় তো দাদরা তালটিই নিতে হবে। কিন্তু তার প্রভাবে দাদরার ছ'মাত্রার চেয়ে বরং 'ওয়াল্‌ট্‌স্‌' তালের মধ্য লয়ে তিনের ছকটাই যেন এসে পড়তে চায়। দাদরার একটি শ্লথতা আছে। মধ্য লয়েও দাদরায় ছয় মাত্রায় টানটান ভাবটা আসতে চায়না সহজে। এটাই দাদরার বৈশিষ্ট্য। এমনকি দাদরা তালের গানে একটু আড়ে গাওয়ার যে প্রবণতা ও মজা আমাদের বৈঠকী রীতিতে আমরা লক্ষ করে থাকি, সেটি বোধহয় এ-তালের চলনের জন্যই সম্ভব।

কিন্তু দিলীপকুমার রায়ের এই সুরে বাঁধুনি এমন যে আড়ের প্রশ্নই ওঠে না। দাদরার দুলকি চাল শুধু যে রসভঙ্গ করে তাই নয়, রচনার ছন্দটাকে পুরোপুরি ধরতেও পারে না। বরং তিন মাত্রার পরিমিত বাঁধুনিতে চলনের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। 'যদি ভেঙেছ আমার তিমির দুয়ার/জ্বেলেছ সকল আলো/তবে হে যুগসারথী জনমে জনমে/তোমার পিপাসা ঢালো'—এই সঞ্চারি অংশে ঝোঁক অমোঘভাবে পড়ছে, 'যদি' ও 'তবে' এই দুটি শব্দ বাদে প্রতিটি শব্দের প্রথম অক্ষরের ওপর। ফলে তিন মাত্রার ছক এড়ানোর কোনো উপায় নেই। ভারতীয় রীতিতে ছয় মাত্রায় চিন্তা করলে উপযুক্ত ওজন আর বজায় থাকে না। রচনা-আঙ্গিকের টানটান চরিত্রটি হয়ে পড়তে চায় শিথিল। আঙ্গিকের হানি হ'লে রসেও ব্যাঘাত ঘটে। রচনার আঙ্গিকটি লক্ষ করলে, সুর-ছন্দের ওজন বিচার করলে আমরা অবধারিতভাবে পাশ্চাত্যের মধ্য লয় 'ওয়াল্ট্স্' তালটিতে এসে পড়ি।

অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে আবার, হিন্দুস্থানী গানের চেয়ে বরং বাংলার কীর্তনের তালফেরতার দিকটা কানে ধরা পড়ে বেশী। এখানে আমি কীর্তনের সুর বা গায়কির কথা তুলছি না। তুলতে চাইছি কীর্তনের তাল ও ছন্দ বৈচিত্র্যের কাঠামোর কথা। তালফেরতা কীর্তনের একটি অন্যতম কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য। এটিকে আরও স্পষ্ট করে দেখাতেই যেন দিলীপকুমার রায় স্থায়ী ও অন্তরার চার মাত্রা থেকে সঞ্চারিতে প্রথমে তিন মাত্রায় এসে সেই সঞ্চারিটাই আর-একবার রচনা করেছেন সাত মাত্রায়। এ-এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা। প্রচলিত কীর্তনের সুর বা সুরগত আবহ পরিহার করেও তালছন্দের নকশায় কীর্তন-আঙ্গিকের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে দিলীপকুমার আধুনিক রচনাশৈলীর একটি নতুন পাঠ দিলেন যেন।

স্থায়ী ও অন্তরার অথবা অন্তরা ও সঞ্চারির তালফেরতার নজির আধুনিক বাংলা গানে কম হলেও আছে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের ও-রসে মজিয়েছেন। কিন্তু সঞ্চারিতেই পরপর দুটি তালের প্রয়োগ, আধুনিক রচনায় প্রায় অশ্রুতপূর্ব। সুরকার দিলীপকুমার তাঁর এই রচনায় কীর্তনের কাঠামোর একটি বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করলেন কীর্তনের সুরাবহকে পরিহার করেও। আমরা পেয়ে গেলাম আধুনিক সুররচনায় একটি নতুন নির্মাণের খবর।

সঞ্চারির সুরান্তর ও তালান্তরের পর গানটি ফিরে পাচ্ছে আবার তার স্থায়ী ও প্রথম অন্তরার তাল ও চলন। কিন্তু দ্বিতীয় অন্তরা আর সুরের দিক দিয়ে প্রথম অন্তরার পুনরাবৃত্তি নয়। প্রথম অন্তরার প্রথম পংক্তি দাঁড়িয়েছিল গিয়ে তার সপ্তকের ষড়জে। দ্বিতীয় অন্তরার প্রথম পংক্তির প্রথম অংশটি পঞ্চম থেকে শুরু হয়ে চকিতে শুদ্ধ ধৈবত স্পর্শ করে দাঁড়াল শুদ্ধ নিখাদে। ষড়জে দাঁড়ালে যে স্বস্তি, হঠাৎ শুদ্ধ নিখাদে দাঁড়ালে এবং সুরের একটি অংশ ঐ স্বরে শেষ করলে সেই স্বস্তি আর থাকে না। একটা আকস্মিকতার চাপ সৃষ্টি হয় যেন। এই আকস্মিকতা ইচ্ছে করেই আনছেন সুরকার। কারণ, এর পর রচনাটি ষড়জ স্বরটিকে নিপুণভাবে পরিহার করে চলবে মোকাম হিসেবে। দ্বিতীয় অন্তরা থেকে স্থায়ীতে ফেরার পথে ষড়জ বড়জোর স্পর্শস্বর হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে, মোকাম হিসেবে নয়। স্থায়ী ও প্রথম অন্তরায় তার সপ্তকের ষড়জের একাধিক প্রয়োগের ফলে যে অভ্যেস তৈরী হতে চাইছিল, দ্বিতীয় অন্তরায় সুরকার সেটিকেই দিলেন ভেঙে। এইভাবে দিয়ে দিলেন তিনি আর-একটি নতুন খবর। বড়মাপের

সুরস্রষ্টার কাজ এইভাবে একটি রচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরে নতুন নতুন তথ্যের স্বাদ দিয়ে যায়। গতানুগতিকতাকে মাঝে মাঝেই দেয় চুরমার ক'রে। অভ্যেসের জাড্যকে করে অতিক্রম। সন্ধানী শ্রোতা পেয়ে যান নতুন সুররচনার নতুন নির্মাণশৈলী। একটি গানেই দিলীপকুমার রায় দেখিয়ে দেন যে তিনি নিছক সুরকার নন, তিনি একজন আধুনিক কম্পোজার।

আধুনিক সংগীতমানসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ঔদার্য। উনিশ শতক থেকে বাংলার আধুনিক সংগীতকাররা দেশ বিদেশের বিভিন্ন উপাদান বাংলা গান নির্মাণের কাজে লাগিয়ে সেই ঔদার্যের চরম পরিচয় দিয়েছেন। সুরকার ও কম্পোজার দিলীপ-কুমার রায় সেই উদার ঐতিহ্যের অনুগামী। 'সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম' গানটিতে যিনি হিন্দুস্থানী সংগীত ও কীর্তনের মেলবন্ধনপ্রয়াসী, 'ঘুমপাড়ানি'র সুর করতে গিয়ে তিনিই আবার পাশ্চাত্য সঙ্গীতের দ্বারস্থ।

ঘুমপাড়ানি গান বাংলায় বিলক্ষণ ছিল, তবে তার সহজ সরল সুরের রূপটি নিয়ে। 'খোকা ঘুমলো, পাড়া জুড়লোর'র সুরটি যদি একবার স্মরণ করা যায় তো বাংলার নিজস্ব ঘুমপাড়ানি গানের আদলটি আমরা পেয়ে যাব। গানের সুরের উৎস নিয়ে আমাদের দেশে গবেষণামূলক কাজ এত কম হয়েছে যে এই গানের সুরটি কতটা গ্রাম্য, কতটাই বা শহুরে তা নির্দ্বিধায় বলা মুশকিল। তবে, এই ঘুমপাড়ানি সুর যে পুনরাবৃত্তির দৌলতে অন্তত বাঙালীর নিজের সুর হয়ে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই।

দিলীপকুমার রায় কিন্তু তাঁর 'ঘুমপাড়ানি'-তে একটি পৃথক মাত্রা যোগ করেছেন। এই মাত্রাটি সরাসরি পাশ্চাত্য সংগীত থেকে আমদানি করা। কিন্তু পাশ্চাত্যের ঘুমপাড়ানি সুরের যে সারল্য (যা বাংলার ঘুমপাড়ানি সুরের সারল্যেরই দোসর), সেটিকে এই গানে আর পাওয়া যাবে না। কারণ, সহজ সরল সুরের আবহে শুরু হয়েও তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তিতে যথেষ্ট জটিল কারুকাজ এসে পড়ছে। বস্তুত, প্রথম পংক্তিতেই ষড়জ, শুদ্ধ রেখাব, শুদ্ধ গান্ধার ও পঞ্চমের সহজ আবহে তীব্র মধ্যম স্বরটি স্থান পেয়ে গিয়ে এমন এক ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছে যে গুনগুন করে গাইতে গেলেও একটু মুন্সিয়ানা লাগে। সাধারণ ঘুমপাড়ানি সুরে এ-হেন সূক্ষ্মতা থাকে না, থাকে বরং সুরের অতি পরিমিত প্রয়োগ এবং সহজ-সরল ওঠানামা।

দিলীপকুমার রায়ের এই 'ঘুমপাড়ানি' নামাঙ্কিত সুরটি কিন্তু পরিশীলিত গায়কের দাবিদার। তবে কি, শিশুকে ঘুমপাড়ানোর আগে মাকে গলা সাধতে হবে? না, তা নয়। এখানেই এই গানের দ্বৈত ভূমিকা। তীব্র মধ্যম স্বরটিকে সামান্য একটু ছুঁয়ে দিলে, এমনকি বাদ দিয়ে দিলেও ঘুমপাড়ানির আবেদন ক্ষুণ্ণ হবে না। তেমনি স্বরলিপিতে বিভিন্ন স্বর যেভাবে দেখানো রয়েছে, সেভাবে গাইলে 'ঘুমপাড়ানি' একটি পুরোদস্তুর গান হয়ে উঠবে।

এ-গানে দিলীপকুমার তান ও আখরের সংস্থানও রেখে দিয়েছেন। কণ্ঠ সংগীতে তালিম থাকলে, স্বরপরম্পরার ওপর দখল থাকলে এই তান ও আখর যোগ করা দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু তালিম ও দখল আদৌ না থাকলে আবার এই তান গেয়ে দেওয়া প্রায়

অসম্ভব। তবে, তান ও আখর বাদ দিয়েও 'ঘুমপাড়ানি' গাওয়া যেতে পারে। তাতে সুরের মূল আবেদন অটুটই থাকবে।

তান ও আখর কিন্তু দিলীপকুমার রায়ের অন্য কিছু গানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তার মধ্যে অন্যতম, হ'ল 'আলোছায়া আঁকা পাখি।' উমা বসুর সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে গাওয়া এই গান, রেকর্ড-করা বাংলা গানের সম্ভারে এক অনন্য সম্পদ। ছয় মাত্রার চালে বাঁধা এই গানটি কিছুটা দাদরা তালের শিথিল, আড়ের গতি, কিছুটা আবার 'ওয়াল্‌ট্‌স্‌' তালের মাত্রামাফিক সুনির্দিষ্টতার সমন্বয়। দিলীপকুমারের অন্যান্য গানের সঙ্গে এই গানের একটা মূল তফাৎ হ'ল, এটি মধ্য সপ্তকপ্রধান। কিন্তু স্থায়ী ও প্রথম অন্তরার পর যে তান রেকর্ডে আছে, সেটি পুরোদস্তুর বোলতানের অনুরূপ এবং সাপাট তানের গতিতে তার সপ্তকের শুদ্ধ মধ্যম-ছোঁয়া। এই দুটি তাল বাদ দিলে মূল সুরটির অঙ্গহানি হবে। অসম্পূর্ণ থেকে যাবে সুরের যুক্তি। এ-গানের সুরে তান বা বোলতান প্রযুক্ত হয়েছে খেয়ালের বন্দিশের ঢঙে। এই বৈশিষ্ট্যটি দ্বিজেন্দ্রলালের সুরেও আমরা পেয়েছি।

'আলোছায়া আঁকা পাখি'র লিরিক-কাঠামোটি (গীতিকার : নিশিকান্ত) উল্লেখযোগ্য। দু'লাইনের স্থায়ীর পর তিনটি স্তবক। প্রত্যেকটিতে পাঁচটি করে লাইন। আধুনিক বাংলা গানের ধারায় এই পংক্তিভাগ বড় একটা দেখা যায় না। দু'লাইনের পরিমিতির পর পাঁচ লাইনের অন্তরা বা সঞ্চারি আর পরিমিত থাকতে চায় না, বরং একটু ছড়িয়ে পড়তে চায় এদিক ওদিক। দিলীপকুমার সুরের অংশগুলিকে খুব বেশী বিস্তৃত না করে ছোট ছোট তান, মুড়কি, এবং কিছু স্বরের আকস্মিক প্রয়োগের মাধ্যমে যথাসম্ভব পরিমিতই রেখেছেন। পাঁচটি লাইন ধরে মধ্যসপ্তককে প্রাধান্য দেবার পর তিনি সুরের একটি অতিরিক্ত লাইন রচনা করেছেন, যেটি লিরিকে নেই। এই অতিরিক্ত লাইন হল তান। সেই তান প্রতিটি মাত্রায় দুটি করে স্বর ব্যবহার করে একদিকে একটা গতি সঞ্চার করছে, অন্যদিকে তার সপ্তকের শুদ্ধ মধ্যম ছুঁয়ে এসে সুরের পরিসরটিকে দিচ্ছে নিমেষে বাড়িয়ে। ফলে সতের লাইনের গানে সতেরটি লাইনেই মধ্য সপ্তকের মেজাজ থাকা সত্ত্বেও একঘেয়েমি প্রশ্রয় পাচ্ছে না। এখানেই কম্পোজার হিসেবে তাঁর চিন্তার বাহাদুরি। তার সপ্তকের ঐ সংক্ষিপ্ত প্রয়োগের দরুণ মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকের ওজনটিকে আমরা যেন আরও রসিয়ে উপভোগ করার সুযোগ পেলাম।

'আলোছায়া আঁকা পাখি'র আসল চমক কিন্তু গানের একেবারে শেষে। আমাদের পরিচিত অধিকাংশ গান হয় ষড়জ, অথবা গান্ধার অথবা পঞ্চমে শেষ হয়। মধ্যম-জানের কিছু গান মধ্যমেও শেষ হতে শুনি আমরা। যদিও, সপ্তকের হিসেবে পঞ্চম ও ষড়জ এবং ষড়জ ও মধ্যমের সম্পর্ক নিতান্তই আপেক্ষিক। কোনো স্বরকে ষড়জ হিসেবে ধ'রলে আগের ষড়জটি হয়ে যায় মধ্যম। অর্থাৎ কোনো গান হিন্দুস্থানী সংগীতের হিসেবে শুদ্ধ মধ্যমে শেষ হলেও ষড়জ- মধ্যমের সম্পর্কের মধ্যে আমরা আসলে পঞ্চম-ষড়জের সম্পর্কটিকেই পাই। কিন্তু শুদ্ধ নিখাদে কোনো গানের সমাপ্তি খুবই বিরল, ব্যাপার। 'আলোছায়া আঁকা পাখি' শেষ হচ্ছে শুদ্ধ নিখাদে। আরও উল্লেখযোগ্য হল এ-গানের সুরে আমরা কোমল নিখাদ স্বরটিকেই 'স্পর্শ' করে যাই বারবার। গানের একেবারে শেষে শুদ্ধ নিখাদের প্রয়োগ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। এই স্বরে এসে দাঁড়িয়ে

গানটি যেন শেষ মুহূর্তে নিজেকে পাল্টে ফেলে। একটি মাত্র স্বরের ব্যতিক্রম যে কতটা পরিবর্তন ঘটাতে পারে একটি রচনায় তার পরিচয় পেতে হলে এই গানটি শুনতেই হবে।

পরিবর্তন — এই ব্যাপারটি দিলীপকুমার রায়ের সুরচিন্তার ধর্ম যেন। সুর করতে গিয়ে একই গানের দেহে তিনি বারবার পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন। সেই পরিবর্তন কখনও আসছে তালফেরতায়, যার আঙ্গিক ও রস তিনি সংগ্রহ করেছেন কীর্তন থেকে। কখনও বা আসছে তা সুরের চরিত্রের মেজাজে। যেমন 'আজিও তোমারে সাধিতে শিখিনি গানে।' এটি শুরু হচ্ছে নিতান্ত বৈঠকী মেজাজে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আদলে। কিন্তু অন্তরাতেই প্রায় অবিমিশ্র কীর্তন। মধ্যলয় দাদরা থেকে দ্রুত আটমাত্রাই শুধু নয়, সুরের চরিত্রটাই গেল এক-ধাক্কায় পাল্টে। সুর-তাল-মেজাজের পরিবর্তন এ-গানের দেহে এমনই র‍্যাডিকাল যে সঙ্গতের জন্য তবলা ও খোল দুটোই থাকা জরুরী।

একাধিক উপাদান মিশিয়ে দিলীপকুমারের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আর-একটি স্মরণীয় উদাহরণ 'সূর্য'। তিনি নিজেই জানিয়ে গিয়েছেন যে এ গানের সুর 'বিখ্যাত জর্মন সুরকার শুবার্টের রাউশেন্‌ডার স্ত্রোম (Rauschender Strom) গানটি থেকে নেওয়া।'

ধ্রুপদী পাশ্চাত্য সঙ্গীতের একটি প্রধান অঙ্গ হল, 'মেজর' ও 'মাইনর' স্কেলের পারস্পরিক সম্পর্ক। আমাদের দেশের সংগীতের পরিভাষায় বলতে গেলে : কেবলমাত্র শুদ্ধ স্বর সম্বলিত একটি সপ্তকের শুদ্ধ রেখাবকে ষড়জ মেনে আমরা যদি একই স্বর-পরম্পরা অনুসরণ ক'রে একটি নতুন সপ্তম ভেবে নিই তাহলে গান্ধার ও নিখাদ স্বরদুটি কোমল হয়ে যাবে। শুদ্ধ স্বর বিশিষ্ট সপ্তকটি 'মেজর' এবং কোমল স্বরবিশিষ্ট সপ্তকটি 'মাইনর' স্কেলের হিসেবে পড়ে। তেমনি 'মাইনর' স্কেলের কোমল গান্ধারকে ষড়জ মেনে আমরা যদি ঐ সপ্তকের স্বরগুলিকে অপরিবর্তিত রেখে অনুসরণ করি, তাহলে আমারা পেয়ে যাব এমন একটি সম্পর্ক যা'র সব ক'টি স্বর শুদ্ধ। পাশ্চাত্য সংগীতে প্রত্যেক 'মেজর' স্কেলের একটি আপেক্ষিক 'মাইনর' এবং প্রতিটি 'মাইনর' স্কেলের একটি আপেক্ষিক 'মেজর' স্কেল আছে। পাশ্চাত্য সংগীতে সুররচনার ক্ষেত্রে সপ্তকের এই আপেক্ষিকতাকে প্রয়োগ করা হয় ব'লে 'টোনিক চেঞ্জ' বা ষড়জ পরিবর্তন ঘটে থাকে অহরহ। এর দরুণ রচনার দেহে সুরের রঙ ও আবেদনও যায় পাল্টে। উনিশ শতক থেকে বাংলার একাধিক সুরকার পাশ্চাত্য সংগীতের এই ষড়জ পরিবর্তন পদ্ধতিটি বাংলা গানে প্রয়োগ করেছেন। উদাহরণ : রবীন্দ্রনাথের 'সকলই ফুরাল স্বপনের প্রায়'-এর অন্তরা, দ্বিজেন্দ্রলালের 'মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে'-র অন্তরা এবং হিমাংশু দত্তর 'তুমি যে আঁধার তাই বড় ভালোবাসি'র সঞ্চারি। রসিক ও সতর্ক শ্রোতা খেয়াল করবেন যে এই গানগুলির সঙ্গে শুধু তানপুরা বাজলে ষড়জ পরিবর্তনের সময় ভয়ানক বেখাপ্পা, বিসদৃশ লাগে। কারণ তানপুরায় যে ষড়জ বেজে চলেছে, গানের সুর সেটিকে আর মানছে না সব সময়ে।

যাই হোক, দিলীপকুমার রায় তাঁর 'সূর্য' গানটির সুরে পাশ্চাত্য সংগীত-নির্ভর ষড়জ পরিবর্তনের একটি চমৎকার নিদর্শন রেখেছেন। গানটির স্থায়ী অংশের সুরে তিনি

শুদ্ধ রেখাব, কোমল গান্ধার, শুদ্ধ মধ্যম, পঞ্চম, কোমল ধৈবত স্বরগুলি প্রয়োগ করছেন। প্রথম ছটি লাইন শেষ হচ্ছে ষড়জ, কোমল গান্ধার ও পঞ্চম—এই তিনটি স্বরের যে-কোনো একটিতে। প্রথম অংশের প্রতিটি লাইনের শেষে এই তিনটি স্বর, ফিরে ফিরে আসায় একাট 'মাইনর' স্কেল, এমনকি সরাসরি একটি 'মাইনর কর্ডে'র রঙ ফুটে উঠছে। কারণ যে-কোনো স্বরকে ষড়জ মেনে সেটিকে তার কোমল গান্ধার ও পঞ্চমের সঙ্গে একত্রে বাজালে আমরা সেই ষড়জ-সুরের 'মাইনর কর্ড' পাই।

ছ'টি লাইনের পর 'উল্লসি অন্তর প্রেমল রাজ' থেকে শুরু হচ্ছে—বলা যায় অন্তরা, যদিও আসলে বলা উচিত রচনার দ্বিতীয় ভাগ বা 'মুভমেন্ট।' কারণ এই রচনাটি স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারির চিরাচরিত স্তরগুলিকে মান্য করতে নারাজ। বরং এই রচনায় আমরা অনুধাবন করি একটি মৌল সুরচিন্তার ক্রমবিকাশ। দিলীপকুমার রায় এই গানটি গাইতে গিয়ে পর্বে পর্বে লয়ের একটু আধটু হেরফেরও ঘটিয়েছেন। ইচ্ছে করেই। গানটি শেষ করে তিনি যখন প্রথম লাইনে ফিরছেন, তখন খুঁজে নিচ্ছেন তিনি প্রারম্ভিক লয়টি। গানের পরতে পরতে লিরিক-সুরের বক্তব্য অনুসারে লয়ের হেরফের ঘটানোর ফলে একটা পৃথক আঙ্গিক তৈরী হচ্ছে যেন। বাংলা গানের কাঠামো ও আঙ্গিক নিয়ে দিলীপকুমারের চিন্তা ও কাজ আবার তাঁর কম্পোজার-চরিত্রটিকেই প্রতিষ্ঠা করে।

এ-গানের দ্বিতীয় অংশটি শুরু হচ্ছে মূল সপ্তকের কোমল গান্ধারকে নতুন ষড়জ হিসেবে মেনে নিয়ে। এ হল 'মাইনর' স্কেল থেকে আপেক্ষিক 'মেজর' স্কেলে যাবার পদ্ধতি। মাধ্যমের ওপর পূর্ণ দখল না থাকলে এই দুটি স্কেলের দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও দুয়ের সাধারণ চরিত্রটি গানের সুরে ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব। এত সাবলীলভাবে ষড়জ পরিবর্তন করেছেন দিলীপকুমার যে কোথাও কোনো ধাক্কা লাগে না, সুরের বিকাশ চকিতে উত্তীর্ণ হয় কোমল স্বরের অনুষঙ্গ থেকে শুদ্ধ স্বরবিশিষ্ট একটি নতুন সপ্তকের রঙে। এমনই তাঁর পরিমিতিবোধ রচয়িতা হিসেবে যে দুটি মাত্র লাইনে ধরেছেন তিনি শুদ্ধ স্বরের সপ্তকটিকে। আপেক্ষিকতার প্রয়োগে দু'বার মাত্র তিনি ষড়জ পরিবর্তনের পর শুদ্ধ গান্ধার লাগাচ্ছেন :

গা	-	গ	ম	প	-	গ	সা
উ	ল্	ল	সি	অ	ন্	ত	র

– ঐ 'সা' বা ষড়জ কিন্তু গানের মূল সপ্তকে (প্রথম ছয় লাইনে) কোমল গান্ধার ছিল। দুটি লাইনে এই পরিবর্তিত সপ্তকটিকে প্রশ্রয় দিয়ে তিনি তার পরেই ফিরে আসছেন আবার মূল সপ্তকে কোমল স্বরের আবহে। এটি তিনি কোন্ পদ্ধতিতে করছেন তা অনুধাবন না করলে সুরস্রষ্টা, কম্পোজার হিসেবে তার দক্ষতার দিকটি না-বোঝাই থেকে যাবে।

'উল্লসি অন্তর' থেকে যে অংশ শুরু, সেটি তার পরের লাইনেই শেষ হচ্ছে 'উচ্ছল আজ'-তে

প	-	ধ	ম	গ	-	-	-
উ	-	চ্ছ	ল	আ	-	জ	-

মূল সপ্তকের সঙ্গে পরিবর্তিত সপ্তকটির তুলনা করলে দাঁড়ায় :

মূল : নি - সা ধ | প - - - |
পরিবর্তিত : প - ধ ম | গ - - - |

অর্থাৎ ষড়জ পরিবর্তনের পর শুদ্ধ স্বরবিশিষ্ট নতুন সপ্তকের যে স্বরটিতে এই অংশটি শেষ হল, সেই শুদ্ধ গান্ধার আসলে মূল সপ্তকের পঞ্চম। এই পঞ্চম স্বরটিকে ছাড়া 'মেজর' বা 'মাইনর' কোনো কর্ডই দাঁড়ায় না। দিলীপকুমার তাঁর রচনার এই অংশে পরিবর্তিত সপ্তকের শুদ্ধ গান্ধারে এসে আপেক্ষিকতার হিসেবে মূল সপ্তকের পঞ্চমেই ফিরে এলেন। ফলে, আমরা গোড়ার 'মাইনর' কর্ডের (ষড়জ, কোমল গান্ধার, পঞ্চম) তৃতীয় স্বরটিতে ফিরে আসায় মূল স্বরসমষ্টির আবহেই চলে এলাম। এবারে সুরকার মূল সপ্তকটিকে নতুন ক'রে চিনিয়ে দিচ্ছেন, যাতে সুরের গোড়ার চরিত্রটি অদ্ব্যর্থকভাবে বুঝে নেওয়া যায়

সা - গ রে সা - - সা - গ রে
ব ন্ দি ন বা - রু ণ সা ন্ ধ্য ন
সা - - -
ভে - - -

ষড়জের পৌনপুনিকতা এবং কোমল গান্ধারের অনুষঙ্গ গানটিকে ফিরিয়ে আনছে তার মোকামে, মূল সপ্তকে। পাশ্চাত্য সংগীতের হিসেবে 'মাইনর' স্কেলটিকেও আমরা ফিরে পাচ্ছি। আমাদের দেশের সংগীতের বিচারে আমরা ফিরে পাচ্ছি ষড়জ, শুদ্ধ রেখাব, কোমল গান্ধার এবং এদের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মধ্যম ও পঞ্চমের মিলিত আবহ। এই আপাত-জটিল আঙ্গিকগত বিশ্লেষণ থেকে কিন্তু আমরা ছেঁকে নিতে পারি দিলীপকুমারের রচনাপদ্ধতির সারল্য, পরিমিতিবোধ ও যুক্তিনিষ্ঠা। গোটা কাজটাই তিনি করছেন ষড়জ পঞ্চম আর শুদ্ধ-কোমল গান্ধারের আপেক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তিতে। তার বেশী স্বর তাঁকে ব্যবহার করতে হচ্ছে না। বিশ্লেষণ যতটা জটিল, সুরের গতি ততটাই সরল। দিলীপকুমার রায়ের অলঙ্কারসমৃদ্ধ, আখরবিশিষ্ট, অনায়াসে-তিনসপ্তক-ছোঁয়া, দুরূহ তান, ভারী গমক এবং সূক্ষ্ম কারুকাজ লাগানো গায়কির আড়ালে তার সুরচিন্তার এই পরিমিতি, মিতব্যয়িতা লক্ষ করার মতো।

সত্য বলতে, তাঁর সুরগুলি বিশ্লেষণ করলে আর দুরূহ মনে হয় না। দুরূহ প্রায় অসম্ভব দুরূহ তাঁর গায়ন ভঙ্গি। তাঁর সেই নিজস্বতা এমনভাবে গ্রাস করে রাখতে চায় তাঁর সুরগুলিকে যে সুরের কাঠামোগত সরল বৈশিষ্ট্যগুলি সহজে গোচরে আসতে চায় না। তবে, তাঁর সুরের সারল্যটুকুও কণ্ঠের পরিশীলন, দক্ষতা এবং উচ্চারণের স্পষ্টতার দাবি জানায়। এ-ব্যাপারে দিলীপকুমারের সুর আপোসহীন।

তাঁর অতি জনপ্রিয় 'অকূলে সদাই চলো ভাই ছুটে যাই' গানটি পাশ্চাত্যের লোকগানের সরলতা সত্ত্বেও সুরের আকস্মিক ওঠানামায় আর ততোটা সহজ-সরল নয়। ষড়জ থেকে এক লাফে শুদ্ধ ধৈবত, ষড়জ থেকে হঠাৎ মন্দ্র সপ্তকের পঞ্চম দ্বিমাত্রিক দ্রুত ছন্দে ফুটিয়ে তোলা খুব সহজ কাজ হতে পারে না। 'ভালোবেসে বাঁশি' থেকে

'ভয় নাই' পর্যন্ত যে-তিনটি ভাঁজ আছে, সেগুলিও তালিম-পাওয়া কণ্ঠের দাবি জানায়। কিন্তু সেই জোরটুকু থাকলেই দেখা যাবে সুরকার ঐ তিনটি ভাঁজের জন্য পঞ্চম, শুদ্ধ মধ্যম, শুদ্ধ গান্ধার, শুদ্ধ রেখাব—এই স্বরগুলিকে সরল অবরোহণের যুক্তিতে এমনভাবে সাজিয়েছেন যে সেই-যুক্তির পথ ধরে সুর ও কণ্ঠ সাবলীলভাবে নেমে আসে মোকামে, অর্থাৎ ষড়জে। শ্রোতার কানও একই পথ ধরে। গায়ক যদি কোথাও হোঁচট না খান, তাঁর গলার ওজন যদি যথাযথ থাকে তো শ্রোতার অভিজ্ঞতাও হয়ে উঠবে সাবলীল ও আনন্দময়।

তবে, দিলীপকুমারের সুরচিন্তার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল তার প্রায় প্রতিটি সুরেই তিনটি সপ্তক জুড়ে স্বরের যাওয়া-আসা। বোধহয় তিন সপ্তকে তাঁর নিজের কিংবদন্তীসুলভ দখলের কারণেই তিনি সুররচনায় তিনটি সপ্তকই ব্যবহার করেছেন বারবার। অলঙ্কারগুলিকে বাদ দিলেও কথায় কথায় মধ্য সপ্তক থেকে তার সপ্তকের অন্তত মধ্যম এবং মন্দ্র সপ্তকের পঞ্চম পর্যন্ত সুরের গতিবিধি এড়ানোর কোনো উপায় নেই। তার সপ্তকের মধ্যম ও পঞ্চম তাঁর রচনায় এতই আকস্মিকভাবে আসতে পারে যে কণ্ঠশিল্পীকে সদা-সতর্ক থাকতেই হবে। 'কর্মনাশার' অন্তরায় যেমন 'করিনা বেচাকেনা' কথাটি তার সপ্তকের ষড়জে বার দুই দাঁড়ানোর পরই এক ঝটকায় চ'লে যাচ্ছে তারের শুদ্ধ মধ্যমে। অবরোহণের প্রক্রিয়াটি অবশ্য ধাপে ধাপে। কিন্তু সুর পর্যায়ক্রমে নামতে নামতে তারের মধ্যম থেকে একেবারে মধ্য সপ্তকের ষড়জে চলে আসে।

সুরের এই ডানপিটে গতিবিধির জন্যেই হয়তো দিলীপকুমারের রচনা শ্রোতাকে মজায় সংগীতের আনন্দে এবং সেই একই কারণে বোধহয় উপযুক্ত স্বরসাধনা, তালিম ও রেয়াজের অভাবে আজকের দিনে দিলীপকুমার রায়ের অধিকাংশ সুর একপাশে প'ড়ে থাকছে। যাঁরা নিজেদের কণ্ঠশিল্পী মনে করেন, তাঁদের সামনে দিলীপকুমারের গানগুলি, তাঁর অনন্য গায়কির জন্য ততোটা নয় যতোটা সুরতালছন্দ ও কাঠামোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এডভেঞ্চারের জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়েছে এবং থাকবে।

গ্রামোফোন রেকর্ডে দিলীপকুমার

স্বপন সোম

বিস্ময়কর প্রতিভা দিলীপকুমার রায়ের শিল্পের নানা মহলেই ছিল অবাধ গতায়াত। সংগীত তার একটি। উত্তরাধিকার মেনেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন যথার্থ এক সংগীত সাধক। সংগীত জগতে তাঁর বহুবিধ অবদান এখনও অনেকেরই অজানা। একাধারে তিনি সংগীতশিল্পী ও সংগীত স্রষ্টা। তাছাড়া নিজের অননুকরণীয় লেখনীর মাধ্যমে তিনি সংগীত-মূল্যায়নের একটি ধারা তৈরি করে এবং একাধিক উচ্চাঙ্গসংগীতগুরুকে এই বাংলায় পরিচিত করিয়ে বাংলা সংগীতজগতের অশেষ উপকার করেছিলেন। আপাতত এখানে আমাদের লক্ষ্য গ্রামোফোন রেকর্ডে বিধৃত শিল্পী ও গীতকার-সুরকার দিলীপকুমার। দুয়ের দশক থেকে ছয়ের দশক : এই সুদীর্ঘ সময়সীমায় তিনি রেকর্ডে গেয়েছেন গান, কখনও নিজের, কখনও অন্যের। দ্বৈত রেকর্ডও রয়েছে তাঁর অন্য শিল্পীর সঙ্গে। আবার বিভিন্ন শিল্পী রেকর্ডে গেয়েছেন তাঁর লেখা ও সুরকৃত গান। এইসঙ্গে রেকর্ডের তিনটি তালিকা দেওয়া হল। প্রথমটিতে দিলীপকুমারের এককভাবে গাওয়া রেকর্ডের কথা। অন্য শিল্পীর কণ্ঠ-সহযোগ আছে কিংবা রেকর্ডের এক পিঠে গেয়েছেন দিলীপকুমার, অপর পিঠে আর-এক শিল্পী : এমন রেকর্ডের তথ্য থাকছে দ্বিতীয় তালিকায়। আর বিভিন্ন শিল্পীর গাওয়া দিলীপকুমারের লেখা বা সুর-দেওয়া গানের রেকর্ডের কথা তৃতীয়টিতে। এই তৃতীয় তালিকায় দিলীপকুমারের লেখা-সুর-করা গানগুলিই শুধু উল্লেখ করা হল। এটা এইজন্য বলা যে, অনেক ক্ষেত্রে শিল্পী রেকর্ডে দিলীপকুমারের গান ছাড়াও অন্য গান গেয়েছেন। সাধারণভাবে রেকর্ড নাম্বার, প্রকাশকাল, গানের গীতকার-সুরকার, কোন্ গোত্রের গান : এসব খবরই তিনটি তালিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে এ-যাবৎ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে। প্রসঙ্গত, বলা দরকার যে দিলীপকুমার রায়ের রেকর্ডের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল 'বরণ মালিকা' (১৯৭৬) গ্রন্থে। সেখানে ছিল কেবল রেকর্ড নাম্বার আর গানের প্রথম লাইন। এই অসম্পূর্ণতা কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস রয়েছে বর্তমান তালিকা-প্রণয়নে, তবে এও যে সুসম্পূর্ণ তেমন দাবী না করাই সমীচীন। কেননা দিলীপকুমারের একটি রেকর্ডের বিস্তৃত তথ্য মেলে নি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক গীতকার সুরকারের নামও পাওয়া যায় নি। তাছাড়া আরও সুবিস্তৃত গবেষণায় তৃতীয় তালিকায় অর্থাৎ অন্য শিল্পীর গাওয়া দিলীপকুমারের গানের রেকর্ড তালিকায় সংযোজন হতে পারে বলে মনে হয়।

দিলীপকুমারের প্রথম রেকর্ড নিয়ে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক। 'ছিল বসি সে' ও 'রাঙাজবা কে দিল' গানদুটি নিয়ে তাঁর প্রথম রেকর্ড (P6944) প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালের শারদীয়া পূজার সময়। তৎকালীন রেকর্ড ক্যাটালগে দিলীপকুমারের এই রেকর্ডের পরিচিতি দেওয়া হল এইভাবে : 'স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় মিস্টার ডি. এল.রায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয় জার্ম্মানি, ইটালি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড

প্রভৃতি দেশে ইউরোপীয় সংগীত শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া ভারতীয় সংগীত রীতিমত শিক্ষা করিয়াছেন এবং নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ অঙ্গের গায়ক বলিয়া খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। তাঁহার অতি প্রিয় দুইখানি গান রেকর্ডে প্রকাশিত হইল। গান দুখানি অতিশয় শ্রুতিসুখকর হইয়াছে। আমরা সকলকে শুনিতে অনুরোধ করি।' এই রেকর্ডটিই বৈদ্যুতিন প্রথায় পরিবর্তিত করে পুনরায় প্রকাশিত হয় ১৯৩৩-এর নভেম্বরে (N7169) ১৯৩৩-র নভেম্বরে রেকর্ড-ক্যাটালগে দেওয়া এ-রেকর্ডের পরিচিতির উল্লেখ বোধ করি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না : 'দিলীপবাবুর এই দুইখানি সর্ব্বজন প্রশংসিত গান আমরা বহু অর্থ ব্যয়ে আধুনিক বৈদ্যুতিন প্রথায় পরিবর্তিত করিয়া আমাদের অনুগ্রাহক মণ্ডলীর মনোরঞ্জনার্থে প্রকাশ করিলাম। এই রেকর্ডখানি শুনিলে আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র কতদূর উন্নত। গানের অতি সূক্ষ্ম কাজগুলিও স্পষ্টভাবে ফুটিয়াছে। ওই রেকর্ডখানি পূর্ব্বের চেয়ে সকল দিক দিয়া ভাল হইয়াছে।' রেকর্ড-তালিকায় সরাসরি যাবার আগে এবার ঋণস্বীকারের পালা। তালিকা প্রণয়নে প্রধান সহায়ক হয়েছে রেকর্ড কোম্পানি প্রকাশিত মাসিক রেকর্ড-ক্যাটালগ। শ্রী বরদা গুপ্ত, শ্রী সুরাজলাল মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহে যেমন, তেমনি গ্রামোফোন কোম্পানির শ্রীঅমলকুমার বন্দোপাধ্যায়ের সৌজন্যে গ্রামোফোন কোম্পানিতে রক্ষিত বিভিন্ন রেকর্ড ক্যাটালগ দেখার সুযোগ হয়েছে। এঁদের নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এ তালিকা প্রস্তুত অসম্ভব ছিল।

তালিকা 'ক' : শিল্পী যখন এককভাবে দিলীপকুমার

1.	P6944 শারদীয়া, 1925	ছিল বসি সে কুসুমকাননে—কীর্তন রাঙাজবা কে দিল তোর পায়ে—মিশ্র সিন্ধু
2.	N7169 নভেম্বর, 1933	ছিল বসি সে কুসুম কাননে—কীর্তন রাঙাজবা কে দিল তোর পায়ে—মিশ্র সিন্ধু
3.	HH3 জুন, 1937	কোন্ লাবণ্যলীলায়—নাট্যসংগীত 'বরদান'—ওগো যশোদা—ঐ কথা ও সুর : শিল্পী
4.	N9936 আগস্ট, 1937	'মা'—এই পৃথিবীর পথের পরে—ভজন 'মন্ত্রময়ী'—জ্বলবার মন্ত্র দিলে মোরে—ঐ
5.	H11538 শারদীয়া, 1937	সুগোপন—ভজন শ্রীমতী রাহানা দেবীর হিন্দী হইতে, সুর : শিল্পী চন্দ্রনৃত্য—ভজন রচনা : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
6.	N9991 নভেম্বর, 1937	সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম ১ম ও ২য় খণ্ড - ভজন
7.	N17057 মার্চ, 1938	মেরে দিলমে দিলকা পেয়ারা হৈ—ভজন লচক লচক বিজলী ঝলক—ঐ সুর : শিল্পী

8.	P11825 আগস্ট, 1938	‘ভারতবর্ষ’ : ভারত আমার ভারত আমার—বন্দনা কথা ও সুর : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ‘সুভাষচন্দ্র’ : ত্রিংশ কোটির অন্তরনিধি—প্রশস্তি কথা : অজয় ভট্টাচার্য, সুর : শিল্পী
9.	HT80 অক্টোবর, 1938	‘বন্দেমাতরম (সম্পূর্ণ)—জাতীয়সংগীত কথা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা—ঐ কথা ও সুর : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
10.	N17305 জুন, 1939	“‘চিরসাথী’ : তোমারি ভালবাসা তরে—গজল-ঠুংরী ‘চাঁদের আলো’ : চাঁদের আলো....চাঁদের আলো টপ্পা-ঠুংরী কথা ও সুর : শিল্পী
11.	N17351 সেপ্টেম্বর, 1939	আলো-কায়া-১ম ও ২য় খণ্ড—কীর্তনাঙ্গ কথা ও সুর : শিল্পী গীটার বাদ্য : শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ
12.	N17388 নভেম্বর, 1939	দিল্ লে লিয়া—ভজন ব্যসা লে আপ্‌নে মনমে—ঐ
13.	N17399 ডিসেম্বর, 1939	‘শরণাগত’ : আর কিছু তো জানি নে মা সাধন সংগীত কথা : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সুর : শিল্পী ‘সফল’ পূজা আমার সাঙ্গ হল—সাধনসংগীত কথা : নিশিকান্ত, সুর : শিল্পী
14.	N17417 ফেব্রুয়ারী, 1940	কুঞ্জন বন ছাঁড়ি—মীরা-ভজন মেরে গিরধর গোপাল—ঐ
15.	N17440 মার্চ, 1940	শ্যামল! চিরজীবন ঘিরি—ভক্তিগীতি থেকো প্রিয় পাশে—ঐ কথা : শ্রীমতী সাহানা দেবী, সুর : শিল্পী
16.	N17463 মে, 1940	নূপুরকী-ঝন্‌কার—ঠুংরী ইস দিলনে দেখ লিয়া—ঠুংরী-কীর্তন কথা : শ্রীমতা রাহানা দেবী, সুর : শিল্পী
17.	N17467 জুন, 1940	বলি ত’ হাসব না—হাসির গান রিফর্মড হিন্দুস’ : যদি জানতে চাও আমরা কে—ঐ কথা ও সুর : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
18.	N27140 জুন, 1941	‘রাজার রাজা’ : রাজা তোমায় করল রাজা—বাউল কথা : নিশিকান্ত ‘বিদায়’ : অতীত জীবন ওগো—কীর্তন কথা : শ্রীমতী রাণী দেবী

19.	N27347 জানুয়ারী, 1943	বনঠন কর—ভজন কথা : কুমারী রাহানা হমারে জীবনমরণকে সাথী—মীরা-ভজন
20.	N27443 এপ্রিল, 1994	আজিও তোমারে সাধিতে শিখিনি—ভক্তিমূলক প্রণয়ে যদি আনিলে বন্দী করি—ঐ কথা ও সুর : শিল্পী
21.	N27623 আগস্ট, 1946	ন তাত ন মাতা ওঁ মন বুদ্ধ্যহঙ্কার—সংস্কৃত
22.	N27656 জানুয়ারী, 1947	'শ্রীঅরবিন্দ স্তোত্র' : কনকজ্যোতি কলেবরধার—ভজন কথা : নলিনীকান্ত সরকার, সুর : শিল্পী 'মাতৃস্রোত্র' : হে কনকোজ্জ্বল সবিতা-বরণী—ভজন কথা : নিশিকান্ত, সুর : শিল্পী [এই রেকর্ডটি একই নাম্বারে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল 1955 -র ফেব্রুয়ারী-মার্চে। তৎকালীন রেকর্ড-ক্যাটলগে লেখা হল এ সম্পর্কে : 'ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য রেকর্ডটি পুনঃপ্রকাশিত হল']
23.	N27721 সেপ্টেম্বর, 1947	বঙ্গ আমার জননী আমার—জাতীয় সংগীত ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে—ঐ কথা ও সুর : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কোরাস : শ্রীমতী মায়া, শোভা, গীতিকা, শ্রীমতী পুষ্প, শ্রীনলিনীকান্ত ও নিলয়
24.	N27782 জানুয়ারী, 1948	আঁধার নিশা—উচ্চাঙ্গ সংগীত বাঁশির ডাক—ঐ
25.	N16931 এপ্রিল, 1948	সুন সখি রী শ্যাম—ভজন হম ঐসে দেশ কে—ন্যাশনাল
26.	N31115 সেপ্টেম্বর, 1949	তুমি আমায় করলে গ্রহণ—ভক্তিমূলক তমসা যখন ছেয়ে গেছে—ঐ কথা ও সুর : শিল্পী
27.	N20143 ডিসেম্বর, 1949	অজব তামাসা—নির্গুণ অব কিঁউ ঘর ছোড়—ঐ
28.	N20172 মে, 1950	বড়ি অনোখী রাত—ভজন দূর দেশ সে আই—ঐ
29.	N31197 জুন, 1950	আমি চেয়েছি আমি নিয়েছি—ভক্তিমূলক যদি দিয়েছ দিয়েছ বঁধুয়া—ঐ কথা : ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলা-রাজ) সুর : শিল্পী

30. N20208 ফির কিসী কি—ভজন
ডিসেম্বর, 1950 সুনো কথা—ঐ

31. P11916 ওঁ নটরাজ
শারদীয়া, 1951 পুষ্প উছল গাহে
কথা ও সুর : শিল্পী

32. N20248 হম ভারতকে—রাষ্ট্রীয়
ডিসেম্বর, 1951 ভারতমাতা—ঐ
কথা : ইন্দিরা মালহোত্রা

33. P10730 একদিন যানা হ্যায়—ভজন
ফেব্রুয়ারী, 1953 মোহে চাকর রাখো জী—ঐ

34. N82765 আজ সখি চল যাই
1957 সখি মোর প্রাণধন
কথা ও সুর : শিল্পী

35. H1853 চরণ ধরে আছি পড়ে
এপ্রিল, 1960 আর কেন মা ডাকছ
কথা ও সুর : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

36. N83036 'গঙ্গাস্তোত্র'—পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে
1963 এবার তোরে চিনেছি মা
কথা ও সুর : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[দিলীপকুমার রায়ের পূর্ব-প্রকাশিত রেকর্ড থেকে নির্বাচিত কিছু বাংলা ও হিন্দী গান নিয়ে দুটি লং প্লে রেকর্ড ছয়ের দশকে প্রকাশিত হয়। রেকর্ডদুটি হল :]

331/2 RPM EALP 1347 : দশটি বাংলা গান।

331/2 RPM EALP 1379 : দশটি হিন্দী ভজন ও দুটি সংস্কৃত স্তব।

কিছু গান নিয়ে পরে ক্যাসেটও প্রকাশিত হয়। যেমন HTC 02B2451-'দি গোল্ডেন ভয়েস অব দিলীপকুমার রায়'।

'বরণমালিকা' গ্রন্থে দেওয়া নাম্বারবিহীন 'H.. আয় আয় আমার সাথে'-রেকর্ডটির বিস্তৃত তথ্য মেলেনি এটা টেস্ট কপি হতে পারে। অর্থাৎ রেকর্ড হলেও প্রকাশিত হয়নি। তবে এসবই অনুমান।]

তালিকা খ : দিলীপকুমার ও অন্য শিল্পীর দ্বৈত রেকর্ড

1. H302 মজল আমার মন ভোমরা
নভেম্বের, 1935 কথা : কমলাকান্ত, সুরকার ও শিল্পী : দিলীপকুমার
'বালগোপাল' : চমকে তিমির থিরবিজলীর
কথা ও সুর : দিলীপকুমার। শিল্পী : দিলীপকুমার ও সাহানা দেবী।

2.	N17232 ডিসেম্বর, 1938	নালয়ে জানে যুঁতো কেয়া কেয়া শিল্পী : দিলীপকুমার রায় ও কুমারী উমা বসু (হাসি) কথা : মিঃ আমজাদ, সুর : দিলীপকুমার রায়
3.	N17248 ফেব্রুয়ারী, 1939	ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে—তত্ত্বগীতি কথা ও সুর : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। শিল্পী : দিলীপকুমার রায় অকূলে সদাই চলো ভাই—তত্ত্বগীতি কথা ও সুর : দিলীপকুমার শিল্পী : দিলীপকুমার ও উমা বসু।
4	N17289 মে, 1939	ইয়ে তুনে ক্যা কিয়া—গজল শিল্পী : দিলীপকুমার রায় আজ সখি শুনো—ভজন শিল্পী : কুমারী উমা বসু।
5.	HT 82 ডিসেম্বর, 1940	ওকে গান গেয়ে গেয়ে—কীর্তন শিল্পী : দিলীপকুমার রায়, কথা ও সুর : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বঁধু কি আর বলিব—কীর্তন শিল্পী : কুমারী উমা বসু।
6.	N27208 অক্টোবর, 1941	তোমার মুরতিখানি—ভজন কথা : নিশিকান্ত, সুরকার ও শিল্পী : দিলীপকুমার রায় 'ভোরের পাখি'-ওই গহন রজনী অন্তে—ভজন কথা ও সুর : দিলীপকুমার শিল্পী : দিলীপকুমার ও কুমারী উমা বসু।
7.	N27231 জানুয়ারি, 1942	মূরলী মধুর কাঁহি বাজি—ঠুংরী ভজন শিল্পী : দিলীপকুমার রায় কানহ মুরলীওয়ালে—ঠুংরী ভজন শিল্পী : শ্রীমতী উমা বসু।
8.	N27322 অক্টোবর, 1942	আঁধারের ডোরে গাঁথা—টপখেয়াল শিল্পী : স্বর্গীয়া উমা বসু (হাসি) কথা ও সুর : দিলীপকুমার রায় (সখি) দিয়ো না দিয়ো না —টপ্পা কথা : নিশিকান্ত, শিল্পী ও সুরকার : দিলীপকুমার রায়
9.	N27371 মে, 1943	হোলি খেলত আজু কনহই—ঠুংরী শিল্পী : দিলীপকুমার রায় নেক নামী সারী রোখ্‌সৎ—গজল শিল্পী : উমা বসু (হাসি)

10.	N27494 নভে-ডিসে 1944	তব চিরচরণে জয়তি বৃন্দাবন তব শিল্পী : দিলীপকুমার রায় ও কুমারী মঞ্জু গুপ্তা
11.	N27586 এপ্রিল 1946	বৃন্দাবন কী মঙ্গললীলা—হিন্দী ভজন শিল্পী : মঞ্জু গুপ্তা, সুর : দিলীপকুমার রায় মোসে কাহে কো প্রীত জুরাই—হিন্দী ভজন শিল্পী : দিলীপকুমার রায়
12.	N14421 মে, 1948	বন্দেমাতরম ধন ধান্য পুষ্প ভরা শিল্পী : এম.এস. শুভলক্ষ্মী, সহকণ্ঠ : দিলীপকুমার রায়
13.	N27896 সেপ্টেম্বর, 1948	'ঘুমপাড়ানি' : মা তোর ঐ হাসি—ভক্তিমূলক শিল্পী : দিলীপকুমার রায় ও মঞ্জু গুপ্তা 'রাসনৃত্য' : এলো ঐ এলো ঐ —ভক্তিমূলক শিল্পী : মঞ্জু গুপ্তা, কথা ও সুর : দিলীপকুমার রায়
14.	N31007 এপ্রিল, 1949	ওরে উধাও আমার মন—বাউল শিল্পী : মঞ্জু গুপ্তা। কথা ও সুর : দিলীপকুমার রায় ঘুম যাই মা শিল্পী : দিলীপকুমার রায় ও মঞ্জু গুপ্তা কথা ও সুর : দিলীপকুমার রায়
15.	P11921 সেপ্টে-অক্টো 1952	হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ—নামকীর্তন রাধাগোবিন্দ রাধেশ্যাম—ঐ শিল্পী : দিলীপকুমার রায় ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী
16.	P10733 জুন, 1953	রাধে গোবিন্দ—কীর্তন শিল্পী : দিলীপকুমার রায় ও ইন্দিরা দেবী বসালে আপনে মন গোপাল—কীর্তন গীতিকার ও শিল্পী : দিলীপকুমার রায়

তালিকা 'গ' : অন্য শিল্পীর কণ্ঠে দিলীপকুমারের গান

শিল্পী : উমা বসু

1.	N9951 সেপ্টেম্বর, 1937	আঁধারের এই ধরণী—বাউল কথা : নিশিকান্ত, সুর : দিলীপকুমার রায়
2.	N17027 জানুয়ারী, 1938	ফোটে ফুল মনের মাঝে—আধুনিক কথা : অজয় ভট্টাচার্য, সুর : দিলীপকুমার রায় সুন্দর এস আজ অন্তরে—আধুনিক কথা ও সুর : দিলীপকুমার রায়

3.	N17200 অক্টোবর, 1938	বুলবুল মন ভুল—আধুনিক মুরলী নৃত্য—ভজন কথা ও সুর : দিলীপকুমার রায়
4.	N17282 মে, 1939	'নীলপরী' : যখন গাহে নীল পরী—নৃত্যগীতি কথা ও সুর : দিলীপকুমার রায় 'নির্ঝরিণী' : নিঝর ধারা ! শিহর ধারা সুর : দিলীপকুমার রায়
5.	N17313 জুলাই, 1939	এস তস অমৃতময়ী—সাধনগীতি কথা ও সুর : দিলীপকুমার রায় আধফোটা ছোট তারা—আধুনিক কথা : শ্রীমতী লতিকা দেবী, সুর : দিলীপকুমার রায়
6.	N17360 অক্টোবর, 1939	জীবনে মরণে এসো—সাধনসংগীত উদাসী বাঁশি নূপুরে—ঐ কথা ও সুর : দিলীপকুমার রায়
7.	N17405 জানুয়ারী, 1940	রাঙাজবায় কাজ কী মা তোর—সাধনসংগীত কথা : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সুর : দিলীপকুমার রায় শ্রীচরণে নিবেদনে—সাধনসংগীত কথা ও সুর : দিলীপকুমার রায়
8.	N17446 এপ্রিল, 1940	রূপে বর্ণে গন্ধে—সাধনসংগীত মধু মুরলী বাজে—ঐ কথা ও সুর : দিলীপকুমার রায়
9.	N17494 আগস্ট, 1940	মাগো কে তোমারে জানতে পারে—সাধনসংগীত সুর : দিলীপকুমার রায় তব প্রণয় পুলক ধরি কথা : নিশিকান্ত, সুর : দিলীপকুমার রায়

শিল্পী : হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

1.	N17217 নভেম্বর, 1938	তোমায় গুণী যেন শুনি—সহকণ্ঠ : উমা বসু কথা ও সুর : দিলীপকুমার রায়

শিল্পী : সাহানা দেবী

1.	H822 জুলাই, 1940	বরণ না করিলে—শ্যামাসংগীত কথা ও সুর : দিলীপকুমার রায়

শিল্পী : গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও মাধুরী মুখোপাধ্যায়

1.	7EPE3099 1975	হরি গাও হরি গাও—নামকীর্তন কথা : ইন্দিরা দেবী (হরিকৃষ্ণ মন্দির, পুণা) সুর : দিলীপকুমার রায়

2. 7EPE 3135 — পা দুটি কাঁপে
1976 — আঁধারের এই ধরণী
কথা : নিশিকান্ত, সুর : দিলীপকুমার রায়
বন্ধন নাশো মন্ত্রবরে
মা দিয়েছ জীবন অমৃতস্বপন
কথা ও সুর : দিলীপকুমার রায়

3. HTC 02B2612 — হরিনাম
(ক্যাসেট) — গঙ্গাস্তোত্র
শারদীয়া 1985 — বন্ধন নাশো
মা দিয়েছ জীবন
কথা ও সুর : দিলীপকুমার রায়
বেদগান ও নামকীর্তন
কথা : ইন্দিরা দেবী, সুর : দিলীপ কুমার রায়

শিল্পী : কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়

1. PSLP1535 — 'তিন দিশারীর সুরধারা' :
শারদীয়া, 1985 — তোমায় গুণী ! যেন শুনি
মম জীব
কথা ও সুর : দিলীপকুমার রায়
আঁধারের এই ধরণী
কথা : নিশিকান্ত, সুর : দিলীপকুমার রায়

2. PSLP1632 'বাংলা গানে পরম্পরা' : দ্বিজেন্দ্রলাল ও দিলীপকুমারের গান
শারদীয়া, 1987 — তোমায় বরণ না করিলে
এ যে কোন কর্মনাশা
কি গুণ বলো কি গুণ জানে
চমকে তিমির থির বিজলী
প্রিয় তোমার কাছে যে হার মানি
চাঁদের বাঁশি বাজলো আকাশ ছেয়ে
কথা ও সুর : দিলীপকুমার রায়।

দিলীপকুমার রায়ের পত্রসম্ভার

[দিলীপকুমার রায়ের একটা আলাদা প্রবণতা ছিল চিঠি লেখার এবং এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন অশ্রান্ত। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে নিজের মত ও পথ বোঝাতে সমমনস্ক ও বিরুদ্ধবাদীদের কাছে কয়েক সহস্র চিঠি লিখেছিলেন দেশেবিদেশে। তার থেকে কিছু চিঠি নির্বাচন করে এখানে মুদ্রিত হল প্রাপকদের সম্মতিসহ। প্রাপকরা হলেন অধ্যাপক গোবিন্দ-গোপাল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক নীলরতন সেন, স্টেটসম্যান সম্পাদক অমলেন্দু দাশগুপ্ত। সবশেষ চিঠিটির প্রাপক কে জানা যায়নি তবে দিলীপকুমারের নানা কাগজপত্রের মধ্যে এটি পাওয়া গেছে।
প্রকাশিত পত্রাবলীর মধ্যে দিলীপকুমারের নানা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ, ধ্যান-ধারণা, পছন্দ-অপছন্দের খবর মেলে। বিশেষ করে কৌতূহলকর তাঁর গান রচনার নানা অনুষঙ্গ-বিবরণ এবং ভক্তিপথযাত্রীরূপে তাঁর প্রত্যয় ও বিশ্বাসের ছবি।
সম্পাদক।]

১.

ওঁ
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরি

১৫/১১/৪২

ভাই গোবিন্দগোপাল

এইমাত্র তোমার চিঠি পেয়েই পিঠ পিঠ উত্তর দিতে বসেছি কারণ 'দীর্ঘসূত্রীর' কী যে হয় পত্রলেখা বিষয়ে সেটা ঠেকে শিখেছি বহুবারই—তবে সে শিক্ষার ফলে মন 'অনাগতবিধাতা'র দলে আজও নাম লেখায়নি। এ-ও প্রাক্তন। তবে আমার একটা সাফাইও আছে ভুলো না। আমার আর একটি বই বেরিয়েছে 'দিনে দিনে'। আজ কালের মধ্যেই পাবার কথা। ভেবেছিলাম তোমাকে পাঠাব ও সেই সঙ্গে লিখব 'উপহার—বিজয়ার'-- রথদর্শন ও রম্ভাবিক্রয় দুই পক্ষীই অদ্বিতীয় লোষ্ট্রাঘাতে ইত্যাদি। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ তাই বইটি হাতে এসেও আসছে না। অগত্যা আজ ভাবলাম একটি চিঠিই লিখি।

তোমার কথা আমি ভুলিনি ভাই। তুমি ঠিকই লিখেছ আমার সমপন্থী তো বটেই তার উপরে সমানধর্মী নিরবধি কালে তোমায় পেয়েছি কাজেই ছাড়ি কী ক'রে? তোমার স্নিগ্ধ বিনম্র মুখখানি আমার প্রায়ই মনে পড়ে আর ভাবি তুমি যদি ২৪শে নভেম্বর দর্শনে আসতে বেশ হ'ত। কিন্তু তোমার বাবাকে ছেড়ে আসতে পারো না লিখেছ। এর পরে কী-ই বা বলি বলো! তোমার বাবাকেও গিয়ে প্রণাম ক'রে গান শুনিয়ে আসার ইচ্ছে রয়েছে বহুদিন থেকে। কাল কৃষ্ণপ্রেমকে লিখেছি এপ্রিলে তার ওখানে গিয়ে থাকব দিন পনের। তারপরে ফিরতি পথে তোমাদের ওখানে এক সপ্তাহ তো থাকবই, যদি আশ্রয় দাও তবে দু সপ্তাহ। কথা রইল। কিন্তু তার আগে তুমিই বা একবার আসবে না কেন শুনি। আজকাল এত চমৎকার সুর আসছে সব—কত গান যে। এখানে এলে এ আবহে গান শুনলে বুঝবে সত্যি কলকাতায় আমার গান কেন ভালো হয় না তেমন। তুমি এলে কয়েকটি গানও তোমাকে শেখাতাম। আমার এখানে আমার পাশের ঘরেই থাকতে পারতে। বেশ দিব্যি ঘর সমুদ্রের ধারে। তোমার হাওয়াবদলও হ'ত শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দের

স্পর্শও পেতে, রথদর্শন রম্ভাবিক্রয় তোমারও হ'ত। তোমার বাবাকে নিয়ে যদি আসো তাহ'লে আমার এখানেই উঠতে পারো— তবে তিনি কি আজকাল বেরুবেন আর? যদি পারো ফ্রেব্রুয়ারিতে এসো, ২১ শে দর্শন। তুমি যদি পয়লা আসো তো বেশ হয়। ফেব্রুয়ারি মাসটা এখানে কাটিয়ে মার্চে ফিরো। এখানে খাওয়াদাওয়া বড়ই সাদাসিদে হয়ত একটু কষ্ট হবে। তবে তোমার বাবা এলে আমার রান্নাও খাওয়াব। আমি মাঝে মাঝে এক আধটা তরকারি রাঁধি। দুঃখ এই যে শাকসবজি এখানে বেশি মেলে না। তবু প্রাণধারণ করবার মতন মেলে। আর স্বচ্ছন্দ বনজাতেন শাকেমাপি উদরপূর্তি হয় এ নজিরও তো রয়েছে বিষ্ণুশর্মার কল্যাণে। তবে?

আমি ব্যস্ত লিখেছ। এক হিসেবে বলতে পারো। বিশেষ আজকাল খুব ইংরাজি কবিতায় হাত পাকাচ্ছি, শ্রীঅরবিন্দ বিশেষ প্রসন্ন হয়েছেন আমার 'প্রগতিহীনতা' লক্ষ্য ক'রে। দুএকটা পাঠালাম প'ড়ে ফেরৎ দিও, কৃষ্ণপ্রেমকে পাঠাতে হবে কিনা। তাছাড়া একটি চোদ্দ বছরের ছাত্র পেয়েছি গুজরাতি ছেলে। তার সম্বন্ধেই লিখেছি 'The little singer' কবিতাটি। ছেলেটিকে দিয়ে বাংলা গানও গাওয়াচ্ছি। গ্রামোফোনে শিখেছে আমার 'বসালে আপন মনমে প্রীত ও দিল যে লিয়া।' বেশ সুন্দর কণ্ঠ। তবে যে-কণ্ঠ নীরব হয়ে গেছে তার মতন কণ্ঠ আর পাব না। তবু—ছেলেদের মধ্যে এমন উৎসাহী সুকণ্ঠ বড় বেশি পাইনি। তালেও খুব পাকা স্বরলিপিও জানে আর আছে সেই বস্তু যার অভাব বাঙালির—নিষ্ঠা। তাই উন্নতি করছে। তবে বাঙালির কল্পনা নেই এর তেমন, যা ছিল হাসির। সব কি আর মেলে?

আমি এর মধ্যে ত্রিবাঙ্কোরে ঘুরে এলাম। রাজ অতিথি হয়ে রাজা রাণী মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে খুব দহরম মহরম হ'ল। কিন্তু সুখ পেলাম সবচেয়ে ওখানে কন্যাকুমারী মন্দিরে কুমারিকায়। অপূর্ব স্থান। তীর্থমাহাত্ম্য মানতেই হ'ল। সেখানে একটি কবিতা লিখেছিলাম শ্রীঅরবিন্দ বিশেষ খুশি হয়েছেন। এটি আমার সব চেয়ে ভালো কবিতাদের অন্যতম তাই পাঠালাম তাঁর দাগ শুদ্ধু।

ত্রিবাঙ্কোরে বহু বন্ধু লাভ হ'ল। বড় সুন্দর স্বভাবের বোনও দু একটি মিলল। আমার host Dr. Mowolgyll, Director of Research -এর স্ত্রী। নাম সুশীলা, পাঞ্জাবি মেয়ে, আমাকে দাদা বলত। ওরা অনেকে আসবে। ওখানে মহা হৈ চৈ করল ওরা আমাকে নিয়ে। দারুণ গাইলাম দিনের পর দিন। বক্তৃতাও দিতে হল তিন জায়গায়। উপায় কী বলো ভাই—নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?

আজ ইতি করি ভাই। আমার স্নেহ নিও আন্তরিক। তোমার বাবাকে আমার সভক্তি প্রণাম দেবে। ত্রিবান্দ্রমে আমার একটা snap নিয়েছিলেন আমার এক নবলব্ধ ধার্মিক বন্ধু ওখানকার একটি বিখ্যাত মানুষ। তার এক কপি তোমায় পাঠালাম বিজয়ার স্নেহাশীর্বাদের সঙ্গে।

ইতি নিত্যশুভার্থী মন্টুদা

২.

ওঁ

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম

পণ্ডিচেরি

৭/৯/৪৩

ভাই গোবিন্দগোপাল

তোমাকে সত্যিই অনেকদিন আগেই লেখা উচিত ছিল। লিখব লিখব করেছি যে কতবারই কিন্তু হায়

যত ভাবি - বসি, মন হ'তে খসি' পড়ে শুভ সংকল্প
প্রেয়ের পথে যে বহু বিঘ্নানি একথা তো নহে গল্প।
তবু হে সুজন, ভনে কবিমন, অপরাধ ক্ষন্তব্য
যদিও দরদী মানে সেটা, ভবে দরদী নহে সুলভ্য।
তবু তুমি ভাই সাধিছ সদাই তাঁরে-যে, এ কথা কল্পি'
সত্যিই সুখী আমি জেনো, চাই বওয়া তো তাহারি তল্পি।
আপন তল্পি বহে যে গল্পী, শিল্পী সে মানি, গণ্য:
তবু আরো মানি তাঁহার শিল্প সাধে যে সে আরো ধন্য।
তুমি গিয়েছিলে হিমালয়ে—নিলে লুটিয়া সাধুর সঙ্গ
ছিলে কয়দিন ভুঞ্জি' পুণ্য কৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গ—
একথা ভাবিতে হৃদয়-নিভৃতে জাগে হে বন্ধু তৃপ্তি।
আঁধার বিশ্বে কজনার মুখে হেরি ভকতির দীপ্তি?
লিখো কথা তার লিখো বার বার— কী লভিলে তার সখ্যে
কী মধু পিয়িল কর্ণ—কী নব আলোক দীপিল চক্ষে।
আমি 'উত্তরা'-পাতে সে-অ-ঝরা পুষ্প মধু সুগন্ধ
কিছু তো পেরেছি পরিবেষণিতে—সবারে বাঁটি' আনন্দ।
আম খেয়ে মুখ মুছে যার সুখ— (ঠাকুর-বাণী সহাস্য)
তার চেয়ে গুণী সেই যে 'বিলায়'—এও কি অবিশ্বাস্য?
আমারেই নিতি দোষ দেওয়া রীতি তোমার—নহে প্রশস্য [প্রশংস্য?]
নিজে যে বাঁটিতে চাও না পুলক স্বীকার কোরো অবশ্য।
এই সাধে দুই সংখ্যারে থুই লেকাফায় ওগো মিত্র
যেটুকু পেয়েছি চেয়েছি সাদরে ফোটাতে পূজারী-চিত্র।
আরো দুইখানি পত্রে বাখানি' করিব কথা সমাপ্ত
স্বল্প ধর্ম ভয় হ'তে ত্রাণ করে—এ বাক্য আপ্ত।

না, আর ছড়া কাটা না। শরীর ঈষৎ 'মাটো'। জ্বর ভাব। বলছে ম্যালেরিয়া বর্গীয়। তবে দেহদুঃখ অধিক নয়। অনেক কবিতা লিখেছি, প্রবন্ধও। একটি বড় ভালো বই

পড়লাম mysticism এর ওপর Aldous Huxleyর Grey Eminence—সদ্য প্রকাশিত। শারদীয়া সংখ্যা 'সোনার বাংলায়' এর একটি বৃহৎ পরিচিতি দিয়েছি। কলকাতা থেকে ঐ সংখ্যাটি জোগাড় কোরো। এখন:

তোমারে কী বলো বলিব শ্যামল, বলিবার কথা কিছু কি আছে?
একই কথা শুধু বলি তাই বঁধু, পরাণ আমার তোমারে যাচে।
বাহিরের গানে উছল নূপুর
অন্তরে হানে নিগড় নিঠুর,
তাই তো তোমায় চাই হে মধুর না পাওয়া পরশ হৃদয় মাঝে।
যুগযুগান্ত আছি পথ চেয়ে
এসো শ্রীকান্ত প্রেমতরী বেয়ে
তুমি বিনা কার বাঁশি ওগো নেয়ে, ধ্রুবতারা সুরে তুফানে বাজে?
মিলন কিরণে রচে তব গীতি,
বিরহ বিদায়ে জপে তারি স্মৃতি,
জীবনে মরণে তুমিই অতিথি আঁধারে-আলোকে গরবে-লাজে।

এটি সত্যিই আমার একটি ভালো গান মনে হয়। গ্রামোফোনে দিয়েছি সেদিন। যদি বেরোয় তো শুনো। আমার এখানে একটি অতি সুকণ্ঠী ছাত্রী জুটেছে—সাধিকা। তাকে এ গানটি শিখিয়েছি। এটিও তারও প্রিয়—অনেকেই ভালোবাসে এ গানটি খুব।

তোমাদের ওখানে যাবার ইচ্ছা তো খুবই তবে যুদ্ধ না থামলে আর রেলপথে ভ্রমণ চলবে না মনে হয়। দেখা যাক যদি এ বছরে থামে তবে সামনের গ্রীষ্মে—তবে man proposes God disposes জানোই তো। তোমার বাবা মাকে আমার প্রণাম দেবে। তোমার মার অসুখ সেরে যাবে নিশ্চয়ই। প্রার্থনা করি তিনি শীঘ্র নিরাময় হোন। আমার আন্তরিক স্নেহ নিও।

ইতি তোমার নিত্যশুভার্থী মন্টুদা

৩.

ওঁ

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম

পণ্ডিচেরি

২৬/৬/৪৪

ভাই গোবিন্দ

কী আশ্চর্য। আমিও যে খুব মন দিয়ে ভাগবত পড়ছি হে। প্রমাণ পাঠালাম। অনুবাদটির একটি কপি যদি পাঠাও তোমার পদ্মাক্ষরে তবে কোথাও ছাপতে দেব

আমি মাসখানেক ধরে ভাগবত যতই পড়ছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি। ভাগবত বাংলায় পড়েছিলাম আগেও কিন্তু এখন পড়ছি মূল নিয়ে ভাষ্য দেখে দেখে অনুবাদ মিলিয়ে ছন্দ চেখে চেখে। গ্রন্থপাঠ সাধনার অঙ্গ শুনেছিলাম এখন উপলব্ধি করছি প্রত্যক্ষ। সত্যি

খুব উপকার পাচ্ছি। অনেকগুলি ভাগবতী গান বেঁধেছি। দু একটি হয়ত জুলাইয়ে গ্রামোফোনে দেব। দেখা যাক। মাদ্রাজে যাবার কথা জুলাইয়ে—যদি যাওয়া হয় তবে দেব সেখানে। বেরুলে শুনতে পাবে।

তুমি একটি কাজ করবে? তোমার বাবার কাছে জেনে নেবে ১০ম স্কন্ধের ৩২ অধ্যায়ের ২০ শ্লোকটির ঠিক অর্থ কী?

নাহন্তু সখ্যো.... ইত্যাদি শ্লোকটি, বুঝলে? বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টিকায় ভালো করে এর ভাবার্থ পরিগ্রহ করা ভার হয়েছে। যারা শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করে তাদের সঙ্গে নষ্টলব্ধধন ঐহিক মানুষের উপমাটির সার্থকতা কোথায়। সংস্কৃত ভালো ক'রে জানলে হয়ত এটি বুঝতে পারতাম। ধন্যোঽহসি—এসব বুঝতে পারছি। আমি কাল রাত সাড়ে বারটা পর্যন্ত পড়েছি এই ৩২ অধ্যায়টি দশম স্কন্ধে। পড়তে পড়তে সময়ে সময়ে এত গৌরব হয় এই ভক্তির ঐতিহ্যের কথা ভেবে। মনে হয় কী সৌভাগ্য আমার যে এদেশে জন্মেছি:

ভারত আমার ভারত আমার কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী? বটেই তো ভীষ্মের স্তবটিও কী অপূর্ব পুষ্পিতাস্তা ছন্দে!

সত্যি, ভাগবতের কাব্যমাধুর্যও আর এক বিস্ময়কর ব্যাপার। কৃষ্ণের ছবি যেন জ্বলজ্বল করছে সর্বত্র। মনে কেবল দুঃখ হয় তাঁর ঐ শ্লোকটি পড়তে পড়তে (১০/৩২/২১) :

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং মাসূয়িতুং মাঽর্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ।।

কারণ আমাদের চেতনাকে তন্মুখী করবার জন্যেই তিনি তিরোহিত হন এটা জানলেও তিনি প্রত্যক্ষ না হ'লে পরোক্ষভাবে তিনিই আমাদের অনুরাগের জনয়িতা ও গ্রহীতা এ জেনে সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। সত্যি গোবিন্দ, সময়ে সময়ে খুব দুঃখ বোধ করি তাঁর দেখা পাই না ব'লে। কিন্তু এ প্রত্যয় এসেছে যে তাঁর সঙ্গে মিলন হবেই যদি ওর গোপীদের মতন বলতে পারি সর্বান্তঃকরণে:

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাং স্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা। ১০/২৯/৩২

কী অপরূপ কথা! কী তন্ময়তা। মন্ময়তার লেশও নেই এখানে। ভাগবত পড়লে বোঝা যায় ভক্তি কাকে বলে। গীতায় মাত্র ইঙ্গিতে বলা হয়েছে 'অনন্যা ভক্তি'র সম্বন্ধে, কিন্তু ভাগবতেই মিলল ভক্তির বিশ্বকোষ—মূল উপলব্ধি, কাব্যপ্রকাশ, ভাষ্য, ব্যাকরণ সব জড়িয়ে। ঠিক সময়েই ওরা আমাকে ভাগবত উপহার দিয়েছিল কলকাতায়, নইলে এমন পড়া হ'ত কি এহেন বই?

একটা মজার কাহিনী বলি। পরশু একটা বই শেষ করলাম চৈনিক লেখক Lin Yutang এর বিখ্যাত A Leaf in the Storm. কিন্তু প'ড়ে ধ্যানে গিয়ে (মার কাছে) একটুও ধ্যান হ'ল না। কাল সকাল থেকে ভাগবত নিয়ে থাকার ফলে রাতটাও বড় সুন্দর কেটেছে। রাত একটায় যখন পড়ছিলাম কৃষ্ণকে ফের দেখে:

তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ।

পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দ সংপ্লুতা—১০/৩২/৮

তখন চোখে সত্যি জল এল এহেন ভক্তি কী দুর্লভ ভেবে। সাধে কি দেবদেব বললেন তাদের (১০/৩২/২২)

ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ—এ ভক্তি না হ'লে বৃথাই মানবজন্ম গোবিন্দ। মন সময়ে সময়ে বড় হাহাকার করে ভাই। তোমরা আমার জন্যে প্রার্থনা করবে তোমার বাবাকে বলবে আমার কথা শ্রীকৃষ্ণকে বলতে যেন তাঁকে পাই একান্ত ক'রে শুধু তাঁরই জন্যে যেন ভাগবতের সেই ব্রাহ্মণপত্নীদের মতন বলতে পারি:

গৃহ্ণন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ সুতা বা ন ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ কুত এব চান্যে।

তস্মাৎভবৎপ্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং যো নান্যা ভবেদ্ গতিররিন্দম তদ্বিধেহি।।

১০/২৩/৩০

এখনো এ ও তা ভালো লাগে যে—তাই তো বলতে পারি না মনমুখ এক ক'রে: 'নান্যা ভবেদ্ গতিররিন্দম!'

ভাগবত থেকে বাঁধা কয়েকটি গান খুব গাই আজকাল। একজন সাধিকা গানের সময় প্রতিবারই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পান নানা ভঙ্গিতে। সেসব শুনে তবু সান্ত্বনা পাই একটু। তবে দর্শন কবে পাব ভাবতে বড়ই দুঃখ হয় সময়ে সময়ে। কিছু আর ভালো লাগে না আজকাল। ভাগবত ছাড়া আর সব বই টই পড়াই ছেড়ে দিয়েছি। মেলামেশাও খুব কম। আজ এখানেই ইতি ভাই। তোমার জয় হোক। এত কম বয়সে ভক্তি হয়েছে তোমার ধন্য তুমি। তোমার খবর দিও। পরে আবার লিখছি। তোমার বাবা মাকে আমার সভক্তি প্রণাম দেবে। আমার স্নেহালিঙ্গন নিও ভাই।

ইতি স্নেহাধীন মন্টুদা

৪.

ওঁ

C/o S. M. Gupta Esq
"MARLBOROUGH"
STERLING ROAD,
MADRAS.

৩/৮/৪৪

ভাই গোবিন্দ

তোমার চিঠি এখানে পেলাম পরশু। পেয়ে বড় আনন্দ হ'ল। তোমার পিতৃদেবকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করবে ও বলবে ঐ গোপীস্তবটির পাঁচটি শ্লোক সেদিন গ্রামোফোনে দিয়েছি সংস্কৃত ও বাংলা সমেত। অর্থাৎ জয়তি তেহধিকং

গেয়েই "বৃন্দাবন তব...." ইত্যাদি। সুরটি স্তবের উপযোগী করেই বেঁধেছি যাতে ভক্তচিত্তে প্রসন্নতা আনতে পারে। এছাড়া ভাগবতের মেঘস্তব (১০ম স্কন্ধে বৃন্দাবনবাসীদের) নিয়েও একটি গান দিয়েছি গ্রামোফোনে সেটি যদি কপি করার সময় পাই তবে এই সঙ্গেই পাঠাব নৈলে পণ্ডিচেরি ফিরে পাঠাব তোমার কাছ থেকে জবাব পেলে। এখানে আরো গুটিকয়েক ভাগবতী গান বেঁধেছি আমার বন্ধু গুপ্তমহাশয়ের সুরম্য প্রাসাদের রম্যতর উদ্যানে ব'সে। এই উদ্যানে ব'সেই—একটি গাছতলায়—তোমাকে লিখছি চিঠি।

তোমার ভক্তির সাধনা সার্থক হোক এই প্রার্থনা। আমিও বুঝতে পেরেছি যে ঐকান্তিক অনুরাগ না হ'লে তাঁর দর্শন পাওয়া কিছু নয়। তাছাড়া অক্রূরের স্তব পড়ছিলাম:

অনিত্যানাত্মদুঃখেষু বিপর্যয়মতির্হ্যহম্
দ্বন্দ্বারামস্তমোবিষ্টো ন জানে ত্বাত্মনঃ প্রিয়ম্।। ১০/৪০/২৫

বহুদিন তমসে আবৃত হয়ে থাকলে আলো যে আমাদের আত্মার প্রিয় সে চেতনাও আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এ জগতের হয়েছে তাই। নাস্তিক্যের ডায়াগনোসিস এইখানেই। এই নাস্তিকের ছায়া আমাদের যুগে আস্তিকদেরও বুদ্ধিকে ঢেকে আছে কম বেশি।

যাক আমার একটু খবর দিই। এখানে ৫ই জুলাই এসেছি প্রধানত গ্রামোফোনে গান দিতে । যদি গানগুলি ভালো ওঠে তবে ভক্তদের চিত্তে প্রসন্নতার উদয় হবে—সেই তো গানের পরম পুরস্কার।

শুনে সুখী হবে যে গুপ্তদুহিতা কুমারী মঞ্জুকে অনেকগুলি গান শিখিয়ে গ্রামোফোনে দেওয়ালাম এবার। ওর কণ্ঠ অতি অপূর্ব—হাসির কথা মনে করিয়ে দেয় সত্যিই। আশা করি ওর ভক্তির গানগুলি তোমাদের মনকে তৃপ্ত করতে পারবে। ও ৮ টা salo দিয়েছে ও ৭টা ডুয়েট। আমি ১০টা solo দিয়েছি। যথা

১) বৃন্দাবন তব (জয়তি তেহধিকং)
২) হে মেঘ তোমার (ভাগবত)
৩) চাহি' আঁখির আলোক (ভাগবতী ভাব)
৪) এমনি স্মরণে
৫) চাঁদিনি রাত (রাহানার একটি গানের তর্জমা)

হিন্দি :

৬) দীন দয়াল গোপাল হরি
৭) ইতনা তো করো হে স্বামী জব প্রাণ তমসে নিকলে
৮) মোসে কাহেকো প্রীত জুয়াই হরি
৯) বলিয়ে ন দেখন কি লীলা
১০) সীতাপতি রামচন্দ্র (তুলসীদাসের).

ডুয়েট :

১১) অবিস্মৃতি: কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো:—শ্যামলচরণ যুগলে...

১২) মা তোর ঐ হাসি (ঘুমপাড়ানি)
১৩) মন্দির নেই নেই প্রতিমা
১৪) হম ঐ সে দেশকে বাসী হৈঁ
১৫) চাঁদনি রাত (রাহানার মূল হিন্দি)
১৬) বন্ধন নাশো মন্ত্রবরে (সূর্যস্তব) অশোকা ও আমি
মঞ্জু ও অশোকাকে ডুয়েট দেওয়ালাম:
১৭) ঐ বহিল ধারা
১৮) তুমি গাও পাখি বসন্ত এলো আজি (এখানে বাঁধা গান)
মঞ্জু একা গাইল:
১৯) এযে কোন্ কর্মনাশা
২০) এ দেশের দিক দিগন্তে
২১) কৃষ্ণরাতে ভাঙল যে ঘুম
২২) তব চির চরণে
২৩) চিন্তামণি বৃন্দাবনে
২৪) বিরহের পটে আঁকিব ছবি
২৫) অজব তমাশা তেরা সাঁবল
২৬) বৃন্দাবনকী মঙ্গললীলা
সবশুদ্ধ এই ২৬টার যদি অর্ধেকও ভালো ওঠে তবে মন্দ কী?
তোমার খবর দিও ভাই। এখানে গানও করতে হচ্ছে খুব। আজও রাতে গান আছে। কাল আশ্রমে ফিরছি। ফিরে কৃষ্ণপ্রেমকে লিখব।

ইতি তোমার স্নেহবদ্ধ মন্টুদা

৫.

ওঁ
হরিকৃষ্ণাশ্রম
পুণা

গুরুপূর্ণিমা
৫/৭/৫৫

ভাই গোবিন্দগোপাল

তোর চিঠি প'ড়ে খুবই আনন্দ হ'ল—আমি একটা ধর্মসম্বন্ধীয় উপন্যাস মতন লিখেছি—চারটি গল্পের সমষ্টি—সেইটির শেষ গল্পটির মাজাঘষা নিয়ে ব্যস্ত এমন সময়ে এল তোর চিঠি। সব ছেড়ে পিঠ পিঠ জবাব দিতে বসলাম। কিন্তু তোকে লিখব কী বল্? লিখলে কি চিঠির উত্তর দিস্ তুই? এমন কি বই পাঠালেও জানাতে ভুলে যাস বই পেলি কি না।

তোর উপর আমার অনেক আশা রে ভাই! তুই জয়ী হ, যশস্বী হ, পুণ্যশ্লোক পিতার পুত্র তুই, নির্মল স্বভাব, বিদ্বান, গায়ক তার উপর বিনয়ী—তোর গুণ গাইতে হ'লে চতুর্মুখ হ'তে হয় (দশানন নয় কিন্তু)। তাই সে পণ্ডশ্রম রেখে দুটো যা মনে আসে লিখে যাই—যখন হাতে একটু সময় পেয়েছি আজ।

মাধুরীর সঙ্গে তোর শুভপরিণয়ে আমি যে আনন্দিত হয়েছি এ-খবর আগেই দিয়েছি। প্রার্থনা করি সেই যেন তোর শুধু সঙ্গিনী না, সহধর্মিনী হয়ে ভগবদ্‌ভজনে

জীবন সার্থক করে। গানের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ভজনে—শিল্পায়িত গানে তো নয়। তোদের মধ্যে ভক্তিভাব উত্তরোত্তর ফুটে উঠুক আর এই হোক তার বাহন এই তোর সুদূর প্রবাসী মন্টুদার সর্বান্তরিক কামনা। লোকের কথায় কান দিসনে—লোকে কী না বলে? ইন্দিরাতে আমাতে মাঝে মাঝেই তোর সুকণ্ঠের আর সুশীল স্বভাবের আলোচনা করি। আমি একটু সাধনায় সুপ্রতিষ্ঠ হ'লেই আশা করি তুই এসে কিছুদিন আমাদের আশ্রমে থেকে আরো কিছু ভজন শিখে নিবি আমার কাছে। আমি প্রস্থান করলে তুই থাকবি আমার আদরের গানগুলি গাইতে ভাবতেও আনন্দ।

কিন্তু আমার শরীর তো খারাপ হয়নি। আমি ভালোই আছি। তবে সাধনায় ঠাকুরের অজস্র কৃপা পেলেও এখনো নিজেকে তাঁর চরণে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে পারিনি বলে আজকাল প্রায়ই নির্জনবাস করছি। রবিবার ছাড়া কারুর সঙ্গে দেখা করি না। ফী রবিবার ভজন হয় এখানে, শতাধিক লোক আসে ভজন শুনতে গুণী জ্ঞানী ভক্ত অনেকেই। আমাদের আশ্রমটি সদ্যোজাত এখনো হামাগুড়ি দিয়েই চলছে—তবে আশা করছি ঠাকুরের কৃপায় সে অদূর ভবিষ্যতে একটু সোজা হয়ে চলে হেঁটে বেড়াতে পারবে। তখন তোকে ডাক দেব, তুই আসবি তো?

তোর মাতৃদেবীর জন্যে ঠাকুরের একটি ছবি পাঠালাম। আমার কুন্ত সম্বন্ধে ইংরাজি বই বেরুলে স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দকে এক কপি পাঠাতে চাই, কিন্তু তাঁকে বই পাঠালে কোনো সাড়াশব্দ পাই না ব'লেই যা ভাবি। পাঠালে তিনি কি পড়বেন? 'দেশে দেশে চলি উড়ে' কি তিনি দেখেছেন? বহু মনীষী বইটির প্রশংসা ক'রে লিখেছেন। স্বামীজি পড়লে খুশি হতাম। যাক! হ্যাঁ তাঁর ইংরাজি কবিতা দুটি পেয়ে আনন্দ পেলাম।

আমি সম্প্রতি ভাগবত থেকে ইংরাজিতে শ্রীদাম ও অম্বরীষের কাহিনী লিখেছি—কবিতায়। তোকে পাঠাব না কি? স্বামীজিও যদি পড়ে তো খুব খুশী হই।

আমার ধর্মসম্বন্ধে একটি উপন্যাস লেখা শেষ হ'ল এমাসে। চারটি গল্পে একটি চতুরঙ্গ উপন্যাস। দেশে দেশে চলি উড়ে-র সম্পাদক সাগ্রহে উপন্যাসটি ছাপতে চেয়েছেন। এ চারটি অঙ্গের বা পর্বের প্রথমটি গত বৎসর গল্পভারতীতে বেরিয়েছিল শারদীয়া সংখ্যায়। দ্বিতীয়টি জ্যৈষ্ঠের গল্পভারতীতে বেরুবে। বোধহয় জ্যৈষ্ঠের গল্পভারতী দুচার দিনের মধ্যেই কলকাতায় আত্মপ্রকাশ করবে আষাঢ়স্য শেষ দিবসে। ওদের বলেছিলাম ও গল্পটির প্রুফ তোকে পাঠাতে। ওরা লিখেছিল পাঠাবে। কিন্তু বৈদ্যনাথ লিখেছিল মাসখানেক আগে যে তুই আলমোড়ায় যাচ্ছিস। কৃষ্ণপ্রেমের ওখানে কি গিয়েছিলি? যদি গিয়ে থাকিস তবে তার কথা লিখিস। কিছু তোর চিঠিতে লিখিসনি ব'লে মনে হচ্ছে— তোর হয়ত যাওয়া হয়নি। তোর পদ্মাক্ষরে প্রাঞ্জল ভাষায় জানাস কী কী কথা হ'ল কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে—মানে, যদি এর মধ্যে সেখানে যাওয়া ঘটেই থাকে।

একটি কাজের কথা বলি—বিশেষ যখন তুই লিখেছিস আমার জন্যে কোনো কাজ করতে তুই রাজি। এই ধর্মোপন্যাসটির তৃতীয় গল্পটির মধ্যে ইন্দিরার জীবনীকে উপজীব্য ক'রে অনেক কিছু লিখেছি। এটি দেশের সম্পাদক জিতেনকে পাঠিয়েছি সে লিখেছে

মাসিক বসুমতীতে ছাপতে চায়। জিতেনকে লিখে দিয়েছি এ গল্পটির প্রুফ যদি তোকে দিয়ে দেখিয়ে নেওয়া হয় তবে ভালো হয়। পরে চারটি গল্প বই হয়ে বেরুবে—আশা করছি এ বছরের শেষে। দেখা যাক।

মস্ত চিঠি লিখে ফেললাম। এখানে সাধনায় মন দিয়েছি—। ডুবতে চেষ্টা করছি পুরোপুরি, কিন্তু এখনো পারিনি। আজ গুরুপূর্ণিমা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি যেন সব মনটা তাঁর চরণে গুটিয়ে আসে। জাগতিক সাধ-আশা প্রায় সবই ঝ'রে গেছে—ঠাকুর কৃপাও করেছেন অজস্র—বিশেষ ক'রে পুণ্যবতী ইন্দিরার মাধ্যমে। তার অপরূপ ভক্তি হয়েছে। কথায় কথায় সমাধি হয়— রোজ চার পাঁচ ঘন্টা সমাধিতে থাকে রাতে। এ-সদ্যোজাত আশ্রমটির ওই প্রাণ। বিগ্রহটিকে নিয়ে প্রায়ই বিভোর হ'য়ে থাকে। কত রকমের দর্শনই যে হয়। পরশু শিবের গান করছিলাম। 'ভূতনাথ ভব' ও দেখল শিবকে। এর আগে একদিন কৃষ্ণভজন করছিলাম দেখল কৃষ্ণকে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা—কৃষ্ণকথায় প্রায়ই ওর সমাধি হয় নয়নং গলদশ্রুধারয়া বচনং গদগদরুদ্ধয়াশিয়া অবস্থা হয়। এখানে অনেকেই ওকে দেখতে আসে—বিশেষ করে ওর সমাধি। গানও ও দিনের পর দিন dictate করে চলেছে। তোকে দুএকটা পাঠাচ্ছি এইসঙ্গে।

আমার স্নেহাশীষ নিস তুই ও মাধুরী। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোদের জীবন যেন ধর্মের সিঞ্চনে ফুলে ফলে ভ'রে ওঠে।

ইতি স্নেহানুগত মন্টুদা

৬.

পুণা
১৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৫

ভাই গোবিন্দগোপাল

তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। কিন্তু শ্রীগোপীনাথ কবিরাজকে আগে আগে সব বইই পাঠাতাম, চিঠিও লিখেছি অনেকগুলি। কোনো সাড়াশব্দ না পেয়েই ধরে নিয়েছিলাম তিনি নিজের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত। যাই হোক তাঁর প্রশংসোক্তি প'ড়ে কলকাতায় লিখে দিয়েছি প্রেমাঞ্জলি ও দেশে দেশে চলি উড়ে তাঁকে পাঠাতে। খগেন্দ্রনাথ মিত্র আমার পিতৃবন্ধু, আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন। কালিদাস নাগ, সুনীতিকুমার, রথীবাবু—এরা আমার বন্ধু, তাই বই পাঠাই, বন্ধুকে উপহার দিতে ইচ্ছা করে। আর আমি বই ছাড়া কী উপহারই বা পাঠাতে পারি?

উত্তরপাড়ায় গঙ্গাতীরে মার্চমাসের গোড়ায় আমার থাকার সুবিধে হবে কি? মানে তোর দাদার বাড়িটা পাওয়া যাবে কি? গেলে দিন পনেরর জন্যে যেতে পারি। আমার হার্নিয়ার অপারেশন হবে এমাসেই—২২শে জানুয়ারির পর। তার আগেই হ'ত, তবে ভাবলাম জন্মদিনে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে 'বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্' সারা হ'য়ে গেলে অপারেশন করাই ভালো। অপারেশনের পর দুতিন সপ্তাহ শয্যাশায়ী থেকে এলাহাবাদ যাব আমাদের

প্রিয় বন্ধু বিধুভূষণের বাড়ি। (ইনি এবৎসর চীফ্ জাস্টিসের পদ থেকে অব্যাহতি নিয়ে পেনসন পাচ্ছেন)। প্রয়াগে রোজ গঙ্গাস্নান করে বড় আনন্দ পাই। মা গঙ্গা কেন জানি না আমাকে বড়ই টানেন। অথচ অপারেশনের পর হরিদ্বারে যাবার ইচ্ছা হ'ল না। ওরা বলছে plastic surgery -র নবোদ্ভাসিত অপারেশনে হার্নিয়া সম্পূর্ণ সেরে যায়। হরিদাস বৈষ্ণবকে জিজ্ঞাসা করবি—একথা সত্য কি না? কারণ তিন সপ্তাহ শয্যাশায়ী হ'তে কে আর চায়—যদি সারার আশা বিশেষ না থাকে?

আমার শরীর মোটের উপর ভালোই আছে। তবে দিনে দিনে তো পুনর্যৌবন লাভ হচ্ছে না—মহাকালের হাতছানিই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। আশা করি পাড়ি দেবার আগে ঠাকুরের পুণ্যদর্শন পাব। কৃপা তাঁর ঘনিয়ে উঠছে। —নিত্যই তাঁর নূতন আশীর্বাদ পাচ্ছি বটে, কিন্তু বস্তুলাভ তো হয়নি এখনো তাই সময়ে সময়ে মনটা আকুল হ'য়ে ওঠে। সাধনায় ডুব দেবার চেষ্টা তো করছি— তবে বোধহয় যথাসাধ্য করা হচ্ছে না, এখনো গড়িমসি আছে—তাই ঠাকুর সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন না। ইন্দিরা তরশুদিনও নামকীর্তনের সময় বালগোপালের দর্শন পেয়েছে—রোজই দুতিন ঘন্টা সমাধিতে থাকে— গভীর রাতে। অনেক কিছুই ওর দর্শন হয়—নানা দেব দেবীই আসেন। সবচেয়ে ভালো লাগে ওর গভীর ভক্তিভাব ও পবিত্রতা। তাই বুঝি জন্মকোটি সুকৃতৈর্নলভ্যতে কৃষ্ণকৃপা পেয়েছে। পরম ভাগ্যবতী—উচ্চাধিকারী বৈ কি। নৈলে ৩০ বৎসরে সবিকল্প সমাধি লাভ হয়, ৩৫ বৎসরে নির্বিকল্পের স্বাদ পায়? তাই মনে হয় এমন শিষ্যা যখন ঠাকুর মিলিয়ে দিলেন তখন কি শেষ পর্যন্ত নিজে লুকিয়েই থাকবেন? তবে এ-ও জানি দোষ আমরই। বহু সময় নষ্ট করেছি বাজে কাজে দহরম মহরমে। সব ছেড়ে তাঁকে যদি চাইতাম তবে অনেক আগেই তাঁর দেখা পেতাম। বাধা তো তাঁর দিক থেকে নয় ভাই, বাধা আমার নিজের দিক্ থেকে যে। অহং মরেও না মরে রাম অসুর যে। তবে আশা আছে—ডুব দিতে পারব মনে হয় যদি ঐকান্তিক হ'তে পারি। সেই চেষ্টাই করছি।

একটি কাজের কথা লিখে এ-পত্র শেষ করি। আজ গল্পভারতীর অনুরোধে ওদের আর একটি গল্প পাঠিয়েছি—**ঠাকুর কী পারেন**—এর শিরোনামা। ওদের তোর ঠিকানা লিখে এখুনি লিখে দিচ্ছি যেন ওরা প্রুফ তোকে পাঠায়। এসব গল্পগুলি একত্র ক'রে আমার জন্মদিনের পরে বই হ'য়ে বেরুবে—ওরা বই নিয়েছে সানন্দেই। তাই তোকে বলা—ফের প্রুফটা দেখে দিস, কেমন? তোকে কষ্ট দিতে সাধ যায় না—তবে একাজ আর কেই বা করতে পারে? সুতরাং—

২৮শে এখানে থেকে ফের রওনা হচ্ছি মাদ্রাজে। বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের কর্তারা কিছুতেই ছাড়লেন না। পাথেয় দিচ্ছেন— air conditioned -এ। যাব লিখে দিলাম। সেখানে ৩১শে ডিসেম্বর, ১লা ও ২রা জানুয়ারি সম্মিলনের অধিবেশন। তুই আসবি? আয় না। দেখা হয় তাহ'লে। মাদ্রাজে আমি থাকব ইন্দিরার বোনের ওখানে— c/o Diwan N.L.Nanda 65 Harrington Road Madras 3।

নৈলে হয়ত মার্চে দেখা হ'তেও পারে যদি উত্তরপাড়ায় গঙ্গার ধারে বাড়িটিতে

দুসপ্তাহ থাকা সম্ভব হয়। তোর দাদাকে শুধাস। তবে এলাহাবাদ থেকে সহজে ছাড়া পাওয়া যাবে না এ-ও ঠিক। সেখানে বড় যত্নে রাখেন বন্ধু। বড় স্নেহময় উদার মানুষটি। তাঁকে ভালোবেসে ফেলেছি আমরা দুজনেই।

ইন্দিরা তোদের তার আন্তরিক প্রীতি পাঠাচ্ছে। মাধুরী ও তুই আমার স্নেহাশীষ নিস। এ চিঠি তোদের দুজনকেই টিপ ক'রে লেখা। তাই তাকে আর আলাদা লিখলাম না।

ইতি নিত্যাশীর্বাদক দিলীপদা

৭.

ওঁ

পোস্টমার্ক ২৫.৬.৫৬

ভাই গোবিন্দগোপাল, তোর চিঠি পেয়েই উত্তর দিচ্ছি। এঁরা ছবি করতে যাচ্ছেন মূলধন বিনা? অভিনেতা অভিনেত্রী কাউকেই কিছু দেবেন না! আমাকে অনেকে কথা দিয়ে কথা রাখেননি, তাছাড়া টাকার জন্যে কিছু আমি আদালত করতে যাব না। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে আমার পক্ষে সিনেমার সঙ্গে সংশ্রব না রাখাই ভালো। সুধীরবন্ধুবাবু শুভলক্ষ্মীকে হ'লে টাকা নিশ্চয়ই দিতেন। যত আপত্তি আমার বেলা। যাই হোক, আমি ১০টি গানের সুর দিতে রাজি হ'তে পারি এই সর্তে:

১) অগ্রিম ১০০০্ দিতেই হবে

২) এছাড়া চুক্তিপত্রে সাত কিম্বা আট পার্সেন্ট দিতে হবে—সাতের কম নয়।

৩) ছবিতে বা কাগজপত্রে কোনো উল্লেখ থাকবে না আমাদের সদ্যোজাত আশ্রমের। চুক্তি হবে তাঁতে আমাতে। Business is business— সেখানে আশ্রমের পুণ্য নাম ঢোকানো কোনো কাজের কথা নয়।

একথাটা বলছি আরো এইজন্যে যে এখানে আমাদের এক শুভার্থী বন্ধু গায়ে প'ড়ে সুধীরবাবুকে বলেন আশ্রমকে সাহায্য করতে ইত্যাদি। আমাদের আশ্রম থেকে কখনো কিছু চাওয়া হয় না। তাই আমাদের আশ্রমের সম্বন্ধে কোনো কাগজে বা ছবিতে কোনো বিজ্ঞাপনই যেন না থাকে। আমরা বিজ্ঞাপন বা অর্থশালীদের করুণা চাই না। চুক্তি অনুসারেই কাজ হবে as man is man. টাকা নিয়ে দরদস্তুর করতে কার ভালো লাগে—বিশেষ আজকের দিনে—আর জেনে অর্থই অনর্থের মূল? তবু লিখলাম যে নিজে থেকে যদি আসে ও ওঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে দেন (শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ নীতি মেনে) তবে ওই তিন সর্তে আমি রাজি হ'তে পারি নইলে নয়। Moral obligationএর প্রশ্নই ওঠে না কেননা ওঁরা আমার অনুমতি না নিয়েই কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছিলেন যে আমি Music Director হব। এতে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলাম। তাছাড়া লক্ষ টাকা ব্যয় হয় একটা ছবি করতে—সবি কি ধারে হয়? অথচ ওঁরা অগ্রিম কিছুই দিতে চান না।— এ অবস্থায় bonafides সম্বন্ধে স্বতই সন্দেহ আসে না কি? কত লাভ হ'ল না হ'ল আমি কি তদন্ত করতে যাব? ভাইরে, বহু জনকে বিশ্বাস ক'রে বারবার ঠ'কে ঠ'কে

তবে শিখেছি আমি এই চিরন্তন সত্যটি যে things are not what they seem. পূজ্যপাদ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ আমাকে স্নেহপত্র লিখে ধন্য করেছেন। তাঁর কথা পরে লিখছি।

ইতি তোর নিত্যশুভার্থী মন্টুদা

৮.

ওঁ

১৯.৩.৬৩

স্নেহের গোবিন্দ

কদিন থেকেই তোর কথা মনে হচ্ছিল —কেন জানি না। কিন্তু সম্প্রতি এই সৈনিকদের জন্যে টাকা তুলতে এত বেগ পেতে হয়েছে হাজারো খুঁটিনাটিতে যে সাধ থাকলেও বড় চিঠি লেখার সাধ্য ছিল না. আর তোকে বড় চিঠি লিখতে ভালো লাগে—কেন তা কি বলতে হবে। তুই শ্রদ্ধাবান্ শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত সুগায়ক আরো কত গুণ তোর। সর্বোপরি সহজ সৌকুমার্য ও মাধুর্য তোর কবচ কুণ্ডল। বড় ঘরের ছেলে তার উপর সদাচারী। তোর অনুরাগী না হবে কে?

কেবল আমার কি হয়েছে জানিস? মন গুটিয়ে আসছে। দুনিয়ার হালচাল তো ৬৬ বৎসর ধরে দেখলাম। ভালো অনেক কিছুই দেখেছি, কিন্তু ক্রমশ বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন আরো নানা পরিচিতদের মধ্যে দেখি ধর্মে গভীর অবজ্ঞা। তাদের সঙ্গ তাই আর ভালো লাগে না। দুঃখ বাজে। কিন্তু ঠাকুরের যে-কৃপাস্পর্শ পাচ্ছি দিনের পর দিন তাতে কি আর এসব বাহ্য দুঃখ থাকে? তবে মুস্কিল হয় এই যে যাদের এক সময়ে খুব কাছের মানুষ মনে হত তাদের সুদূর মনে হ'লে একটু খেদ হয়ই। সেই সময়ে তোর কথা মনে হয় আরো—যে তুই অন্তত দূরে সরে যাসনি—ধর্মভীরু ও ভগবৎপন্থী হয়ে আরো কাছেই এসেছিস। জয় গোবিন্দ জয় রাধে।

আমার জীবনে নানা মোড়ই নিতে হয়েছে আমাকে নানা সময়ে। সম্প্রতি আর একটি মোড় নিয়েছি—শ্রীরাধার বিগ্রহ এনে। জয়পুরে পেয়েছি এ বিগ্রহটি। অনেকদিন থেকেই চাইছিলাম কিন্তু বহু খুঁজেও পাইনি। ইন্দিরার এক দর্শন হ'ল—জয়পুরে শ্রীরাধা ধরা দেবেন। মিলে গেল। এত সুন্দর রাধামূর্তি আমি কখনো দেখিনি। তোকে যে ছবিটি পাঠিয়েছি তার চেয়ে অন্তত দশগুণ বেশি সুন্দর। ফলে হল কি—আজকাল কৃষ্ণের চেয়ে রাধার কথাই বেশি মনে হয়। প্রার্থনায় দেখি তাঁকেই ডাকছি কৃষ্ণকে ছেড়ে। কৃষ্ণপ্রেমকে লিখেছিলাম। সে খুব আনন্দ পেয়েছে। লিখেছে রাধাকৃষ্ণ অভিন্ন—ইত্যাদি। কিন্তু আমার জীবনে এ নতুন উপলব্ধি, কারণ শ্রীরাধার কথা আমি কস্মিনকালেও ভাবিনি। অথচ দুদিনে এ কী হ'ল—উঠতে বসতে কেবলই শ্রীরাধার কথা মনে হয়! প্রায়ই গাই চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পদাবলী (কালও সন্ধ্যায় গাইছিলাম মন্দিরে):

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী কিশোরী গলার হার।

কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন কিশোরী চরণ সার।।
কিশোরী চরণে পরান সঁপেছি ভাবেতে হৃদয় ভরা।
দেখ গো কিশোরী অনুগতজনে কোরো না চরণছাড়া।।
কিশোরীর দাস আমি পীতবাস ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটি যুগ যদি আমারে ভজয়ে বিফল ভজন তার।।
কহিতে কহিতে রসিক নাগর তিতল নয়নজলে।
চণ্ডীদাস কহে নবীন কিশোরী বন্ধুরে করিল কোলে।।

কণ্ঠে জেগে উঠল যেন যৌবনের জোয়ার। সবাই বলছে বৃদ্ধের কণ্ঠের এহেন জৌলুষ হ'ল কী করে? তারা তো জানে না শ্রীরাধার কাহিনী কল্পনাকথিকা নয়—বাস্তব সত্য—তাঁর কৃপা চিরদিনের পাথেয়! অঘটন আজো ঘটে-তে মন্দিরার কাহিনী মনে পড়ে? ঘটনাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু কে বিশ্বাস করবে এযুগে? আর যারা বিশ্বাস করে না এসব কথা তাদের কাছে কী কথা কইব বল্? স্পুটনিক, রকেট, রেডিওর কীর্তি? না, আণবিক শক্তির ধ্বংস করার দানবিক প্রতিভা? না গোবিন্দ, ও হবার নয়। তেলে জলে মিশ খায় না। ভেবে দেখলাম নাস্তিকের সঙ্গে আস্তিকের বাহ্য প্রীতির সম্বন্ধ থাকতে পারে কিন্তু অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক টেঁকে না। টিকতে পারে না। আমি যে-সত্য যে-নীতি যে-মন্ত্র সমস্ত জীবন দিয়ে অনুসরণ করি, যে-রঙে আমার তনুমনপ্রাণ রাঙিয়ে তুলতে চাই, যে-ভাবের রসে প্রতি মুহূর্ত রসিয়ে উঠতে চাই সেসব যাদের কাছে অবান্তর বা মিথ্যা বলে মনে হয় তাদের সঙ্গে কী নিয়ে কথা কইব? মনে পড়ে কেশব সেনের যখন অসুখ করেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতাকে কেঁদে বলেছিলেন: 'কেশব যদি চলে যায় মা, কার সঙ্গে কথা কইব?'

রাধারাণীর কৃপাই বোধ করি ধীরে ধীরে আমি এইভাবে একান্তী হচ্ছি— চলতি যে-সার্বভৌমিকতা মানুষের কাছে এত বড় হয়েছে—শুধু আহারবিহারের ক্ষেত্রে মিলেই মিলতে চাওয়া, তেল নুন লকড়ির প্রাপ্তিই সবার বড় এই প্রচারকেই সর্বোত্তম সত্যের বাণী বলে বরণ করা এসবই মনে হচ্ছে মায়া—মানুষ কখনই শুধু আধিভৌতিক মিলের ভিৎ-এ দাঁড়িয়ে স্বপ্নের আকাশকে ছুঁতে পারবে না, জানতে পারবে না দেবজন্মের মহিমা। কী? অন্ন ও ব্রহ্ম? মানি। কিন্তু ব্রহ্মের সত্যস্বরূপের রসস্বরূপের গভীরতম প্রকাশ নয়। বেদ মিথ্যা বলেনি—অন্নের চেয়ে বড় প্রাণ, প্রাণের চেয়ে মন, মনের চেয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের চেয়ে আনন্দ যার অন্য নাম প্রেম। এই প্রেমের দীক্ষা আজ চাইতে হবে আমাকে রাধারাণীর কাছে। কারণ তাকে ভালোবাসতে না পারলে, বিশ্বের প্রতি জীবে শিবদর্শন হবে না হতে পারে না। তাই আজ যদি অতীতকে বিদায় দেবার ডাক এসেই থাকে তবে বিদায় দিতেই হবে—বলতে হবে নেতি নেতি—যা কিছু ঠাকুরের আন্তর সত্যের স্থূলতর বা আংশিক প্রকাশ মাত্র তাকে ছেড়ে উঠতে চাইতে হবে সূক্ষ্মতর মহত্তর ও পূর্ণতর সত্যের কোঠায়।

গত পাঁচই তারিখ একলা বসে গাইছিলাম—অন্ধকারে। মন্দিরে নয়, উপরে আমার বারান্দায়। গাইছিলাম রাধার বিবাহবেদনার গান—কৃষ্ণ আসবেন 'রাধার তৃষিত অন্তরব্যথা নাশিতে'—এই ভরসার গান। ভাব এসেছিল—বহুক্ষণ ধরে গাইলাম গানটি আঁখরে পর

আঁখর কেটে। গানের শেষে দেখি সামনে ইন্দিরা বসে—চোখের জলে তার বুক ভেসে গেছে। বলল: 'রাধারাণীকে দেখলাম নীল শাড়ী পরা—তার প্রতি অঙ্গ থেকে রূপের বিদ্যুদ্দাম ঝলকাচ্ছে। তিনি অঝোরে অশ্রুবিসর্জন করছেন আর প্রতি অশ্রু মাটিতে পড়ে ফুটে উঠছে পদ্ম হয়ে। এমন অপরূপভাবে তিনি কখনো আমাকে দর্শন দেননি।' মনে হ'ল বহুদিন আগে কৃষ্ণপ্রেমের আশ্রমে মন্দিরে গাইতে গাইতে গাইতে ঠাকুর দর্শন দিয়েছিলেন, তবে আমি দেখিনি, দেখেছিলেন যশোদা মা। এ-দর্শনের কাহিনী স্মৃতিচারণে লিখেছি। ইন্দিরার দর্শনের কথাও কোনোদিন লিখবই লিখব।

কিন্তু পরে। আজ নয়। অনেক লিখেছি। এবার লেখা ছেড়ে ডাকতে হবে বেশি বেশি করে—একান্তী হতে হবে কৃষ্ণপ্রেমের মত। তার পথ আমার নয় জানি, কিন্তু এক স্থলে আমাদের গভীর মিল আছে (যদিও সে আমার চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে আজ)—যে, আমরা দুজনেই রাধারাণীর কৃপা পেয়েছি। তাই সেই তো হবে অন্তরঙ্গ বাকি যারা ভগবানকে মনে করে অবান্তর বা কুসংস্কার তাদের বহিরঙ্গ সঙ্গ আমাকে ছাড়তেই হবে। তবে 'ছাড়তে হবে' বলছিই বা কেন? রাধারাণী কি ছাড়িয়ে নেননি? আমার আগেকার বন্ধুদের মধ্যে কাকেই বা আজ আমার আত্মীয় মনে করি—বলতে পারি আমার প্রাণসাধনার কথা? না, ভাবের ভাবী না হলে ভাবের বিনিময় হয় না—হতে পারে না। তোর সঙ্গে এ বিনিময় হচ্ছে এই-ই হল আনন্দের কথা। বাকি সব মায়া। আমি একটি বাউল গানে লিখেছিলাম:

ছাড়তে যখন হবেই রে মন, মিথ্যে কেন জড়িয়ে থাকা?
ছাড়ার মাঝেই পাওয়ার বাণী—এইটি শুধু মনে রাখা।
এতদিন যা ছিলি ধরে
উঠল কি তায় জীবন ভরে?
দাগ কি তবু কাটবি জলেই—শুনবি ফিরে পিছু ডাকা?
ছাড়ার মাঝেই পাওয়ার বাণী—এইটি শুধু মনে রাখা।

ছাড়ার কান্না অবুঝ—মেনে নে ওরে মন, সোজাসুজি।
মাটি ছেড়ে মেঘ ওঠে যেই—মাটি কাঁদে অম্‌নি বুঝি!
জানে না সে—মেঘের কোলে
তারি ফুলের ফাগুন দোলে,
মাটিতে যে বন্দী ছিল আকাশে সেই পেল পাখা
ছাড়ার মাঝেই পাওয়ার বাণী—এইটি শুধু মনে রাখা।

চিঠি লেখা সত্যিই কমিয়ে দিয়েছি। ইচ্ছে করে নয়—মরে গেছে আপনি আপনি। এখন শুধু চাই রাধারাণীকে ডাকতে। কর্ম ঢের করেছি—পরেও করব জানি। কিন্তু না পেয়ে কর্ম আর ভালো লাগছে না। তাই বলছি ঝরে যাচ্ছে—ছাড়ার কান্না আর কান্নাও থাকছে না, মনের রং যাচ্ছে বদ্‌লে। এখন তোরা আমাকে আশীর্বাদ কর্‌—যেন শুভসংকল্প বজায় থাকে—যা ছাড়তে হবে যেন সহজিয়া ছন্দেই ছাড়তে পারি—নৈলে রাধারাণী কৃপা করবেন কেন? শুধু তাঁকে না চাইলে তো তাঁকে মিলবে না—ঐ একটু কৃপা পেয়েই

পথ চলতে হবে, তাতে মন ভরবে না তো। মন যাতে পুরোপুরি ভরে তাকে মেলে না যদি তাকে চাই পাঁচমিশেলির মধ্যে। তাহলে তীরে এসেও ভরাডুবি হবে—বাঁশি শুনেও দেখা পাব না। আমার স্নেহাশীষ নে। ইতি

তোদের নিত্যশুভার্থী দিলীপদা

ওঁ

১৩ আষাঢ় ১৩৭৪

বিলির তারিখ ৩.৭.৬৭

স্নেহাস্পদেষু
গোবিন্দ

সে কী কথা? 'সুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ' প'ড়ে ফেরৎ দিবি? বৃদ্ধ বয়সে আর দুঃখ দিসনে গোবিন্দ! আমার বইয়ের বিশেষ আদর নেই বাংলাদেশে—শ্রীমৎ শিশির ব্রহ্মচারী খেদ করেছেন। ঠিক বলেছেন। কিন্তু দুচারজন তো তবু পড়ে। তাদের মধ্যে তুই একজন— দিক্‌পাল। এ হেন তুই হাতছাড়া হ'য়ে গেলে কাকে নিয়ে ঘর করব বল্ দেখি? দেখ না কেন শিক্ষাব্রতী ভাইস চ্যান্সেলারদেরও বই পাঠালে তাঁরা পড়েন না— ময়রায় সন্দেশ খায় না বলে না? এরূপ ক্ষেত্রে এক আধজন ডক্টর সাংখ্যতীর্থও এগিয়ে না এলে সান্ত্বনা দেবে কে?

না, ঠাট্টা নয়— অশ্রুল সত্য। (অশ্রুল = my coinage চালাস tearful অর্থে) আমি যে দুচারজনের জন্যে (আমার কাছে) লিখি তার মধ্যে তুই একজন প্রধান এ আমি হলফ করে বলতে পারি। তাছাড়া যে পঁচিশ কপি আমাকে প্রকাশক দিতে রাজি হয়েছে (অতি সদয় হ'য়ে) সে পঁচিশ জনের মধ্যে যদি তুইই না পড়িস তবে পড়বে কে? কাজেই আর বাণ হাসিসনে গোবিন্দ—শকুন্তলার ভাষায়—'ন খলু ন খলু বাণং সন্নিপাত্যোহয়ম্ অস্মিন্ মৃদুনি মৃগশরীরে।'

এবার একটু গম্ভীর হই। তোর পত্রম্ আমার কাছে সর্বদাই 'স্বাগতম্' একথা মনে টাঙিয়ে রাখ যাতে উঠতে বসতে আর কখনো না ভুলে যাস। ইন্দিরাও তোর প্রতি বিরূপ নয় মোটেই। তুইও তো দেখি কম স্পর্শকাতর নোস, কবে কে কী বলেছে এত মনে করে রাখতে আছে? তোকে যে আমরা গভীর স্নেহ করি তুই কি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিস না? আমার তরফ থেকে আরো বলবার কথা এই যে, তোর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ দু-পুরুষের—তোর পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর স্নেহ থেকে সুরু আমাদের প্রীতিনাট্য। এ নাটকে কত আনন্দের গর্ভাঙ্ক আমাদের জীবনমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে ভেবে দেখ একবার। তাছাড়া আমার এ অস্তাচলে প্রয়াণ-লগ্নে তোদের মত 'সহস্রেষু কশ্চিৎ'-এর সম্বন্ধেও যদি মনে ভরসা না পাই—যে আমাকে এক আধবার মাঝে মধ্যে স্মরণ করবি অদূর ভবিষ্যতে—তা হ'লে এ-'চিরসায়মান' বিশ্বে আর কার ভরসা করব?

শ্রীমৎ অনির্বাণের কথায় আমি ভরসা পেয়েছি বৈ কি। কেবল তথাপি ভয়ও আছে যথেষ্ট। আমার কর্ম তো এখনো পুরোপুরি নিষ্কাম হয়নি, তাঁর মত।

একথা সত্যি যে অর্থলোভ আমার নেই—কোনোকালেই ছিল না বললেও হয়ত সত্যের অপলাপ হবে না—কিন্তু যশের কামনা কত প্রবল ছিল তুই তো জানিস। বহু অশ্রুল প্রার্থনার অন্তে যশের বাসনা আজ নিস্তেজ হয়েছে বটে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিরাজ করছে না কি? আগে চাইতাম—দেশের দশের একজন হতেই হবে, এখন না হয় মনে হয় 'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু' কতিপয়ের সাধুবাদ কাম্য। তবু এ-ও তো ঠিক নিষ্কাম নয়। হে গোবিন্দ হো গোপাল! ভাবের ঘরে চুরি ক'রে কেউ কি ঠাকুরকে পেয়েছে? সত্যের অপলাপ ক'রে কি সত্য-স্বরূপকে মেলে? ঠাকুর বলতেন না কি—সত্যে আঁট না থাকলে ভগবান্‌কে পাওয়ার আশা দুরাশা? তাই সত্যের খাতিরে বলতে আমি বাধ্য যে যশের কামনা একেবারে লুপ্ত হয়নি মকরধ্বজের মতন বাঁটতে বাঁটতেও সূক্ষ্ম অণু রূপে বিরাজমান। নইলে কি মনে লাগত ছাই উপাচার্যদের অবহেলায়?

না, এ হাস্য নয় গোবিন্দ, করুণ হাস্য। অথঃ এ-কামনাকেও আমার কাটিয়ে উঠতেই হবে। বললে চলবে না—'অমুক অমুক স্থূল বাধা যখন স'রে গেছে তখন গুরুজিকী ফতে!' না, ফতে হবার দেরি আছে।

তবে একটা ভরসা আছে যে ভগবানকে চাওয়ার মধ্যে আমার কোথাও গলদ নেই, সেইখানে ভাবের ঘরে চুরি নেই। তাই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি—যদি দরকার মনে করো তো যে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ফেলেছ তুমি, (কারণ আমি সত্যিই চাইনি সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে) কেড়ে নাও—আমায় নিঃস্ব করো—আমি চাই অকিঞ্চন হ'তে অন্তরে বাহিরে।

কেবল এইটুকু প্রশ্ন মনে জাগে আজো—এ অফুরন্ত কর্মপ্রেরণা, নানাদিক দিয়ে সমৃদ্ধ জীবন কি সম্ভব হ'ত আমার পক্ষে কৃচ্ছ্রসাধন করলেই। দুরকম উত্তর পাই। এক, কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দিয়েও এক ধরনের আন্তর সমৃদ্ধি আছেই আছে, নইলে বহু শ্রেষ্ঠ বরেণ্য সাধকও কৃচ্ছ্রসাধনের ব্রতী হতেন না দেশে দেশে যুগে যুগে। অন্য উত্তরটি এই সবাইকার পথও যেমন এক নয়, পরীক্ষাও তেমনি আলাদা—ভিন্নমুখী। আমার মনে হয়-বহু বহু শুভার্থী শুভার্থিনীর মধ্যে থেকে তাদের সঙ্গে দহরম মহরম করা পথেই আমাকে নিষ্কাম নিরাসক্ত হতে হবে। কেবল থেকে থেকে মন বিষণ্ণ হয়, যদি না পারি এ পথে নিরাসক্ত হ'তে তা'হলে? বার্ধক্যে সুরু করতে হবে নির্জনে বাস হরিনাম সম্বল ক'রে—কৃচ্ছ্রপন্থী হয়ে?

কিন্তু তাহ'লে কি সরাসরি বৈকুণ্ঠের রথযাত্রার পথ খুলে যেত? কৃচ্ছ্রসাধন করেন এমন অনেক সাধককে কি আমরা সবাই দেখিনি যারা বিশেষ কিছুই পায়নি - 'বস্তুলাভ' হওয়া তো দূরের কথা। তবে? কেন মনকে ধিক্কার দেওয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকার জন্যে-উপবাসে দিন কাটছে না বলে? না গোবিন্দ, আমি ভেবে দেখেছি যে আমি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকলেও স্বভাবে বিলাসী নই। যদি হ'তাম তাহ'লে দিনের পর দিন এত অশ্রান্ত পরিশ্রম

করতাম না—দুবেলা দুমুঠো শুদ্ধান্ন গ্রহণের পরে। স্যর চুনিলাল আমাকে একবার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: 'তুমি এত বেশি খাটো কেন দিনরাত মাসের পর মাস বছরের পর বছর? তোমার খাটার তো দরকার নেই অন্নসংস্থানের জন্যে?' আমি খাটি কেন? শুধু কি যশের জন্যে? না কখনই নয়—একটু যশের ইচ্ছার ফিনকি লুকিয়ে আছে, থেকে থেকে বৃহদাকারও হয়ে দুঃখ দেয় মানি। কিন্তু তাব'লে একথা সত্যি নয় যে, যশের জন্যেই আমি খাটি। আমি খাটি—না খেটে আমি থাকতে পারি না ব'লে। পণ্ডিচেরিতেও আমি কর্মিষ্ঠ ছিলাম। কিন্তু সেইখানে চিত্ত বিক্ষেপের নানা অলিগলিতে সময় নষ্ট হত কিছু। এখানে সে সব পথও হ'য়ে গেছে বিস্বাদ—মন একান্ত হ'য়ে এসেছে কর্মসাধনায়ই বলব—যদিও বিশুদ্ধ কর্মযোগী আজও নই মানি কিন্তু আমার কর্মের প্রেরণার মূল ফলাকাঙক্ষা নয়, মূল হল কর্মের জন্যই কর্মের তাগিদ—urge, তথা এর ফলে আনন্দ। এমন কি প্রুফ দেখতেও আনন্দ পাই আমি সত্যি বলছি। সম্প্রতি শরৎচন্দ্রের দুটি গল্পের ইংরাজী অনুবাদ নিয়ে যে-পরিশ্রম করেছি দিনে ৮/৯ ঘন্টা করে কেবল মোহান্ত ইন্দিরা ও শ্রীকান্ত জানে। ফ্রেঞ্চ জর্মন পড়ি—পাছে ভুলে যাই। প্রেমল বৈরাগীর আরো ১০০ পাতা লিখে ফেলেছি—কত প্রবন্ধ গল্প চিঠি গ্রন্থপাঠ (স্বাধ্যায় নাই হ'ও, পাঠ তো) দিনে লেখা ও পড়ায় ৮/১০ ঘন্টা ক'রে সময় যায়। তার উপর গান গাওয়া সুর দেওয়া স্বরলিপি, ইন্দিরার গানের পর গানের অনুবাদ—আশ্রম-সংবাদ (bulletin) লেখা... ইত্যাদি ইত্যাদি। এত রকমের কর্ম করি কেন? —যখন স্যর চুনিলালের ভাষায়-না করলেও আমার অন্ন কেউ মারতে পারে না? এইজন্যেই নয় কি যে কর্মের মধ্যে দিয়ে কিছু একটা মহৎপ্রাপ্তির আভাষ পাই?

এই কথাই শ্রীমৎ অনির্বাণকে একাধিকবার ব'লে উত্তর পেয়েছি যে মা ভৈঃ—শেষ রক্ষা হবে। এক ব্রহ্মজ্ঞ সাধুও এসেছিলেন (ইন্দিরা তাঁকে ধ্যানেও দেখেছে—তিনি বলেছেন: 'আমাকে ঠাকুর পাঠিয়েছিলেন পুণায়') তিনি আমাকে স্বহস্তে লিখেছেন: 'বস্তুলাভ হোগী।" আরো যা লিখেছেন আশ্চর্য! তাঁর সম্বন্ধে পত্রটি পাঠালাম।

আজ আর নয় গোবিন্দ। চিঠি লেখা ছাড়া অন্য কর্মও তো আছে ভাই। তবু ঠাকুরকে বলি থেকে থেকে:

মিছে কাজে রেখে জড়ায়ে
(কেন) করো এ ছলনা বন্ধু বলো না
মায়ার খেলা ভুলায়ে?

'যোগী কৃষ্ণপ্রেম'? মুনশিজি করণ সিংহকে কথা দিয়েছেন (নিতান্ত রাজপুরুষ ব'লেই) যে এবৎসর বই বেরুবেই বেরুবে। তবে ডিসেম্বরের আগে যে বেরুবে এতটা ভরসা নেই আমার। ওদের তো আঠারো নয়, আটাশ মাসে বৎসর। মুনশিজির মহাপ্রেসে ছাপা হচ্ছে আজকাল রকমারি টেলিফোন ডাইরেক্টরি। অথচ উনি আমার কাছ থেকে ২০০০৲ অগ্রিম বায়না নিলেন Yogi Krishnaprem ছাপার। বললেন মোহান্তকে সদীর্ঘশ্বাসে: 'আমার টাকা নেই।' টাকার কুমীরের কী কুম্ভীরাশ্রু। (বশীদা আলমোরা থেকে আমাকে লিখেছেন: 'মুনশিজি সাধুর কাছ থেকে টাকা নিলেন সাধুর বই ছাপতে!

হরি হরি বলো দাদা—কলৌ হরির্ণামৈব কেবলম্....') অথচ মুনশিজি সত্যই বলেন (অতিরঞ্জিত নয়) যে তিনি পূর্বজন্মে বেদব্যাস ছিলেন। বেদব্যাস-মুনশিজি!! হরি হরি বলো মন।

একান্ত ও প্রশান্ত ৪ঠা জুলাই বম্বে থেকে উঠে দেশে ফিরবে। মন আমাদের বিষণ্ণ। পুরো এক বৎসর ছিল ওরা এখানে। একদিনও চায়নি আর কোথাও যেতে, আশ্রমে আমরা আজকাল নিরামিষাশী, ওরা সানন্দেই নিরামিষ অশন বরণ করেছে। আশ্রমের সব কাজই করে যা ইন্দিরা ওদের বলে—এমন কি 'স্নানাগার' মার্জন পর্যন্ত। একান্ত কত সুন্দর সুন্দর কবিতাই যে লিখেছে! ঠাকুরের কৃপা যদি না থাকত আমার পরে তবে কি ইন্দিরার মতন কন্যা শিষ্যা, একান্ত প্রশান্ত শ্রীকান্ত মোহান্তর মন বন্ধুশিষ্য পেতাম? নাঃ। রবীন্দ্রনাথের গানই বরণীয় :

নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে।

'আধিরাত' হ'তে চলল। যাই। যদিও ঠাকুর আধিরাতে দর্শন দেবেন না—তবে যদি শেষরাতে দেন? কে বলতে পারে? তাই

হরিনাম কর অনিবার মরণের দুর্লগনে
জপিলে অমরতার পারি বর এই জীবনে—বলতে বলতে ইতি করি।

আঃ দিলীপদা

পুঃ। কাল শেষ রাতে অনির্বাণজীকে স্বপ্নে দেখলাম। আর এক পরমসুন্দর যোগীকে। কিন্তু অপরিচিত। সে-যোগী বললেন: 'আকাশগতি তিনি আয়ত্ত করেছেন।'

১০.

৩০ আশ্বিন ১৩৭৪
সংক্রান্তি
১৭.১০.৬৭

চাও চিঠি? হায়, ছিল এমন দিন—যেদিনে হু হু ক'রে
চিঠির পরে চিঠি আমি—লিখতাম হেসে কলস্বরে!
কিন্তু সে যৌবনের বেগে—চলত যখন খুশখেয়ালে
মন তনু প্রাণ রোজ গেয়ে গান উচ্ছলতার সুরে তালে।

সেদিন এখন নেই, তবুও তোমার ভক্তি-অর্ঘ পেয়ে
ধরছি কলম, যা আসে তাই লিখব, দেখি বেয়ে ছেয়ে
ছড়ায় ছন্দ—মিল-আবেগে কী অঘটন ঘটে এবার :
যায় ফুরিয়ে যদি কথা—জুটবে ওজর বিদায় নেবার।
'সুস্থ' জীবন চাও তুমি যে আমার—ভালোই লাগল এতে।
কিন্তু কে চায় 'দীর্ঘ' আয়ু জরার চাপে খাবি খেতে?
খুঁড়িয়ে চলা, দৃষ্টি শ্রুতির জবাব দেওয়া— 'মেনেছি হার',

এ-ই কি ভালো—না না না, নেই লালসা এ-বরের আমার।
সত্তর আজ পেরিয়ে গেছে—আর কেন এ ধূলা খেলা?
চাই যাঁকে—তাঁর কোলে ফেরার সময় এল সন্ধ্যে বেলা।
গান ঋষি: 'নেই চাইতে আশু মরণ, কি বা দীর্ঘ জীবন
যাই কেন না আসুক পথে করতে হবে সুখে বরণ।
ভৃত্য যেমন প্রভুর হুকুম করতে তামিল চেয়ে থাকে,
তেমনি থেকো পথ চেয়ে—নাথ কখন তোমায় কাছে ডাকে।'
দিন গুনছি—শুন্‌ব কবে সে-ডাক অকূল বাঁশির স্বনে :
সুর মিলিয়ে যার সুরে চাই দিতে পাড়ি বৃন্দাবনে।
নেই খেদ, সেই ভয় ভাবনার লেশও আমার অন্তরে আজ।
ভক্তকে তার রাঙা পায়ে ঠাঁই দেবেনই সে-ব্রজরাজ।
উধাও খেয়ায় পেয়েছি তো নানা প্রবাল দ্বীপের দেখা।
হার মেনেও লাভ করেছি কীর্তিতে যা হয়নি শেখা।
জয়ধ্বনি করতালি কুড়িয়েছি তো দেশে দেশে।
নিত্যনতুন রঙিন দোলে চলেছি তো ভেসে ভেসে।
কত কবির পদাবলী জাগিয়েছে তো চমক প্রাণে।
উঠেছি তো উজিয়ে কত রূপের দোলায় ফুলবাগানে।
মন ভরেনি তবু—বাঁধা তাই পড়িনি মোহন মায়ায়,
হয়েছি ভ্রাম্যমাণ আবার—না জেনে সে কিসের আশায়।
ঘা খেয়েছি, ভার সয়েছি, ভুলিনি ভাই তবুও তাঁকে,
হাতছানিতে ডাকেন যিনি আলো ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে।
নিরাশ হয়েও হইনি 'সিনিক্', না হয়েও গুরুবাদী
প্রতি পদেই গুরুর কৃপা পেয়েছি শ্যামলকে সাধি'।
'গুরুই ভগবান্' না মেনেও স্নেহের আশিস তাঁর পেয়েছি।
'জন্মে জন্মে সেই গুরুকেই পাই যেন'—এই গান গেয়েছি।
'যা দেখেছি, যা শুনেছি তার তুলনা নেই'—সঘনে
করিনি এ উলুধ্বনি উচ্ছ্বাসেরও উচ্চারণে
এ-জীবনে অঢেল মধু পান করেও চেয়ে সুধা
বাসন্তী আনন্দভোজেও রয়েছি অতৃপ্ত ক্ষুধা।
সেই ক্ষুধারই সন্ধানে তাই মিলল শেষে কৃপার দিশা:
পেলাম দেখা ভক্তি-উষার পার হয়ে সংশয়ের নিশা।
তাই গাই: 'আমায় ভালোবাসো সত্যি যদি—ডাকে তাঁকে
গেয়েছি যাঁর নামগান আমি বেদনায় ও অশ্রুরাগে
কত ভাবে ছন্দে ভাষায় মন্ত্রে আশায় স্বপ্নে নিতি:
'তাঁকে বাসে ভালো যে—পায় অন্তরে সবায় অতিথি।'

জীবনকে সেই পরম প্রেমের আগুন বলেই চিনতে হবে
গাও তাঁরি পায় ঠাঁই চেয়ে: 'আর কিছুই আমি চাই না ভবে।'
বিজয়ার স্নেহাশিস।

ইতি

তোমার নিত্যাশীর্বাদক

দিলীপদা

১১.

ওঁ

২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬

১১.৬.৬৯

স্নেহাস্পদেষু

তোর ১০ই তারিখের চিঠি আজ পেয়ে খুশী হয়েছি, কারণ অনেকদিন তোর খবর না পেয়ে ভাবছিলাম হয়ত তুই কোনো অজ্ঞাত কারণে আমার প্রতি রাগ করেছিস। ভেবে পেলাম না কী কারণ হতে পারে। আজ তোর সানন্দ পত্র পেয়ে ভরসা পেলাম। নববর্ষে তুই প্রত্যেকবার লিখিস এবার লিখলিনি তাই একটু ভাবিত হয়েছিলাম।

আমার শ্যামাসঙ্গীতগুলি আনন্দময়ী মার প্রেরণায় লেখা নয়। তাঁর এখানে অভ্যুদয়ের আগেই গানগুলি বেঁধেছিলাম। গোবিন্দ কৃষ্ণকে 'বাতিল'ও করিনি। আমি আশৈশব কখনো মা-কে কখনো কৃষ্ণকে ডেকে এসেছি। পিতৃদেবও শ্যাম ও শ্যামাকে অভেদ মনে করতেন আমিও করি। 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভরে' বলেছেন কবিগুরু। কথাটা সত্যি। শুধু গান নয় সুরও এল চমৎকার চমৎকার—মনে হয় শুনলে সম্ভবত: তোর ভালো লাগত। বিশেষকরে 'ভালোবাসি বলা সহজ কঠিন কেবল ভালোবাসা' গানটি। আশা করি আগামী বৎসরে কলকাতায় গিয়ে ফের সেখানে আমার গানের অনুরাগীদের সামনে এ গানটি গেয়ে শোনাতে পারব। তখন শুনিস।

আমি নানা কাজে ব্যস্ত থাকি। সত্যিই খুব দরকারি চিঠি ছাড়া চিঠি বড় একটা লিখি না। তাছাড়া মনে হয় প্রায়ই যে চিঠিপত্র কমাবার সময় এসেছে, একান্তী না হলে শেষরক্ষা হবে না। আমার মন সত্যিই একটু ব্যাকুল হয়েছে কর্মের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে গানে বা ধ্যানে ডুবতে। পারছি না এই দুঃখ। দুঃখটা কাল্পনিক নয়। তাই হয়ত সম্প্রতি সহসা গানের তোড় নামল একে একে আঠারোটা গান লিখে ফেললাম—সুর দিয়েছি তার মধ্যে ১০টি গানের। ঠাকুর হয়ত সান্ত্বনা ও ভরসা দিলেন এইভাবে। কে জানে?

চিঠি বড় করব না। তোরও সময় কম, আমারও তাই, আমার জন্য প্রার্থনা করিস যেন আমি সত্যি একান্তী হতে পারি। শেষরক্ষা না হলে বড় খেদ থাকবে তাই মনটা সময়ে সময়ে উদ্বিগ্ন হয়। তার উপর আগামী ২২-এ জুন আমার ডান চোখের ছানি কাটা হবে। তারপর একমাস জড় পদার্থের মতন চুপচাপ থাকতে হবে। নিরুপায়। যা

আসে সবই ঠাকুরের বিধান বলে বরণ করে নিতে হবে। আমার ভালোবাসা নিস। সারাদিন খেটে ক্লান্তি। এখন এগারটা বাজল। যাই।

ইতি, তোর নিত্যশুভার্থী দিলীপদা

পুনশ্চ। শ্রীমৎ অনির্বাণের পত্রটি পাঠালাম—অর্ধেকটা কপি করেছি। ভুলচুকগুলো তুই শুধরে নিয়ে বাকি অর্ধেকটার অনুলিপি পাঠালে আমার খুব উপকার করা হবে। অনির্বাণের 'পত্রলেখা' পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। দ্বিতীয়বার পড়া সুরু করেছিলাম, কিন্তু ইন্দিরা কেড়ে নিল। ডান চোখে ছানি কাটা হলে ফের পড়ব। এ-বই শুধু উপভোগ করার জন্যে নয় জানবার শিখবার জন্যেও পড়ব। অনির্বাণের স্নেহাশিস পাওয়া আমার সান্ধ্য জীবনের একটি মস্ত লাভ—কৃষ্ণপ্রেমের তিরোধানের ক্ষতিপূরণই বলব। আরো আনন্দ হয় ভাবতে যে অনির্বাণ সাবিত্রীর মর্মজ্ঞ। সবিত্রী আমি প্রায় রোজই রাতে পাড়ি স্বাধ্যায় বলে মেনে নিয়ে। এমন মহাকাব্য এ-যুগে আর কেউ লেখেননি। অতীত যুগে মহাভারত রামায়ণ ও ভাগবত ছাড়া আর কোন মহাকাব্যকেই সাবিত্রীর উপরে স্থান দেওয়া চলে না। একদিন আসবে যখন সাবিত্রী বিদেশীরাও পড়বে শুধু জ্ঞানগীতার মতন কাব্যগীতার মতনও বটে। কিন্তু সে-যুগ এখনো আসেনি।

১২.

ওঁ

C/o Sadashivan
Kalki Gardens
Madras-31

২৬.৪.৭২

স্নেহাস্পদেষু

তোর চিঠি বড় দেরিতে এল—ঠিক যখন আমরা মঞ্জুষা ভরছি গানের বইয়ে বাঙ্গালোরমুখী। ২২-এ এখানে এসে পরমানন্দে দিন কাটছে। শুভলক্ষ্মী ও রাধা ৫/৬টা গান শিখেছে। আজ ফের শেখাতে বসব। সকালে ৩ ঘন্টা সন্ধ্যায় দেড় ঘন্টা। তারপর ছাদে ভজন হয়। কাল কবীরের ভজন গাইলাম 'অগন না দহে।' বহু লোক আসছে। হিন্দুতে আমার আসার খবর সদাশিব ছাপিয়ে দিয়েছে বলে সবাই টের পেয়ে গেছে—বৃদ্ধ বলে মানছে না। তাই বৃদ্ধ কণ্ঠকেও তারস্বরে গাইতে হচ্ছে।

আহা, এরা কী অপরূপই যে গাইছে, তোমারে প্রণাম—নিবিড় আঁধারে—মজল আমার মন ভ্রমরা। ওরা ধরেছে ২০টা গান শিখবে—১০টি বাংলা ১০টি হিন্দী। তুলসীদাস কবীর সুরদাস এদেরও গান গাইবে long playing-এ। আমাদের ভাগ্যে আনন্দ ছিল তাই বৃদ্ধ বয়সেও অক্ষম বধির অবস্থায়ও গেয়ে চলেছি ও শিখিয়ে আনন্দ আহরণ করছি। তুই ও মাধুরী থাকলে আমাদের আনন্দ কত বেড়ে যেত! মিলন আছে আমাদেরই কাছে, মোহান্ত শ্রীকান্তও আছে। ইন্দিরা পরশু দুটো নতুন ভজন দিয়েছে আজ এইমাত্র একটি দিল। এখানে এক নামজাদা মারাঠী গায়ক (ইন্দিরার পরম ভক্ত) ইন্দিরার ২১টি মীরাভজনের সুর দিয়েছে। ভাবহ গোবিন্দ, ভাবহ!

আমরা ১০/১২ দিন থাকব নইলে ২০টি গান শেখাব কেমন করে? বাঙ্গালোরে যাবার কথা হচ্ছে। সেখান থেকেও ডাক এসেছে। কিন্তু শেষের ডাক কাছেই তাই বাঙ্গালোরের ডাকে কান দেওয়া চলবে না। আমাদের স্নেহাশিস নিস তোরা।

ইতি—স্নেহাধীন দিলীপদা।

১৩.

ওঁ

প্রায়াহ্ন ২.৯.৭৫

গোবিন্দগোপাল

স্নেহাস্পদেষু

তোকে আজ একটি বড় চিঠি লিখবই লিখব—যা থাকে কপালে। জন্মাষ্টমীতে বহু অতিথি তথা শ্রোতার কাছে গান ভাষণ কলহাস্যের পরে ক্লান্ত ক্রন্দনের দুর্লগ্নে সেপ্টেম্বরের গোলপার্কের পত্রিকায় তোর God as Mother পড়ে ফের হেসে উঠলাম। Mother worship প্রসঙ্গকে তুই চতুরের মত পাশ কাটিয়ে গেলি! ধন্য। যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।

তোর নামডাক হচ্ছে এতে আমি সত্যিই পুলকিত। শ্রীমদ্ভাগবতম্ পড়ছিস গোলপার্কে দুদিন। সাধু সাধু। দেখ্ কী মন দিয়ে তোর কীর্তিকলাপের সুখবর নিয়ে প্রফুল্ল হচ্ছি।

বিমান ঘোষ ২০্ পাঠিয়েছিল অবশেষে। তবে না পাঠালেও আমি নালিশ করতাম না। তাকে লিখব বৈ কি। কিন্তু সে কি কান দেবে? হাসির L. P. তো বার করল না। ওরা নিজের তালেই চলে। তবু লিখব। তুই পিতৃদেবের গান গাইবি এতে আমি খুশী না হয়ে পারি?

কৃষ্ণপ্রেমের ছবি ও চিঠি পাঠাস। শুনে সুখী হবি আমার YOGI KIRSHNAPREM দ্বিতীয় সংস্করণ ওরা সেপ্টেম্বরে শেষে প্রকাশ করবে বলল সেদিন বম্বেতে—S. Ramakrishnan আমাকে সব দপ্তরও দেখাল। কিন্তু না আঁচালে বিশ্বাস নেই। সনৎকুমার ধৃতরাষ্ট্রকে কেন বলেছিলেন: 'সত্যাত্মা ভব রাজেন্দ্র সত্যে লোকা প্রতিষ্ঠিতাঃ?'

হিমাদ্রির কাণ্ডকারখানা দেখে আমি থ হয়ে গেছি। বরেন ঘোষ কে? সত্যদর্শী ঋষি? হায় হায় কালীদা কার মুখে চেয়ে আছেন আজ? না, আমার ভয় নেই। আমি কোনোমতে ঠাকুরের চরণপ্রান্তে দুদণ্ড বসতে পারলেই ধন্য হব। সেই জন্যেই ডাকাডাকি কান্নাকাটি করছি। এ ও তা নিয়ে আর কতদিন থাকব বল্? বস্তুলাভ না হলে গাইতেই হবে (অতুলপ্রসাদ): বিরহে দিন কাটিল কত যে কথা ছিল

কী লয়ে থাকব বলো তুমি যদি রইলে ভুলে! (বঁধু আমার)

এ গানটি আমার বড়ো ভালো লাগে। আমার মনের ছবি—নিখুঁত ছবি যে। কিন্তু তুই 'গান গেয়ে যা গান গেয়ে যা আজীবন—'

গুরুপূর্ণিমার একটি ভাষণ পাঠালাম। ইন্দিরা জন্মাষ্টমীতেও একটি চমৎকার গান

দিয়েছে। সেটি পরশু মন্দিরে গাইলাম সঘনে। শুনে সবাই খুশী।

ওদিকে কলকাতার উপাচার্য আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন চারটি বক্তৃতা দিতে। তাঁকে লিখেছি উত্তর। ভাবিত। পারব কি? বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি যে। ফের কর্মজাল? অথচ নৈষ্কর্মেও তো মুক্তি নেই। তাই উভয়সঙ্কট।

কিন্তু আজ আর নয়। সকালে গীতাপাঠ করে মনটা একটু টাল সামলে উঠেছে। আমার স্নেহাশিস যে ইতি।

তোর স্নেহাধীন দিলীপদা

সায়াহ্ন ২.৯.৭৫

পুনশ্চ। আজ সকালে যে-চিঠিটা লিখেছি এটি তারই পুনশ্চ। আমি দুপুর বেলা বিমান ঘোষকে লিখেছি যে মাধুরী ও তুই পিতৃদেবের গান গ্রামোফোনে গাইলে সব দিক দিয়েই বাঞ্ছনীয় হয়। তাঁর গান বেশি গাওয়া হয় না। যদিও দ্বিজেন্দ্রগীতি স্বরলিপির তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হচ্ছে বলে মনে হয় গুণীদের চাহিদা আর গ্রামোফোন-উৎসাহীদের চাহিদা এক বস্তু নয়। তবু গ্রামোফোনে শিক্ষার্থীদের গান শেখার সুবিধা হয় এ মানতেই হবে। তাই আশা করি বিমান ঘোষ তোদের আমন্ত্রণ করবেন, যদিও আমার কথায় তাঁর টনক নড়বে মনে হয় না। দেখা যাক—যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ।

ইন্দোর গীতা সমিতি আমার কাছে এক গীতার মেসেজ চেয়েছে। অগত্যা পাঠালাম। তোর গীতায় রেখে দিস—থাক না একপাশে প'ড়ে। এবারে দুটি প্রশ্ন করি।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের যে-কপি আমার আছে তার নানা অংশ অশ্লীল ও অপাঠ্য। বঙ্কিমবাবু বলতেন মূল ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের একটি অপভ্রংশ। এ-রটনা সত্য কি?

দ্বিতীয় প্রশ্ন: গীতার দশম অধ্যায়ে আছে "মরীচির্মরুতামস্মি"। রাধাকৃষ্ণ অনুবাদ করেছেন চমৎকার (!!) I am Marichi of the Marut ! আপ্তের অভিধানে মরীচি মানে ray, মরুৎ বায়ু। তাহলে এ সংজ্ঞাটির অর্থ কী?

আমার গীতাভাষ্যের সম্ভবত দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুবে অদূর ভবিষ্যতে। তাই পুনর্মার্জন করছি। একটি পৃষ্ঠায় দেখি ৯.৫ শ্লোকটি বাদ পড়েছে। পুনর্মার্জনেও কিছু বদলালাম। এই পাতাটি তুই ১৩৭ পৃষ্ঠায় আঠা দিয়ে এঁটে আমার মান বাঁচাস। আর ৯.৩৪ এ শেষে লিখে নিস:

Become my loyal devotee and priest,
Bow down and dedicate your better self
To me alone and you'll come home to me.

বিশ্বপ্রপঞ্চে এত দুঃখ জ্বালা-যন্ত্রণা কেন এ প্রশ্নের উত্তরে অনির্বাণ কয়েকটি মনোজ্ঞ কথা বললেও মন মেনেও মানে না, বলে দুঃখ যে ক্রমেই বাড়ছে, এরই নাম কি বিবর্তন? আমার সময়ে সময়ে মনে হয় এ-জাতের মূল প্রশ্নগুলির উত্তর মানস ভাষায় পেশ করা সম্ভব নয়। দুঃখকে বরণ করে নেওয়া শক্ত তবে দুঃখে আরো শরণাগত হওয়ার প্রেরণা হয়ত পাওয়া যায়—অন্ততঃ কেউ কেউ পায়। বুদ্ধির ব্যাকরণে দুঃখশোক সমস্যার

গ্রন্থিভেদ হয় না মনে হয়। তাই উপস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাই আমি মেনে নিয়েছি যে 'তাঁর কাণ্ডকারখানা বুঝতে পারা যায় না— আমি বলি: আমাকে মা, শুদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস শরণাগতি দাও।' অনির্বাণ যে-অবস্থায় জীবন্মৃত আছেন সে অবস্থাকে দেখে কি দুঃখকষ্টের ওকালতি করা সম্ভব? অনুযোগ অভিযোগ না ক'রে Thy will be done বলতে পারি, বলা কর্তব্য এও মানি। কিন্তু দুঃখকষ্টের নিরসন না হ'লে কি সত্যি ভগবৎকৃপাকে মহতী কৃপা বলে বরণ করা চলে? শুধু বলা চলে এ সমস্যার সমাধান করতে আমার বুদ্ধি অসমর্থ। উপরে যে তিনটি লাইন লিখলাম: Bow down....me এইই ঠিক। বাকি থাকুক unsolved discord অন্ততঃ ততদিন যতদিন বুদ্ধির মধ্যে বোধি না অবতরণ করছে।

১৪.

ওঁ

১৫.৩.৭৭

পুণা

গোবিন্দগোপাল
স্নেহাস্পদেষু

তোর চমৎকার চিঠি পেয়ে মন আরো খুশী হ'য়ে উঠল এইজন্যে যে 'গঙ্গাতীরে গীতালি'-র বহির্বাস নির্মলিন হয়নি, মুদ্রণপ্রমাদও অজস্র। নিরুপায়। শুধু জহুরীই ভাবিনি। যাই হোক খোশা নিন্দনীয় হলেও শাঁস সুস্বাদু হ'তে পারে এই সান্ত্বনা।

আমাকে কিছুদিন আগে অলোক রায় লিখেছিলেন তিনি আমার একটি জীবনী লিখবেন ভাবছেন। ভাগ্যক্রমে আমার জীবন—তার মূল্য যাই হোক—আমার অজস্র লেখায় আমি লিখেছি—আমার স্মৃতিচারণে, প্রবন্ধাদিতে, পত্রাবলীতে, উপন্যাসে, গল্পে, নাটকে, রমন্যাসে। তাছাড়া আমার অন্তর্জীবনের অন্দরে যাঁরা পদার্পণ করেননি তাঁরা আমাকে ভুল বুঝবেনই বেশি। তাই সত্যিই আমি চাই না আমার জীবনী কেউ লেখে। তবে মনে হয় কেউ না কেউ লিখবেনই। তাই আমার মনে হ'ল তোকে জানিয়ে রাখা ভালো যে, আমার জীবনীকার যদি কেউ হ'তে পারে তবে সে তুই। কারণ তুই ছাড়া (আর হয়ত শ্যামল, তবে তার সঙ্গে দহরম মহরম হয়নিতো, তাই জোর ক'রে তার অন্তর্দৃষ্টির কথা বলতে পারি না) আর কেউ আমার সাধনার ও ওঠাপড়ার খবর দিতে পারবে ব'লে মনে হয় না। এছাড়া বহু মহাপ্রাণ সাধুর সঙ্গ পেয়েছিস তুই। মহাভাগ পিতার পুত্র। তোর জীবনের পটভূমিকা অনিন্দ্যনীয় তো বটেই।

প্রবোধ সেনের চিঠি পেলাম কাল। তিনি লিখেছেন (১২.৩.৭৭) — 'সাধু গুরুদয়াল ও কবি নিশিকান্ত পেয়েই গোগ্রাসে গলাধঃকরণ ক'রে ফেলেছি। রোমন্থন করার সময় পাইনি। পরে কোনো অলস অবসরে অর্ধ নিমীলিত নেত্রে সে কাজ করা যাবে। গোগ্রাসে গেলার সময়ে যে-আস্বাদ পেয়েছি তাতে মুগ্ধ হয়েছি আর ভেবেছি দিলীপকুমারের লেখনী কি মায়া জানে, কী জাদু ছোঁয়ালে আমার প্রাণে। ছবির পর ছবি যেন ভেসে গেল চোখের সামনে। এমন সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য দুর্লভ'।

তাছাড়া আমার মনে হয় তুই আমার লেখা প্রায় সব পড়েছিস—এখানে হয়ত শ্যামলও তোর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে। কিন্তু সে যাক। আমার এ-কথাটা মনে রাখিস। কারণ আমার কবে যে ডাক আসবে জানি না। হয়ত দুতিন বছর এ-পারে থাকতেও পারি। তবে ওপারের বাঁশির ডাক ক্রমেই কাছে আসছে ব'লে মনে হয়। মনের মধ্যে একটা উদাসীনও গাওয়া সুরু ক'রে দিয়েছে যে তাঁর বরণমালা গাঁথায় আরো মন দিতে হবে, কেবল

নয় সে মালাগাঁথা সহজ। প্রতি রক্তবিন্দু যখন দোলে
তার মুরলীর সুরে তালে, তখনই ফুলের আঁখি খোলে।

এ-উদাসী আমার অন্তর্গহনে ছিল আশৈশবই, কিন্তু হ'লে হবে কি, আমার ধনকৌলীন্যের লোভ না থাকলেও যশকামনা ছিল প্রবল, তথা কীর্তিপ্রতিষ্ঠা। এ দুটি মোহের গ্রন্থিও প্রায় কেটেছে মনে হয়। তবে কর্মে এখনো আসক্তি আছে বলে ভয় করে হয়ত বস্তুলাভ হ'য়েও হবে না। ভরসা কেবল বাঁশির সুর শুনতে পাচ্ছি বলে। সত্যিই শুনি দিনে রাতে। বড় চমৎকার। তবে ভয় করে যদি থেমে যায়—আমি বাঁশির কথা ব'লে ফেলার অপরাধে। কিন্তু না ব'লেও যে থাকতে পারি না ভাই, করি কী? মন্ত্রগুপ্তির সাধনায় কি কোনো দিন সিদ্ধিলাভ করব আমি? মনে তো হয় না। তাই তাঁকে ডাকি— নার্সিং হোমেও ডেকেছিলাম সেদিন (২৫এ অগস্ট, ৭৬) :

এসো, তোমার রাঙা চরণ ধরব, চেয়ে পূর্ণ শরণ
যাই তুমি দাও—করব বরণ, দুঃখ বা সুখ জীবন মরণ।

অহঙ্কার যে এখনো আছে গহন মনে ঘুপটি মেরে। তাই তো দেখেও দেখার সাধ মেটে না, শুনেও শোনার ফল ফলে না যথাবিধি।

তাই ভেবে চিন্তে হাল ছেড়ে দিয়েছি। অশ্রান্ত কর্মে আনন্দ পাই, ঠাকুরকে বলি—ভুলে যেন না যাই যে আমি অকর্তা :

আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী আমি ঘর তুমি ঘরণী
আমি রথ তুমি রথী—যেমন চালাও তেমনি চলি।

আরো অনেক কথা লিখব ভেবেছিলাম। তবে থাক। একটু জিরুই। গত সপ্তাহে মশগুল ছিলাম লেখায় ও বাঁশির সুর শোনার আনন্দে। আমার স্নেহাশিস নিস। পারিস তো শ্রীমৎ অনির্বাণকে এ চিঠিটি পড়ে তাঁর আশীর্বাদ পাঠাস। এখনই নামকীর্তন সুরু হবে রাত নটায়। তাই যাই ভাই।

তোর স্নেহাধীন দিলীপদা

১৫.

ওঁ

৬.৭.৭৭

পুণা

গোবিন্দগোপাল স্নেহাস্পদেষু

তোর স্নেহোচ্ছল চিঠিটি প'ড়ে মনে একটি দুরাশা জাগল—তোকে পটাতে পারি কিনা আমার একটি কাজ করতে। এমন কাজ যার জন্যে একটু বুদ্ধির খেল্ চাই।

ব্যাপারটা এই :

আমার শেষ উপন্যাস (ওরফে রমন্যাস ওরফে ধর্মোপন্যাস) 'পাখা ও বাঁধন'। এটির ইংরাজী অনুবাদও করেছি। বাংলাটি করেছি গত ডিসেম্বরে, ইংরাজী অনুবাদটি এ বছর জানুয়ারি। ইংরাজী অনুবাদটির জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই—কোনো ভালো প্রকাশক নেবেই নেবে—কারণ ওদেশে আমার একটু নামডাক হয়েছে তো। PILGRIMS OF THE STARS নিউয়র্কে ছাপা হবার পরে পঞ্চ কন্টিনেন্ট থেকে পত্র আসছে—এমন কি আফ্রিকা অ্যালজিরিয়া থেকেও। কিন্তু বাংলায় ধর্মোপন্যাস ছাপা সহজ নয়। ছাপলে কাটে, কিন্তু কোনো প্রকাশকই ছাপতে আগ্রহী নয় 'ধর্মের কাহিনী' বলতে। তাই আমি 'প্রেম-অভয়' প্রথম ভাগ 'অমৃত' পত্রিকায় ছেপেছিলাম—এখন বাকসাহিত্য ছাপছে উৎসাহিত হয়ে।

অথ, আমি চাই আমার 'পাখা ও বাঁধন' কোনো সাপ্তাহিকে ছাপাতে—শারদীয়া সংখ্যা আনন্দবাজারে, বা দেশে-এ। কিন্তু এ দুটি পত্রিকার সম্পাদক আমার চিঠির উত্তরে 'নীরবতা' পরিবেষণ করেছেন। শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লিখেছি, তিনি আমার লেখার জহুরী অনুরাগী বলে চেষ্টা করছেন আনন্দবাজার শারদীয়া সংখ্যায় ছাপাতে। কিন্তু ওরা তাঁকেও 'নীরবতা' পেশ করেছে। তাই আমি চাই তুই একবার 'জয় মা' বলে কোমর বেঁধে লেগে যা। বইটি কাল রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠাব। তুই আগে একবার পড়। আমার মনে হয় তোর ভালো লাগবেই লাগবে—তোর মত ধর্মবেত্তা তথা রসগ্রাহী পণ্ডিত কটা মেলে বাংলায়? কিন্তু সময় অল্প। কী করলে কাজ এগোয় আমি জানি না। কিন্তু তুই সর্বতোভাবে ওয়াকিবহাল : অতএব তোর শরণ নিচ্ছি। দেখি তোর প্রভাবের পরিধির মধ্যে এটির মানমূল্য বাড়ে কি না। আজ এই পর্যন্ত। নানা কারণে মন উদ্বিগ্ন। কিন্তু নিজের দুঃখের কথা—বিশেষতঃ দেহদুঃখের—না জানানোই ভালো। দুতিনটি কবিতা পাঠালাম তা থেকে এঁচে নিস। এর বেশি এখন বলব না। আমার স্নেহাশিস নিস। ইতি তোর

স্নেহঋণী মন্টুদা

১৬.

ওঁ

১৮ অগস্ট ১৯৭৭

পুনা

গোবিন্দগোপাল

'সাংস্কৃতিকী' পেয়ে মন খুশীতে ভরপুর হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে রাসেল সম্বন্ধে তোর চিন্তাপূর্ণ মন্তব্য পড়ে। রাসেল একটি বইয়ে সম্প্রতি বলেছিলেন তিনি চান আমাদের মধ্যে যদি একটু 'খৃশ্চান প্রেম' (Christian love) থাকে। তাঁর আরো অনেক গভীর চিন্তা অধ্যাত্মলোকের অনুভূতি-প্রসূত। এ নিয়ে হয়ত আমিও কিছু লিখব একটু সেরে উঠলে—(যদি উঠি অবশ্য)।

কেবল তোর চিঠিতে বিনোভা প্রশস্তি পড়ে একটু চমকে উঠেছি। কোথায় মহাত্মা

গান্ধি, আর কোথায় আচার্য বিনোভা! আশমান জমিন। আমার মনে হয় তুইও পরে বুঝবিই বুঝবি যে বিনোভার মধ্যে সোনা কিছু থাকলেও খাদ এত বেশি—কিন্তু না থাক। তিনি নিজের খাটো দৃষ্টিতে যতটুকু দেখেছেন তার বেশি দেখবেনই বা কেমন করে? (শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়ে: 'মন্টু আমি যা পারি তার বেশি পারব কেমন করে?' তাছাড়া আমার মনে হয় বার্ধক্যের প্রাবল্যও....কিন্তু ফের—আমি।

তোর ভাষা সুন্দর সাবলীল, নানা ব্যাখ্যা ভাষ্য চমৎকার। আমি মাত্র কয়েক পাতা পড়েছি আজ। কাল ফের পড়ব। আমি উপস্থিত পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে তিনটি ভাষণ দিতে কোমর বেঁধেছি।

1) Sri Aur....Ministrel of light
2) ....Faith & love
3) ....Love & Immortality

প্রথম দিয়েছি ১৫ই আমাদের মন্দিরে। উপাচার্য ও শ্রী এস এম যোশী ও আরো নানা বিদ্বান্ পণ্ডিত ধুরন্ধর...সবাই প্রীত। উপাচার্য বললেন: 'চমৎকার আবহ (atmosphere)!' ২৮এ অগস্ট দ্বিতীয় ভাষণ দেব। ১১ই সেপ্টেম্বর তৃতীয়। তারপর জিরুবই জিরুব, লেখা ছেড়ে পড়া ধরব। এখন শ্রীঅরবিন্দের নানা লেখা থেকে উদ্ধৃতি খুঁজতে খুঁজতে হয়রান। লিখে ফেলেছি তিনটি ভাষণ, কিন্তু পুনর্মার্জন চাই আরো। দুবার টাইপ করিয়েছি। উপায় কি? এতে পুনর্মার্জনের শ্রম ডবল হয়ে যায়। নাচার। আজ এইখানেই ইতি করি। কাল কি পরশু আরো লিখে ডাকে দেব। ইতি

আমার অনুবাদটিতে (ডাকে স্বর্গ....) উত্তরা ছাপা হয়েছে—মুদ্রণপ্রমাদ। উত্তরণ হবে। তবে লোকে বুঝে নেবে। তাই মারাত্মক মুদ্রণপ্রমাদ নয়।

পুনশ্চ। মনে হল কিছু খবর দিই তোর মন ভিজোতে।

১৫ই আগস্ট মন্দিরে গুরুতর্পণে গাইলাম প্রথমে আমার রচিত একটি সংস্কৃত গুরুবন্দনা (তোটকে):

তব নৌমি শুভঙ্কর শান্তিবারং।
চরণং কমলাগ্রহমার্তিহরং।।
অরবিন্দমানিন্দ্য মহাপুরুষং।
কনকোজ্জ্বল কান্তিধরং পরমম্।।....ইত্যাদি চারটি স্তবক, শুভলক্ষ্মী আমার সঙ্গে গানটি গাইল তার কিন্নরকণ্ঠে। সবাই উল্লসিত। তারপর আমি আমার সদ্যোজাত ইংরাজী গান গাইলাম প্রায় ঐ সুরে:

We bow to thee....গানটির cyclostyle কপি মন্দিরে বিলিয়েছিলাম। এটি আমার যুবক অনুরাগিবৃন্দ আমার সঙ্গে গাইল। শুভলক্ষ্মীও যোগ দিল। এটি তোকে পাঠিয়েছি কি? মনে পড়ছে না।

তারপর উপাচার্য আমার গুণগান করলেন যথাবিধি। আমি সলজ্জে সুরু করলাম আমার ভাষণ, ঘণ্টাখানেক বললাম সঘনে। মধ্যে আবৃত্তি করলাম 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' বাংলায়—অতঃপর ক্ষিতীশ সেন অনূদিত ইংরাজী Alexandrine

Rabindranath O Aurobindo bows to thee

সবশেষে শোনালাম শ্রীঅরবিন্দের আলিপুরে কৃষ্ণের সঙ্গে দর্শনের ভাষণ ১৯০৮ সালে Uttarpara Speech -এ। এতে 'সনাতন ধর্ম' কী বস্তু বললাম সংক্ষেপে শ্রীঅরবিন্দের Human Cycle থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। আমার নিজেরও কৃষ্ণস্তুতি কিছু পরিবেশন করলাম তবে সংক্ষেপে—কারণ শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে বক্তব্য এত বেশি ছিল যে অন্য কারুর স্তবস্তুতি উদ্ধৃত করার অবকাশ ছিল না।

এ চিঠি লিখছি নিশুৎ রাতে আরাম কেদারায় এলায়িত হয়ে। ক্লান্ত তো? কারণ সন্ধ্যায় ভজন করতে হল আধঘন্টা শিবস্তোত্র, কালীস্তোত্র, মদীয় গুরুবন্দনা (ম্লেচ্ছ তথা দেবভাষায়) ইত্যাদি। রোজ গাই মৃদুকণ্ঠে।

তোর দেবভাষায় অসামান্য অধিকার। তবে এত বয়সে আর ঈর্ষা করা শোভা পায় না। সংস্কৃতের গুণকীর্তনে তোর কণ্ঠ যেন দিনে দিনে শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় reboant হয়ে ওঠে। ধন্য ঝঙ্কার-উদ্‌গাতা!

আজ শয়নং বিধি। নানক স্তোত্রটিও গাইলাম, একটু বদলেছি তৃতীয় চরণে। যথা: (মন্দাক্রান্তায়)

দীপ্রং ধর্ম্যং বিমলমধুরং মন্ত্রণং তে জপামি।
কান্তিং প্রীতিং তব গুরুবর প্রেমনাথ স্মরামি।।
শান্তং শৌর্যং বিনয়মমলং হে মহন্‌ তে নমামি।
ভক্তিজ্ঞান প্রণয়বরদং নানকং পূজয়ামি।.

আমার গভীর স্নেহাশিস নিস। ইতি

স্নেহঋণী দিলীপদা

১৭.

ওঁ

২৭.৯.৭৭

পুণা

স্নেহাস্পদেষু

তোর চিঠি সুদর্শন ও হিমাদ্রি কাল একসঙ্গেই হাজির দিল। সব পড়ে ফেললাম এক নিশ্বাসে। এই ভাষাই তোর স্বকীয় ভাষা—পণ্ডিতি ভাষা এখন আর চলবে না। তাছাড়া এমন চমৎকার বাংলা যে লেখে সে কেন পণ্ডিতি (সেকেলে) ক্রিয়াপদ ছুঁড়ে মারে? চলিতে চলিতে পড়িয়া গিয়া চমকিয়া কাঁদিয়া উঠিতে মাতৃদেবী মারিয়া বলিলেন....ও ছাড় ভাই—স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। তোর অন্তরাত্মার পুনরুজ্জীবন হবে না প্রস্থিত ভাষায়।

কিন্তু এহো বাহ্য না হলেও আসল কথা এ নয়। আসল কথা, তোর অন্তর্জীবনের বিকাশ চলেছে সমানে। সকলেরই প্রতিভা বা গুণপনার বিকাশ হয় না। কিছুদূর এগিয়ে

মানুষ থম্‌কে যায় বা পিছুডাকে কান দিয়ে পাকে পড়ে। তোর সাধুসঙ্গ শাস্ত্রচর্চা চিন্তাকৃতি সবই ফলপ্রসূ হয়েছে। তাই দুরূহ তত্ত্বকথাও তোর লেখায় এত স্বচ্ছ হয়ে দাঁড়ায় যে সুরু করলে সারা না করে থামা যায় না। তাই তোর বাংলা নানা ভাষ্য চিন্তা ভাবের আলোকপাত আমি সত্যি মন দিয়ে পড়ি, অনেক কিছু জানতে তথা চিনতে পারি বলে। আমিও এ সব নিয়ে কিছু কিঞ্চিৎ গবেষণা করি তো, তাই আরো ভালো লাগে সতীর্থের ভাবধারার প্রগতি তথা স্বচ্ছ সচলতা। শুক্লসন্ন্যাসী পিতার প্রিয়পাত্র তুই পিতৃদেবের মানহানি করিসনি। এ কম কথা নয়। কারণ প্রায়ই দেখা যায় ক্রান্তদর্শীর সন্তান হয় ভ্রান্তিবর্ষী। দৃষ্টান্ত নাই দিলাম—চোখের সামনেই তো দেখছিস।

আমার খবর মোটের উপর মন্দ নয়। তবে দেহের দুর্বলতা বোধহয় কাটবে না আর। না কাটুক—মন তাজা আছে এই ঢের। গুরুদেবের নানা লেখা নতুন করে পড়তে হল পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ে Sri Aurobindo Memorial Lecture তিনটি দিতে হল বলে। পড়তে পড়তে মনে হল এ আর এক ধাঁধা: অমন পিতার এ কেমন পুত্র? সাবিত্রীও বারবার পড়ি—প্রায় রোজই পড়ি। সাবিত্রী গীতা আর কথামৃত। কিন্তু গোবিন্দ তাঁর দর্শন পাব কবে? শ্রবণ ভালো কিন্তু দর্শন না হলে কি মন মানে? শৈশবে একটি গান গাইতাম:

আর কবে দেখা দিবি মা হররমা?
ফুরালো মা ভবের খেলা আয় গো মা এইবেলা
দিন দিন তনু ক্ষীণ ক্রমে আঁখি জ্যোতিহীন
এখনো না এলে পরে পরে কি চিনিব শ্যামা?

মহাভাগ গোপীনাথ সান্ত্বনা দিতেন: 'আপনাকে দিয়ে তিনি কয়েকটি কাজ করিয়ে নিতে চান। তারপরে দর্শন দেবেন।' শ্রীমৎ অনির্বাণও লিখেছেন এই কথা। তাই আমি আরো চলেছি কর্মস্রোতে গা ঢেলে।

কিন্তু কী বকছি আবল তাবল? তোরও তো কাজের সীমা নেই। কত কাজই করিস তুই যত ভাবি তত থ হয়ে যাই। এত কাজ তার উপর চাকরি। ঠাকুর এখানে আমাকে কম বাঁচাননি—চাকরি করতে হয়নি আমাকে। তাই আজকাল দুঃখ হয় অনেক সময় অকাজে নষ্ট করেছি বলে। তবে ঠাকুর ক্ষমা করেছেন: ৭৯ বৎসর পর্যন্ত চমৎকার স্বাস্থ্য ছিল তো—তার পর শয্যা নিতে হলেও লজ্জা দেননি তিনি—গান গাওয়া থিতিয়ে এলেও লেখা উজিয়েই চলেছে—এ-যুগের দারুণ দুর্দিনেরও।

আমার সবচেয়ে আনন্দ হয় ভাবতে যে আমি এখনো সমানে গান বেঁধে চলেছি। বম্বেতে শয্যাশায়ী হয়েও কত গান বেঁধেছি, তুই এলে দেখাব, যদিও জানি এসব গানের গুচ্ছ এ-যুগের সাহিত্যিকদের কাছে মান পাবে না। না-ই পাক। এক দিক দিয়ে তো ভালোই। আমার যশঃস্পৃহা ছিল প্রবল—সাহিত্যে (এদেশে) যশ লাভ হয়নি বিশেষ—(তবে আজকাল যেন একটু হচ্ছে। কিম্বা আমার মনের ভুল?) ছায়াপথের পথিক ও Miracles Do Still Happen-এর গুজরাতি অনুবাদ হয়েছে। Miracles-এর মারাঠি অনুবাদও যন্ত্রস্থ। Yogi Krishnaprem-এর উর্দু অনুবাদ বেরুচ্ছে।—তাই গান রমন্যাস

ইত্যাদি কতকটা নিষ্কাম কৃতির মধ্যেই পড়ে না কি? তোদের মতন দুচারজন দরদীর সাড়া তো পেলাম।

কিন্তু ঐ দেখ্, ফের বকে চলেছি। এবার না থামলে আর মান থাকবে না। তুই যে তুই—হয়ত তুইও পড়বি না। কাজ কি?

শেষে কাজের কথাটা বলি। ওরা পাখা ও বাঁধন অমৃত পত্রিকায় যদি না ছাপে তবে বইটা আমাকে ফেরৎ দিস। মিলন পরে ছাপবে বছর দুই বাদে (আমার পতিতা ও পতিতপাবন, স্মৃতিজোয়ারে ও গান প্রেম দেশ ভগবান এই তিনটি রমন্যাস ছাপা হলে) তবে তখন কি আর আমি থাকব রে? তাই চেয়েছিলাম আমার শেষ রমন্যাসটি এখনই ছাপার অক্ষরে দেখে যেতে। প্রেম অভয় বাকসাহিত্য ছাপছে। তাকে পরে একবার ধরব—যদি অমৃত ছাপে তবে সে সাগ্রহে নেবে, নৈলে নেবে কি না কে জানে?

মরুক গে, শোন ভালো কথা বলি—সৎকথা। সম্প্রতি পাঁচটি বাঁশির গান লিখেছি। তুই পড়া হলে যদি পারিস তো শ্রীমৎ অনির্বাণকে একবার শুনিয়ে আমায় ফেরৎ পাঠাস। তিনি কেমন আছেন?

আর ভালো কথা, অমৃত-তে ১৫ই জুলাই আমাদের কথা কী লিখেছিল জানাবি।

আজ আর নয়। এখন গান বাঁধার সময়। দেখি আজ বোধহয় আর হবে না। স্নেহাশিস রইল।

নিত্যাশীর্বাদক
গুণগ্রাহী
শয্যাশায়ী
দিলীপদা

১৮.

ওঁ

১৫.১০.৭৭

নিউদিল্লি

গোবিন্দ

পাঁচদিন বম্বেতে কাটিয়ে যাই ৭ই শিউপুরি--গোয়ালিয়রের কাছে। বন্ধু ধনী ও বন্ধুবৎসল। নিলয় রম্য ও মহান্। এক সপ্তাহ সেখানে নিরন্তর স্মৃতিকথার পাঠ দিয়ে কাল এখানে এসেছি সন্ধ্যায়। এ-ও রম্যনিলয়—সামনের লনে শিশুরা খেলা করে। আমি বারান্দায় আরামে বসে একটি গান কপি করলাম—'ক্ষমাসুন্দর'। এই সঙ্গে তোকে পাঠাচ্ছি, তোর মন পাব আশা করে। শিউপুরিতে ও বম্বেতে একুনে চারটি ইংরাজী কবিতা লিখেছি—পাঠাচ্ছি সেগুলিও। মনের কথা কইব কী সই কইতে মানা, দরদী নৈলে প্রাণ বাঁচে না.....ইত্যাদি।

দেহ দুর্বল এখনো কিন্তু রসনা অবশ্বিত—চলেছে অক্লান্ত। ঠাকুর একদিক থেকে কেড়ে নিয়ে অন্য দিকে ক্ষতিপূরণ করেন বৈ কি। গাইতে মানা? বেশ—বলে চলো

মুখহলসা দৌড়ে। আজ জিরুচ্ছি, তাই মনে হ'ল তোকে একটি পত্রাঘাত করলামই বা নাতিদীর্ঘ।

একটা কথা পুণা থেকে লিখব ভেবেছিলাম, কিন্তু লেখা হয়নি নানা ঝামেলায়। কথাটি এই যে, এক সুশীলা অধ্যাপিকা কল্যাণী চট্টোপাধ্যায় আমাকে দুখানি চিঠি লিখেছেন। তিনি আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখতে চান কারণ দেখিয়ে কেন আমি জনপ্রিয় লেখক বলে প্রখ্যাত হতে পারলাম না এ-অতিবিখ্যাতদের যুগে। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে লিখেছি তিনজনের শরণাপন্না হতে—১) মিলন, ২) শ্যামল, ৩) গোবিন্দগোপাল। যদি তোর কাছে আসেন (আসবেন কি না জানি না) তবে তাঁকে আমার সম্বন্ধে কিছুটা অন্তত ওয়াকিবহাল করিস। আমি তাঁকে লিখেছি (শঙ্কর তো কলকাতায় নেই) ত্রয়ী দিলীপজ্ঞের কাছে দরবার করতে। তাঁকে আমার একটি বই পাঠিয়েছি। পুণায় ফিরে আরো কয়েকটি পাঠাব। তবে পুণায় মাসখানেক বাদে ফিরব তো—ইতিমধ্যে যদি তিনি আমার সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করেন তবে তাঁকে কিঞ্চিৎ ভরসা দিলে ভালো হয় যে তোরা পিছনে আছিস।

আর কী? বলার কথা অজস্র আছে. বাঁশি কতরকম বাজছে দিনে রাতে! শিউপুরিতে একদিন ঘুম ভাঙতেই দেখি—মাঝরাতে—চমৎকার শঙ্করা রাগ বাজছে। আমি এ-রাগে একটি প্রাচীন ভক্ত কবির গান গেয়ে থাকি:

মাকে কেন ডাকিস ভোলা, মাকে কোথা পাবি ভাই?
থাকলে এসে দেখা দিত সর্বনাশী বেঁচে নাই।

পরশুদিন আর এক কাণ্ড। মাঝরাতে ঘুম ভাঙতেই শুনি বিশুদ্ধ জাঁকালো ভূপালী মদীয় ষষ্ঠী তালে ২+৪ ভাগে, যথা

বাঁ শি বা ০ জে ০ হৃ দি মা ০ ঝে ০
আ ছে আ ০ ছে ০ শ্যা ম রা ০০ য় (অথ ছটি তাল)

স্বরলিপি বানিয়ে নিলাম বিছানায় শুয়ে শুয়েই। পাদপূরণ করা গেল (বা শ্লোকপূরণ):

ভালো/বা ০ সে ০ I আ লো হা ০ সে ০ I
কা লো/না শো ০ I ক রু/ণা ০ ০ য় I

আর একদিন গাইছিলাম (স্বপ্নে) রজনীকান্তর: 'তুমি নির্মম করো মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে।' গানটি আমার বড় প্রিয় গান। ঘুম ভাঙতে শুনি—ওমা, অবিকল সেই সুরে বাঁশি ডেকে চলেছে!! অবিকল!!!

আজকাল স্বপ্নে নানা কাণ্ড ঘটছে—বোধহয় জাগ্রত লগ্ন দুর্লগ্ন বলে—সে সব ব'লে বোঝবার নয়—শুনে ভরসা পাবার। ঠাকুর ভরসা দিচ্ছেন বৈ কি—স্বভাবে কৃপণ তো নন, তবে বড় বেশি পর্দানশীন। তাঁর বাঁশি গায়:

ভরসা আমি দিয়ে থাকি, কেবল তাকেই দিই
আমাকে যে কেঁদে ডাকে—কোলে টেনে নিই।
শুধু, মানুষ যেমন ঢঙে আমার আলো চায়
ঠিক তেমনটি সুরে আমার পায় না সাড়া হায়!
প্রেমকে তারা ভাবে উচ্ছাসরঙিন সমাদর:

বৃন্দাবনের প্রেমে ঝরে দানেরি নির্ঝর।
আত্মসুখী প্রেমের সাথে জড়িয়ে থাকে ব্যথা,
অহৈতুকী ভক্তি বলে অগাধ সুখের কথা।
ব্যথায় যদি শুনত মানুষ নিছক হাহাকার,
হ'ত কি তার ক্ষতিপূরণ শান্তিতে আমার?
এককথায়, যা চায় তারা নয় দুঃখহরা হায়!
স্বার্থতটে ঝিনুক অঢেল, মুক্ত উবে যায়।
মানুষ যদি অধরাকে না চাইত সাধনে,
একটু সুখ আরাম নিয়েই সে থাকত এ-জীবনে,
সিন্ধু থেকে উঠত না সে মেঘে কোনোদিনই,
নাচত না তার সবখানে জল আনন্দকিঙ্কিনি।
তোদের বুকের বীণায় আমার বাজলে বাঁশির সুর,
পাবি আমায় প্রাণের কাছেই আসঙ্গ মধুর।

আজ এইখানেই শেষ করি।

ইতি স্নেহানুগত দিলীপদা

১৯.

গোবিন্দগোপাল — মধ্যরাত্রি ১৩.২.৭৮
সহৃদয়েষু

১

কত কিছুই করব ভাবি—হয় না করা হায়!
কিন্তু যখন তুই অকারণ করিস অনুযোগ,
বাঁধতেই হয় কোমর—স্নেহ তোর কি ছাড়া যায়?
এই জীবনের দুর্ভোগে যে একটু পাই সুযোগ
তোর প্রণয়ে কত কী—ঠিক দিতে কলম ধরি
যেম্‌নি—দেখি: ও মা! এত বিকাশ একাধারে
করতে হিসেব উঠতে যে হয় চম্‌কে নিরন্তরই:
নাম ঠাকুরের যার—কেউ কি পার পেতে তার পারে?

২

এক নম্বর, পণ্ডিত তুই হয়েও যে বিনয়ী—
একি সোজা কথা রে ভাই? পাই দুনিয়ায় গুণে
কটা সুশীল সাংখ্যতীর্থ ডকটর বিজয়ী?
কজনই বা সদালাপী? গান কজনের শুনে
অন্তরে বয় ভাবের জোয়ার, শিহর ধমনীতে,
রক্তে বাজে সান্দ্র মাদল, বক্ষে করতাল?

কজন মেলে—সবাই খুশী হয় যার সঙ্গীতে?
তাকে যদি হারাই—বলব: 'হায় পোড়া কপাল!'

৩

কবির উছ্বাস ঘোড়শোয়ার—কে বল্‌ তো না রটায়?
তাই চলেছে কলম উধাও তুরঙ্গ-গ্যালপে
তোকে দিতে সাবাস এ-দূর প্রবাসী আজ চায়,
ছুটলে ঘোড়া কেউ কি ভাবে পড়লে জখম হবে?
স্থবির হলেও লেখনী কি চায় মানতে মানা?
উদোম ছোটার সংস্কার এ—রুখব কেমন করে?
সাবধানী মন টুকলেও: 'চাই রাশ কষতে জানা।'
হায় রে, আমি পারি না যে থাকতে লাগাম ধরে।

৪

এবার আরো নানা গুণের ফিরিস্তি দিই তোর:
দুই, ভজনের কমল ফোটে ভাবেরি উদ্যানে,
তার বাসে যার মন মাতে—কে না হয়ে বিভোর
করবে আদর সেই গুণীকে, বলবে—'আমার প্রাণে
ফোটাও তুমি ফুল, তাই তো কাঁটাবনও হাসে
আনন্দঝঙ্কারে, কলতানের বাসরে
যুগের ক্লান্তি বিষণ্ণতা মিলায় সুরবিলাসে
অশ্রু সাধনায়, ভজনে, কীর্তনে, আঁখরে।'

৫

তিন, সজ্জন-সাধুসঙ্গে লাভ করা নিয়ত,
তাঁদের ভাব-মন্ত্র-বাণীর পবিত্র সম্ভারে
রসিয়ে তোলা নীরস জীবন বরি' প্রেমের ব্রত—
এ কি সহজ কথা? এ-ও যে পারে সেই পারে।
নিখর্চায় তাঁদের প্রণাম নয় তেমন কঠিন,
পরিপ্রশ্ন করাও সহজ—কত সুধীই করে,
কিন্তু তাঁদের কাজে লাগা—গায় গীতা: 'এই তিন
প্রশ্ন-প্রণাম-সেবার যোগেই জ্ঞান জাগে অন্তরে।'

৬

তারো পরে, চার নম্বর: পুত্র কন্যা দারা—
প্রত্যেককেই নিয়ে চলা গানের দীক্ষা দিয়ে,
গৃহী হয়েও ঘরছাড়াদের বরণ করতে পারা,
হাঁসের মতন জল থেকে দুধটুকু টেনে নিয়ে—
ভজকট-সংসারে নয় সহজ এ সাধনা,
জীবনযুদ্ধে হাঁপিয়ে উঠেও হার না মেনে চলা,

স্মরণ রেখে তাঁকে করা তাঁর পায়ে প্রার্থনা—
বলব থেকে কী আর—এতো জানা কথাই বলা।

৭

পাঁচ নম্বর; যার পিতৃদেব শুক্র সন্ন্যাসী,
(তাঁর শিষ্য সন্তান—আহা গোবিন্দগোপাল,
তাঁকেই গুরুবরণ করে যে ধায় উল্লাসী,
রক্ষা তারে করেই পিতার-পিতার তরোয়াল)
গৃহে থেকেও ছিলেন যিনি বৈরাগী মহৎ।
জ্ঞান ভক্তি কর্মে গীতার মন্ত্র জপি প্রাণে,
বৈকুণ্ঠের তীর্থপথিক, পরম ভাগবত—
নিত্য হতেন তন্ময় তাঁর প্রাণগোপালের ধ্যানে।

৮

দিনে দিনে দিন কেটে যায়—খুঁজি কোথায় সেই
দরদী—প্রাণ বাঁচে না যার সম্ভাষণ না পেলে,
মনের কথা যায় না বলা আর কারুর কাছেই :
তোর মধ্যে দেখেছিলাম সেই সাড়াটি মেলে।
এ নয় কথার কথা, সাহিত্যিকী সামাজিকী
বন্ধুপাঠী আলোচনা, সুশীল মেলামেশা
সব কিছুরি ঠাঁই আছে ভাই, যদি কেবল শিখি
সংযমে ভোগ—পাশ কাটিয়ে সর্বনাশী নেশা।
দুর্ভোগ আসে এই নেশারি মোহন প্ররোচনায়,
বলে যে: 'চাই নানামুখী ভোগ এ-পৃথিবীর,
এত রসাল রঙ্গ যে-শিব এই বিশ্বে জোগায়
চায় কি সে-জীব সব ছেড়ে হোক কৌপীনী, গম্ভীর?
কিন্তু হায় রে, এরি তো নাম মায়াবিনীর কূজন,
লোভ দেখিয়ে যে মন ভোলায়, তারপরে হয় সুরু
ঘুরে মরা গোলকধাঁধায়, ওঠার মুখেই পতন,
কাঁদে সে: 'সেই দীনদয়াল সাধু কিম্বা গুরু।'

১০

রক্ষাকবচ হয় চাইতে প্রাণগোপালের কাছে
তিনি বিনা ভবার্ণবে নেই পারী আর কেউ
সঙ্কটে ত্রাণ করতে, দিশা দিতে প্রতি কাজে
নির্দেশে বিবেকের—ধ্যানেও বইয়ে তাঁরি ঢেউ
নাম গাই যাঁর, মর্মে আমার তিনিই যে কাণ্ডারী,
তাঁর বাঁশরীর ডাকে শুনি তাঁর স্বরইতো নিতি,

নিষ্কামনার মন্ত্রও পাই সুরবিহারে তাঁরি
ডাকলে কেঁদে যায় ছুঁয়ে যাঁর অহৈতুকী প্রীতি।

১১

কিন্তু সুহৃৎ, বলব এসব মনের কথা কাকে
না যদি পাই প্রেমদরদীর দেখা থেকে থেকে?
শ্রদ্ধার নয় এ-যুগ, বলা যায় কি যাকে তাকে:
'তাঁর প্রসাদেই পাষাণেও ঝর্ণা ওঠে জেগে.
'চক্ষে যাঁকে দেখিনি—পাই বক্ষে ছোঁওয়া তাঁর,
'ব্যথার বুকেও বাজান বাঁশি তিনিই আধিরাতে,
'সব হারিয়েও তাই করে না সাধক হাহাকার,
'অকিঞ্চনও হয় ধন্য পেয়ে জগন্নাথে!'

১২

রাত হ'ল ভাই, আজ ঘুম যাই, কাল উঠে সকালে
হয়ত আরো লিখব কিছু—হই যদি উন্মনা,
পাই যদি আশ্বাস শ্রীনাথের—হয়ত জলদ তালে
রাঙবে আমার শিষ্ট ছড়ার মিষ্ট উন্মাদনা,
পড়বে মনে তাঁর করুণা—যাঁর প্রসাদে পাই
দীর্ঘ মরুপথে কোমল বন্ধুর দর্শন,
বিনা আদেশ যাঁর অঘটন ঘটে না রে ভাই:
কাঁটাবনে ফুলের হাসি, সন্তাপে বর্ষণ।

ইতি দিলীপদা

একই খামে একখানা কাগজে লেখা:

মধ্যরাত্রি ১৩.২.৭৮

এই সুভদ্র দরদী বন্ধু রামপুরহাট কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক (Dt Birbhum P.O. Rampurhat)। ইনি আমার জয় জননী জয়—স্বরলিপিতে তুলেছেন। অতএব স্বরলিপি ভালো জানেন। সম্ভব হলে এঁকে কলকাতায় তোদের কোনো আসরে নিমন্ত্রণ করিস যথা ৫ই মে-তে রবীন্দ্রসদনে। এঁর চিঠি থেকে বুঝবি ইনি দরদী—শ্রদ্ধালু — সুতরাং archaic—এ যুগের লোক নন। তোকে আমার অভিনন্দন ছড়া পাঠালাম। আমি ছড়ায় একটা নতুন পথ কেটেছি বলে সন্দেহ করছেন কেউ কেউ। করলিপি দুষ্পাঠ্য বলে নানা শোধন আঠা দিয়ে জুড়তে হয়েছে। নিজগুণে অপরাধ ক্ষমণীয়। এখানেই ইতি করি। জর্মন পাঠে বিরতি হয়েছে ছড়ার দরুণ। এক জর্মন কুমারী এসেছেন সম্প্রতি। এক ফরাসী মহিলাও। চরৈবেতি...

দিলীপদা

২০.

ওঁ

১৪.৩.৭৮

বম্বে থেকে লেখা
(চিঠির কাগজে পুণার ঠিকানা ছাপা)

গোবিন্দ মুখারবিন্দ!

তোর মনোজ্ঞ পত্র পেয়ে পড়ার পথে উঠে বসলাম। এখানে এসে ইন্দিরার উপকার হয়েছে, কিন্তু আমার শারীরিক অধঃপতন। হঠাৎ পায়ে এক ফুস্কুরি গোড়ালিতে। বিষম ব্যথা। তার উপর জ্বর। দুদিন জ্বর ভোগ করে আজ টাল সামলে উঠেছি। বার্ধক্যের হাজারো উপসর্গ রে ভাই। তুই ধন্য যে এখনো যুবা আছিস—'ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।' তুই বাঁচাবিই বাঁচাবি—না বাঁচিয়ে পারবি না। (ঐ বাঁশি বাজছে হঠাৎ—চাকর রাখোজির শেষ শ্লোক—মীরাকে জো...প্রেম নদীকে তীরা...এ এক আশ্চর্য ব্যাপার, বললে না পেরত্যয় যাবি দাদা! কী কাণ্ড! অসুখেও বাঁশি সুখেও বাঁশি!)

কিন্তু এখন বাধ্য হয়ে জিরোচ্ছি। তাই চিঠি লেখা ধরেছি। একটা বিশেষ উপকার করবি আমার? তোর কাছে ছাড়া কার কাছে যাব? কে করে দেবে?

এক অনুরাগী ভেনেজুয়েলা থেকে লিখেছেন আমার L. P. (বাংলা) চান। তিনি টাকাও পাঠিয়েছেন। তাই তুই রেকর্ডটি তাঁকে পাঠালে (air mail এ) আমি তোকে দাম পাঠাব। বন্ধুবর আমার সব বইই কিনেছেন ও বিশেষ ভক্ত আমার কবিতার। আগামীতে আমার চেতনার রূপান্তর প'ড়ে সিদ্ধান্ত করেছেন—আমি ঋষি। এর পরে তাঁকে রেকর্ড না পাঠালে চলে? কবিতা পড়েই যখন তাঁর এই বিহুল অবস্থা তখন রেকর্ড শুনলে না জানি কী অবস্থা হবে। তাঁর নাম ও ঠিকানা :

Dr. A. K. Banerji
APARTADO 1887
Caracas 101
VENEZUELAS

আর সেই জর্মন মহিলাকে? তিনি বিমান ঘোষকে লিখেছিলেন কিন্তু বিমান গ্রাহ্য করেনি। কিন্তু তুই ছাড়া আর কে আছে আমার? তাঁর ঠিকানা। নাম

FRAU LU VON MINEGERODE
Hermann Foge Weg 10
34 Gottingen Germany

রেকর্ড পেলেই ইনি ডলার (বা জর্মন মার্ক) পাঠাবেন—মাভৈঃ। এঁর স্বামী গটিংজেনের ফিজিক্সের প্রফেসর—অধ্যাত্মবাদে আস্থা নেই। কিন্তু বনিতা ধ্যান ধারণা করেন—মহেশ যোগীর Transcendertal Meditation .... শ্রীঅরবিন্দের নানা বইয়ের জর্মন অনুবাদ পড়েছেন...ইত্যাদি।

এখানে প্রায়ই ঘন্টাখানেক ভাষণ দেই। গানও করি তবে রয়ে সয়ে। জোরে গাইতে পারি না—কাশী চেপে ধরে। তাই ভাষণের পালা। গত শনিবার (তরশু) পাল্কিওয়ালার ওখানে এক ঘণ্টা বললাম 'সাবিত্রী' সম্বন্ধে। সবাই খুব খুশী। এখানে রোজ সন্ধ্যায় বিস্তর লোক আসে—ধর্মার্থী। শোনে সত্যিই মন দিয়ে ধর্মের কাহিনী। তাই মনে হয় জগতে সবাই 'চোরা' নয়। তেরোটি রমন্যাসের শেষটি (এইটিই শেষ—last night) সারা হল। এরপরে কী লিখব ভাবছি। শ্রীগোপীনাথের পরমার্থ প্রসঙ্গ পড়ছি। সব বুঝতে পারছি না। ভালো কথা, আমার 'বাঁশির ভরসা' কবিতাটি শ্রীমৎ অনির্বাণকে সুবিধা মত পড়ে শোনাস। আমরা এখানে আরো দশবারোদিন থাকব। সমুদ্রতীরে পরম রম্য নিলয়—বন্ধু আমেরিকায়। আমাদের পরম অনুরাগী। এঁর বাড়িতে আমরা পাঁচজন। উপরের তলায় এক বন্ধুর বাড়িতে (ফ্ল্যাট-এ) ইন্দিরার ছেলে প্রেমল। তার ফরাসী স্ত্রী আর ইন্দিরার স্বামী মুলুকরাজ। মুলুকরাজ আমেরিকান সিটিজেন হয়েছে। করিৎকর্মা। ওখানে কয়বৎসর ফিজিক্স পড়িয়ে কৃতী নাম কিনেছে।

আমি আর কতদিন এ-জগতে থাকব বলা শক্ত। ভালো কথা, এক পর্টুগীজ মহিলা লিখেছেন—আমাদের Pilgrims of the stars–hit হয়েছে। তিনি Yogi Krishna-prem পড়েও মুগ্ধ হয়ে অনুবাদ করছেন পর্টুগীজে। এ বইটির উর্দু অনুবাদও হয়েছে কয়েকটি অধ্যায়ের। এবার আসি। মনে রাখিস—এখন কলকাতায় তোর কথা ভেবে কম আশ্বাস পাই না। শেষ বয়সে আর পথে বসাসনে। ইতি।

তোর নিত্যস্নেহানুগত দিলীপদা

২১.

ওঁ

৩.১০.৭৮

পুণা

গোবিন্দ

তোকে সকালে একটা চিঠিতে বম্বে আসতে লিখেছিলাম। ভেবে দেখলাম বম্বে এলে ভালো হবে না। প্রথম কারণ আজকাল আমাদের শরীর ভালো যাচ্ছে না। শীতকালে ভালো থাকে। পুণায় হয় বর্ষাকালে না হয় শীতকালে আসা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া আমার মনে হয় আমার দেহান্তের আগে তোর একবার প্রাণপণে চেষ্টা করে মন্দিরের আবহে থাকাই ভালো। আরো এককথা: এখানে এলে আমাদের একজন হয়েই থাকবি, বাইরে থাকতে হবে না। এখানে ৭/৮ জন সাধিকা আমার সঙ্গে গায় নানা গান। সে সময়ে তুই গাইবি—কী চমৎকার হত? দুটি তরুণ যোগী যোগিনী এসেছে। উচ্চশিক্ষিত অথচ চমৎকার মানুষ। সত্যিকার ধর্মার্থী। আমার মনে হয় এখানে এসে তোর মন সত্যিই আরাম পাবে। তাই ইন্দিরাও বলছিল—নভেম্বর কিম্বা ডিসেম্বরে সটাং পুণায় তোর অভ্যুদয় হলেই সবচেয়ে ভালো হয়।

এখানে আমি নভেম্বরে একটু ছাড়া পাব—ততদিনে আশা করি অনির্বাণ স্মৃতির

ইংরাজী তর্পণ শেষ হয়ে যাবে। বম্বেতে আর এক মুস্কিল অত্যন্ত ভিড় হয় রোজই। ঘর ভরতি হয়। আমি বেশি গাইতে পারি না তো। ডাক্তারের নিষেধ। তাই প্রবক্তা হয়েই নিজেকে প্রবোধ দিই। মন্দিরে এখন ধর্মভাবের উদ্দীপন হয়েছে—ভিড়ও জমছে। কারণ আমি নিচে যেতে পারি না।

এখানে এলে একটু নিরালায় কথাবার্তা হবে, গানও কয়েকটি তুলে নিবি—রোজই সন্ধ্যায় আসর হয়, আমি ১৫/২০ মিনিট গাই আস্তে আস্তে। তারপর সাধক সাধিকারা গায় নামগান তথা আমার শেখানো গান। এ এক নতুন বিকাশ মন্দিরের, তুই চাক্ষুষ ও কার্যিক না করলে চলে কি?

বাঁশি বেজে চলেছে। সে নানা কাণ্ড, দেখা হলে বলব। এখানে সবাইকে কোরাসে গাওয়াচ্ছি ভজন বাংলা ও ইংরাজী গান।

তোর নিত্যশুভার্থী দিনান্তক্লান্ত মন্টুদা

২২.

ওঁ

১০.৭.৯৭

গোবিন্দগোপাল

টেলিগ্রাম করেছিস ইন্দিরার কুশল সংবাদ দিতে। কিন্তু কী বলব? ১৫ই জুনে ওকে নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে হয়েছিল—যাকে বলে যমে মানুষে টানাটানি—টাগ অফ ওয়ার। আঞ্জিনা পেকটেরিস শিবের অসাধ্য ব্যাধি শোনা যায়। কিন্তু সেই অসহ যন্ত্রণার মধ্যেও ওর মনে শান্তি ছিল নিটোল হয়ে। অনির্বাণও লিখেছিলেন আমাকে সাত বৎসর শয্যাশায়ী থেকে যে তিনি আনন্দেই ছিলেন। আমি নিজে দেহদুঃখে কেবল দুঃখই পেয়ে এসেছি, শান্তি কি আনন্দের কণিকাও পাইনি। হয়ত তাই উচ্ছ্বাস এসে গেল, লিখলাম—যোগীর না হোক কবির ছন্দে সুরে (৬ই জুলাই):

জপ করি নাম যেমনি তোমার   ঘনায় আঁধার

আমার মুস্কিল হয়েছে কি, আমি জীবনে পদে পদে ঘোর অন্তর্দ্বন্দ্বের গভীর নিরাশায় বার বার পথ হারালেও দেহের যন্ত্রণা খুব বেশি পাইনি বলে দেহ কষ্ট দিলে মনেও সে-কষ্ট বর্তেছে, যন্ত্রণায় যন্ত্রণাই সার হয়েছে। কিন্তু এবার চোখের জলে ইন্দিরার কষ্ট দেখে—না যাক, আমার যন্ত্রণাই সার হয়েছে। কিন্তু নিজের দুঃখ সওয়া সহজ না হলেও তত কঠিন নয় যত কঠিন তার দুঃখ সওয়া যাকে নিটোল শ্রদ্ধার আলোয় দেখে গভীর স্নেহ করে এসেছি। বিশেষ করে ইন্দিরার মতন পুণ্যবতী ধর্মশীলার দিনের পর দিন দেহযন্ত্রণা চাক্ষুষ করা—কিন্তু যাক, নিজের চিত্তগ্লানির ইতিহাস দিতে তো আর কলম ধরিনি। গুরুদেব বলতেন, মনে পড়ে, যে কোনো গভীর দুঃখ শোক হানা দিলে তা নিয়ে লিখলে অবসাদেও কিছুটা বল পাওয়া যায়। গেটেও বলতেন প্রায়ই—গভীর দুঃখও সার্থক হয় যদি একটি কবিতার প্রেরণা আসে তার মাধ্যমে। এ ছাড়া দরদী বন্ধুকে দুঃখ শোকের কথা বললে ঠিক শান্তি না মিললেও কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়া যায়। অবশ্য

বন্ধু যদি অতি বিচক্ষণ ক্রিটিক হন তাহলে তাঁর কাছে 'মনের কথা কইতে মানা' করেছেন জ্ঞানী বাউল। তবে তোর কাছে দরদ সহানুভূতিই বরাবর পেয়ে এসেছি, অতএব...

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজকে আমি একবার বলেছিলাম যে যদিও বিধাতার কৃপা আমি পেয়ে এসেছি পদে পদেই, তবু বলব তাঁর একটি অমূল্য কৃপা আমার লাভ হয়েছে : ইন্দিরার আবির্ভাবে। কবিরাজ মহাশয় বলেছিলেন: 'একশোবার—কারণ ওর মধ্যে দিয়েই হয়েছে ত্রিশক্তির ত্রিবেণীসঙ্গম—তুমি, মীরা আর ইন্দিরা।' তাঁর এ আশ্চর্য সংজ্ঞাটি আমি ভুলতে পারি না বলেই আরো দেখতে পেয়েছি বিধাতার অহেতুক কৃপা আমাকে শান্তি দিয়েছে কী ভাবে ইন্দিরার নানামুখী প্রতিভায়—অশ্রান্ত গৃহকর্মে, অফুরান ভজন পরিবেষণে, নানা উৎসবে প্রাণসঞ্চারে—সর্বোপরি, সমাধির অপরূপ ভাবাবেশে কৃষ্ণকে আমাদের ইষ্টদেব বলে হরিকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠায়। (পরে রাধারাণীও এসেছিলেন ওরই ডাকে, কারণ আমি সে সময়ে শুধু কৃষ্ণকেই ডাকতাম।) শ্রীকালীপদ গুহ রায় যে কেন ওর ছবি দেখে বলেছিলেন: 'ইন্দিরা প্রেম ও আলোর প্রতিমা' (a being of love and light) তাও আমি পরে বুঝি পুরোপুরি চাক্ষুষ করে ও কত ধর্মার্থীকে কৃষ্ণপূজায় টেনে আনত দিনের পর দিন। ওরে সে আত্মদীপের মর্মজ্ঞ হওয়া যায় না চোখে না দেখলে। আজ ও শয্যাশায়িনী, তাই আমাদের মন্দিরে দীপালিতে বিষণ্ণতা, আনন্দে উৎকণ্ঠা, হাসিতে অশ্রুর ছোঁয়াচ, বেদির ফুলে কাঁটার প্রাদুর্ভাব।

শুধু তাই নয়, ইন্দিরা স্বভাবসাধিকা, মিস্টিক—প্রাতঃস্মরণীয় মীরা যার alterego আত্মার আত্মীয়া। জানি একথা যুক্তিসহ নয় বলেই প্রকাশ করা অসম্ভব। কিন্তু এ-বিচিত্র বিশ্বলীলায় আজ যা ভ্রান্তিবিলাস, অনেক সময়েই কাল তা প্রত্যক্ষ অপ্রতিবাদ্য সত্য বলে মান পেয়েছে। বিশেষ করে যোগী ও মিসটিকদের সাধনায় এরকম নামা অলৌকিক আবির্ভাবের ধ্রুব ইতিহাস পাওয়া যায়। মীরা সম্বন্ধে ইন্দিরার মুখে আমরা আরো অনেক কথা শুনেছি, পেয়েছি তাঁর নানা বাণী, মন্ত্র, অমূল্য উপদেশ, দৈবী প্রতিশ্রুতি। কিন্তু সেকথা থাক। আমি এটুকু বলে রাখলাম কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের দেহান্তের পরে ইন্দিরা-কীর্তিত নানা অলৌকিক সত্য বহু অধিকারী সাধক সাধিকার কাছেই স্বতঃসিদ্ধ বলে অভিনন্দিত হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে বলে রাখি যে, আমি বিলক্ষণ জানি, এ-যুগের বস্তুবাদী বিচক্ষণদের কাছে মিস্টিক কবিতার আদর হবার কথা নয়। স্বয়ং ভগবানই যখন নাস্তির নায়ক তথা নিরানন্দের প্রণেতা বলে বরখাস্ত হয়েছেন তখন তাঁকে কেন্দ্র করে যে-সব কবিতা একদা মান পেত তারা যে অপছন্দ হবেই হবে এ তো দুই আর দুই-য়ে চার-এর লজিক। কিন্তু মিস্টিকদের নানা অনুভূতির মধ্যে দিয়ে মানুষের চেতনার যে আশ্চর্য রূপান্তর হয় তার কী নাম দেওয়া যাবে?—সব কল্পনা রূপকথা? একটা গল্প বলি এ-প্রসঙ্গে। অন্তত গল্প হিসেবে তো রসাল। ইন্দিরা কখনো কখনো রাস্তার কুকুরের মধ্যে ঠাকুরের দর্শন পেয়েছে। (স্মরণীয় যশোদা মা-র অনুরূপ দর্শন।) কিন্তু একবার হল কি, তখন আচার্য কৃপালনি আমাদের অতিথি। সন্ধ্যায় হঠাৎ ইন্দিরা উঠে জানালার কাছে গিয়ে দেখে এক গাড়োয়ান তার গরুর পায়ে বেত মারল। ইন্দিরা 'উঃ' বলে ফিরে এল। আমি কী ব্যাপার জিজ্ঞাসা করাতে বলল, 'লোকটা যখন গরুকে বেত মারল আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম সে যন্ত্রণা'। বলে খুলে দেখাল—জানুর

ঠিক উপরে মস্ত কালো দাগ। আচার্য কৃপালনি চম্‌কে উঠলেন। একটু পরে হেসে বললেন: 'আমি ভাগ্যবান্ যে আমি অনুভব করিনি।' আমরা সবাই হেসে উঠলাম। কিন্তু ইন্দিরার সে-ব্যথা সারতে বেশ কিছুদিন লেগেছিল।

এ-সব মিস্‌টিক অনুভব অকারণ আসে না। এসব দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে ঠাকুর দেখিয়ে দেন যে মানুষ ও পশুর মধ্যেও চেতনার যোগসূত্র থাকে। এ নিয়ে ব্যঙ্গ বা গবেষণা করা সহজ, কিন্তু এসব উপলব্ধির অধিকারী হওয়া সহজ নয়। ইন্দিরার আর একটি এই জাতের অলৌকিক অনুভবের কথা বলি:

একবার ও শ্রীকান্তকে নিয়ে মোটরে বেরিয়েছিল আশ্রমের কোনো আসবাব খরিদ করতেই হবে, আমার ঠিক মনে নেই। রাস্তায় ওকে মোটরে বসিয়ে শ্রীকান্ত নেমে দোকানে ঢোকে। তাঁপর এক কুষ্ঠগ্রস্ত ভিক্ষুকের মাধ্যমে ওর এক আশ্চর্য দৈব দর্শন হয়—যে ধরনের দর্শন (revelation) যোগীদের যে অনেক সময়ে হয়ে থাকে তার রকমারি এজাহার আছে। আমার হয়েছিল একবার দিল্লিতে স্বপ্নে কালীপূজার রাত্রে—আমি তার একটি বিবৃতি কবিতায় লিখেছিলাম ইংরাজীতে পরদিন সকালে Transformation নাম দিয়ে। কিন্তু ওর দর্শন হ'ল শুধু যে জাগ্রত অবস্থায় তাই নয়—হ'ল রাস্তায়, আর কার মাধ্যমে? না এক কুষ্ঠগ্রস্তের। নানা যৌগিক দর্শনের এই শ্রেণীর আকস্মিকতার হেতু খুঁজে না পেলে যুক্তিবাদীরা ভারি রাগ করেন। কিন্তু কেন এসব অঘটন ঘটে বলতে না পারলে অঘটনটি বাতিল হ'তে পারে না। কেবল এইটুকু বলা যায় যে ভগবান এ সব অঘটন ঘটান অনেক সময়েই জিজ্ঞাসুকে তাঁর নানা লীলার মর্মগ্রাহী করতে তার চেতনার বিকাশ সাধন ক'রে। পরমহংসদেবের নানা অলৌকিক দর্শন ও উপলব্ধির অপ্রতিবাদ্য রেকর্ড আছে। সন্ত রামদাসেরও। কিন্তু মরুক গে, ইন্দিরার অদ্ভুত দর্শনের কথাই বলি। আনন্দের বিষয় এই যে, ও এ-দর্শনের বর্ণনা লিখে রেখেছিল একটি চমৎকার ইংরাজী কবিতায়:

A LEPER

I looked into his helpless eyes,

*   *   *

আমি এর অনুবাদ করেছিলাম পরমানন্দেই বলব:

জাগে ঘৃণা তার ম্লান অসহায় আঁখিপানে চাহিতেও!

*   *   *

এ-বিস্মরণ, উদ্বোধন, উচ্ছলন—বিরল, বলাই বাহুল্য। মিস্‌টিক বা যোগী সংসারে ভগবৎপ্রেমের (বৈষ্ণব পারিভাষিকে 'পিরীতি') মতনই বিরল। চণ্ডীদাস অকারণ চোখের জল ফেলেননি:

পিরীতি পিরীতি সব জন কহে, পিরীতি সহজ কথা?
বিরিখের ফল নহে তো পিরীতি নাহি মিলে যথা তথা।

অনেকেই মিস্‌টিককে আত্মকেন্দ্রিক মনে ক'রে ভুল বোঝেন কেন না আত্মকেন্দ্রিকেরা কখনই ভগবৎকেন্দ্রিক হতে পারে না। পরমহংসদেব তাই বললেন উঠতে বসতে: 'আমি

আমি বললেই বন্ধন, দুঃখ—তুমি তুমি বললেই মুক্তি, আনন্দ।' একথা মনে মনে অনেকেই মানেন, তবু সর্বদাই অন্তরে এই ভয় জেগে থাকে যে, ভগবানকে পেতে হ'ল যদি সব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে বিদায় দিয়ে নিঃসঙ্গ নিরানন্দের মধ্যে হাহুতাশ করতে হয়? কে জানে?

'I was sore adread
Lest, having Him, I must have naught beside'

এ ভয় আসে এইজন্যে যে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ সহজ নয়—বহু তপস্যা, সংযম, ঐকান্তিক অভীপ্সা... ইত্যাদির পরে স্থায়ী মুক্তি ভক্তির আনন্দ দেখা দেয়। উপনিষদে অকারণ বলেনি: 'পথ ক্ষুরধার, দুরত্যয়, দুর্গম।' পদে পদেই পরীক্ষা দিতে হয়—কার সংকল্প কত দৃঢ়; কার পা ঘা খেয়েও টলে না, মন হার মেনেও মানে না, প্রাণ তীর্থলক্ষ্যে দৃষ্টি রাখলে ভোলে না নানা বাধা বিঘ্ন প্রলোভন সত্ত্বেও। ইন্দিরার ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই দেখা গিয়েছিল ও সাধননিষ্ঠা ও ভক্তির আন্তরিকতা।

আমার কাছে ও বরণীয় হয়েছিল প্রধানত এই জন্যেই: যে আমি আবাল্য যা চেয়েছিলাম কৃষ্ণের আবহে, ও গুরুনানকের বলিষ্ঠ আবহে গ'ড়ে উঠেও সেই প্রেমমার্গই চেয়েছিল যা চেয়েছিলেন মীরা। এই চাওয়া ওর আশ্চর্য নিষ্ঠায় দিনে দিনে বিকশিত হয়ে ওকে অসামান্য শক্তি দিয়েছিল যে-শক্তি মীরার সখীত্বে ওর চরিত্রকে এত মাধুর্য দিয়েছিল বিশেষ ক'রে কৃষ্ণভক্তির অশ্রুকণ্ঠী কীর্তনে। তাই নার্সিং হোমে যখন ও ছিল জীবনমরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে, তখন অসহ্য বুকের ব্যথায়ও আমাকে বলেছিল: 'আশীর্বাদ করো আমি যেন ভক্তি ছাড়া আর কিছু না চাই।'

চোখে জল এল। এই-ই তো বিদায় চাওয়া। লিখলাম ওর পাশে ব'সেই:

আপনার শোকতাপ সাধনায় আমি
সহিতে শিখেছি তব করুণায়, স্বামী!

লোকোত্তর যৌগিক প্রতিভা থেকে থেকে অভ্যুদিত হয়ে এসেছে সব দেশেই শুধু বস্তুবাদী মানুষের অজ্ঞানতিমিরান্ধ চক্ষুকে জ্ঞানের আলোয় খুলে ধরতে শেখাতে। ইন্দিরা তার মিস্‌টিক দৃষ্টিতে বড় চমৎকার দীপ্ত ভাষায় বলেছে একথা তার একটি ইংরাজী কবিতায়: নাম BELOVED :

They say He is almighty
ওরা বলে: তুমি আলো আঁধারের পারে

একটু আগে লিখেছি, নানা যৌগিক-মিস্‌টিক অনুভূতি-উপলব্ধির অর্থপরিগ্রহ করতে বেগ পেতে হয় ব'লে বুদ্ধিবাদী যুক্তিপন্থীরা বেজায় রাগ করেন। কিন্তু জীবনে কি পদে পদেই আমরা আভাষের মধ্য দিয়ে এমন আনন্দ পাই না যার ছোঁওয়া পেয়েই বুক ভ'রে ওঠে তাকে ধরতে না পেলেও? বলতে কি, অনেক গভীর উপলব্ধিই 'পাশ দিয়ে চলে যায় চকিতের প্রায়' অথচ তাতেই এমন তৃপ্তির আবেশ প্রাণ ছায় যে মনে হয় 'ধন্য আমি।' প্রেমের অনিন্দ্য শিহরণও কি অচিন্ত্য নয়? এইরকম একটা আশ্চর্য অবর্ণ্য প্রাপ্তির আবেশে আমি একদা গেয়েছিলাম:

এমনি স্মরণে জাগালে পরাণ ভুলালে যা কিছু ছিল স্মরণে।

যুক্তিবাদী বললেই বলবেন : এ কেবল মেকি উচ্ছ্বাস, অবাস্তব—বেদনা প্রদীপে চেতনা? ননসেন্স।

যুগে যুগে আমরা জ্ঞানের আলোর জন্যে ধর্ণা দিই জ্ঞানীর কাছে, যেমন জহরের জন্যে যাই জরুরীর কাছে, বন্ধনমুক্তির জন্যে জীবন্মুক্তদের কাছে। কিন্তু প্রত্যেকের কাছে কিছু পেলেও অনেক কিছুই পাই না অথচ জানি যে যা পাইনি তা আছে, নাস্তি নয়। মিস্‌টিক উপলব্ধি অনুভূতি স্বপ্ন আবেশ অভীপ্সা ব্যাকুলতা সবই এই দুর্লভের আভাষ দেয় যে, প্রেমসিন্ধু ডাকছে আমাদের—মিস্‌টিক মৃদু কল্লোল সেই ডাকেরই রেশ। একথা কবিরা জানেনই জানেন, কিন্তু অকবিরা জানেন না ব'লেই মানেন না। তাই তাঁদের অন্তরে আনন্দের পূর্ণিমপ্রকাশ হ'তে সময় লাগে। ইন্দিরার কাছে প্রকাশ হয়েছিল দ্রুতবেগে কারণ ওর মনপ্রাণ ছিল শুদ্ধ, আন্তরিকতা নিটোল, আধার অলোকসাধারণ। আমি অত্যুক্তি করিনি যখন ও দেহের যন্ত্রণায়ও নাসিং হোমে শুধু ঠাকুরের নাম করছিল শান্ত দীপ্ত মুখে :

(তুমি) কেবল সান্ত্বনে নয়, প্রতিশ্বাসে নামজয়—

* * *

ইতি। তোর স্নেহঋণী
দিলীপদা

২৩.

ওঁ

৯.৯.৭৯ (চিঠিতে লেখা ৯.৯.৭৮-সেটা ভুল)

পুণা

গোবিন্দ!

তোকে কাল যা লিখেছি তাতে আমার মনের বিষণ্ণভাব হয়ত একটু বেশি ফুটিয়ে তুলেছি, মানে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। দেহ বেশি দুঃখ দিলে মন একটু ভাল হয় এখনো। মহাযোগী তো নই। চেষ্টা করি সমতার ভূমিতে কুঠিয়া বাঁধতে। কিছুটা পারি। কিন্তু তারপর ঝড় ঝাপটা হলে মনের গুরুভার একটু বেশি চেপে ধরে এখানে। বিশেষ ক'রে ইন্দিরার প'ড়ে গিয়ে পায়ের হাড়ভাঙার যন্ত্রণায় একটু অশান্ত মতন হ'য়ে উঠেছিলাম বৈকি। তাই ভাবলাম শুদ্ধিপত্র দিয়ে কিছুটা অন্তত প্রায়শ্চিত্ত করা ভালো, নৈলে তুই বলবি হয়ত: 'Thou, too Brutus?' কে জানে? অন্তরের আলোর সমাচার প্রকাশ করাই ভালো, কালো মেঘের দুঃসংবাদ তো যত্রতত্রই মেলে। অতএব শোন্‌ মন দিয়ে।

এখানে বহু জিজ্ঞাসু অর্থার্থী আর্ত আসে। মাঝে মাঝে দুচারজন জ্ঞানীও প্রকট হন। পরশু এক বিশিষ্ট গীতাবাদী সাধু আমার অঘটন আজো ঘটে ও ছায়াপথের পথিক প'ড়ে মুগ্ধ হ'য়ে প্রণাম ক'রে আরো কিছু বই নিয়ে গেলেন। বললেন : 'না না-সে কি কথা?

আপনি খবর পান না—বহু পাঠক পাঠিকা আপনার লেখা প'ড়ে বল পায়, সান্ত্বনা পায়, এমন কি পরমদিশারও আভাস পায়। আপনি ঠিক পথেই চলেছেন, বিষণ্ণ হবেন না ভেবে যে, মিথ্যেই লিখে মরছেন অভয়বাণীর কথা। এ যুগে আরো চাই এ-বাণী (গীতার ভাষায়) যে সত্য সাধনার 'প্রত্যবায়' নেই, থাকতে পারে না।' ইত্যাদি।

এখানে দর্শনার্থ ভক্ত তথা ভক্তিমতীও আসেন—অনেক গুজরাতী জিজ্ঞাসু আসেন কী যে শ্রদ্ধা বিনতি নিয়ে....! আজই সকালে সন্ত রামদাসজির একনিষ্ঠ ভক্ত নটবর পারেখ ও আরো দুতিনটি জিজ্ঞাসু এসেছিলেন। হরিকথা ব'লে মন ফের উঁচু তারে বাঁধা হ'ল—আরো বাঁশির ভরসায় যার বাণী তোকে পাঠিয়েছি সেদিন। আমি গাইতে পারি না এখন —ডাক্তারের নিষেধ, কিন্তু গুনগুন ক'রে কয়েকটি সাধক সাধিকাকে শিখিয়েছি অনেকগুলি গান—এমন কি গীতার একাদশ স্কন্ধের 'স্থানে হৃষীকেশ' থেকে 'ভব বিশ্বমূর্তে' পর্যন্ত। তাছাড়া শঙ্করাচার্যের 'ন তাতো ন মাতা'....পিতৃদেবের 'ভূতনাথ....' আমার 'জয় শ্যামল জয় রাধারাণী'.... ঐ একই ছন্দের। এছাড়া কয়েকটি ইংরাজী গানেও তালিম দিয়েছি। একটি তারা সানন্দে গাইল কাল সন্ধ্যায়—মোটের উপর মন্দ নয়.... 'মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ' এ-ভরসা স্বয়ং ঠাকুর শ্রীমুখে দিয়েছেন, বললাম তাদের। গানটির পরে বাংলা অনুবাদও গাইল ঐ একই সুরে মন্দ নয় :

O thou, my life's one Refuge,	হে আমার চিরসাথী,
I lean on none but thee.	কাণ্ডারী পারাবারে।
Lord, in thy deep compassion,	জ্বালো তব ধ্রুবতারা
For ever abide with me.	তুফানে অন্ধকারে।

দুটি আলাদা যদিও একই ভাবোদ্বুদ্ধ গান। তবে সুর অবিকল এক!!

কী কাণ্ড! গানের শেষে শুনি বাঁশিতে ডাকছে অবিকল ঐ সুরে। এ যদি বাঁশির ভরসা না হয় তবে ভরসা বলব কাকে? ইন্দিরাও বলল : 'এর মানে হ'ল, তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন'। নিশিকান্তের গানে আছে না—

রাজা আমায় কাঙাল ক'রে করেছেন তাঁর সাথের সাথী :
তোমায় দিল অনেক চাকর, অনেক ঘোড়া অনেক হাতী
তুম ঘর লাখ কোটি হাত্তি ঘোড়া হম ঘর এক মুরারি (কবীর)
এখন ছেদ...... ফের ভক্তগণাঃ গাইবেন.... তারপর ফের অনুবৃত্তি চলবে...সাবধান।

* * *

ওরা প্রাত্যহিক হনুমান চালিসা গাইল সদলবলে। পরে বাঁশিতেও শুনলাম সেই সুর, মানে—গান থামার পরে। এরকম তো রোজই হয়, তবে আজ এই চিরাচরিত রীতির পুনরাবৃত্তির ভাষ্য পেলাম অভিনব : যে তিনি দেখা না দিলেও খবর নিচ্ছেন আমাদের বেদনার আর খবর দিচ্ছেন তাঁর করুণার। এ-ভাষ্য যদি ভুল হ'ত তাহ'লে বাঁশির সুরকেও মায়াই বলতাম। বলি না, কেন না অজান্তেও তাঁর বাঁশির নানা সুর থেকে প্রেরণা পাই, সে যেন বলে (ঐ গানেই গেয়েছি) :

নাহি ভয়, তবু কেঁদে তুই গান গেয়ে ডাক তাঁরে :

কালো কাঁটা হবে হবে ফুল, আলোঝরা অভিসারে।

এখানে এক কানেডিয়ান যুবক আছে গত তিন বছর। কী যে সেবা করে আমাদের ভোর থেকে 'আধি রাত' পর্যন্ত! সে এক পদসংবাহন করবে। তাই পুনরায় ছেদ। কাল ফের খেই ধরব।....সুনিশি। ... কী কাণ্ড! এ আক্রাগাণ্ডার দিনে—ভজনে যোগ দেব নীরবে, তবু এক মহীয়সী স্পেন থেকে প্রণামী পাঠালেন তার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে। ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে স্মরণ করলাম কৃষ্ণপ্রেমের কথা : 'We may not get what we want, Dilip, but we get what we do need!' কত সঙ্কটে ঠাকুর এইভাবে অপারে পার করেছেন...প্রণাম তাঁকে। প্রণাম। সুনিশি।

রাতে কী চমৎকার ঘুম এলো, শুনলাম :

পরিহরি ভবসুখদুঃখ যখন মা শায়িত অন্তিম শয়নে....

কবে কোন গঙ্গার কোলে ঠাঁই চেয়ে বুদ্ধিবাদী সংশয়ী কবি ডেকেছিলেন তারিণীকে! আহা! কী প্রাণকাড়া প্রার্থনা!

এই এই এই.... বিষয়ই মায়া, তাঁর করুণাই কায়া, মায়া যার ছায়া। গান ধরি :

কতবার তুমি করেছ করুণা নাথ!

* * *

এই দুই টানাটানি আলো-বিশ্বাস আর কালো-সংশয়ের। এই আলোবিশ্বাসই তো আমার স্বভাবসিদ্ধ। তবু কেন ভাবি আমি যোগী নই? না, আমি নিশ্চয়ই যোগী এবং 'জন্মযোগী' (শ্রীঅরবিন্দের তখমা— born yogi), কিন্তু আমি আমার ভ্রষ্টাচারকে আমার স্বভাবের সঙ্গে সনাক্ত করি কী দুঃখে এত পোড় খেয়ে, এত কান্নাকাটি ক'রে বাঁশির চিরন্তনী করুণা পেয়ে? আমি বলি না—আমি মহাযোগী—কিন্তু আমি ভোগী নই বিষয়ী নই দুনিয়াদারির ধার ধারিনি তো কোনদিনই। এত মহাত্মা সাধু সন্ত কি আমাকে অকারণেই আশীর্বাদ করেছেন? শ্রীমৎ অনির্বাণের মতন মহাযোগী তাঁর শেষ পত্রে আমাকে তিরস্কার আজও কানে বাজে : সংশয় ভয় দ্বিধা দ্বন্দের মধ্যে দিয়ে কার না যেতে হয় দিলীপ? তাই ব'লে কি এদের বলবে স্বাগতম্?....

না। আমার আলোর সুলগ্ন আবার রঙিয়ে উঠেছে। আমি বুঝতে পেরেছি যে আমি 'অভয়' পেয়েছি—যদিও অকুতোভয় হতে এখনো বাকি আছে—ভাগবতের ভাষায় :

মামেকমেব শরণম্ আত্মনং সর্বদেহিনাম্

যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়া স্যা অকুতোভয়।

কিন্তু আর না। ঢের বাচালতা হ'ল। অপরাধ মার্জনীয়। অবসাদের প্রতিক্রিয়া প্রতিবাদ—নিরুপায়। ব্যথা দিয়ে ব্যথা বুঝিস। ঐ—ক্যানেডিয়ান তরুণ ডাকছে আবার—বৈদ্যুতিক পদসংবাহন না করে ছাড়বে না। এত যে স্নেহ প্রীতি শ্রদ্ধা পাচ্ছি—সবই কি মায়া, আর সত্য কেবল আমার বিষাদের বিলাপ? না। শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্র জপ করতেই হবে আমাকে :

'Have Him I must and have Him I will'
He must be me His star-grace reveal.
(শেষ লাইনটা তাঁর নয়, আমার পাদপূরণ)

ইতি।

তোর নির্বিষণ্ণ দিলীপদা

নানা ভাবে ধর্মার্থীরা ভাব নিচ্ছে আমাদের। তাছাড়া মনে হল— শ্রীঅরবিন্দের তিরস্কার সত্য—আমার এক মস্ত দোষ অধৈর্য— impatience। এক সন্ত বলেছেন— বিধাতাকে মানব কেমন ক'রে যদি তাঁর বিধানকে না মানি? নইলে শরণাগতি নিটোল হবে কেন? না, চরণারতি হ'তেই পারে না শরণাগতিকে পাশ কাটিয়ে। আমার পূর্ণ শরণও হয়নি তাই এত বেগ পাচ্ছি সাধনায়। কৃষ্ণপ্রেমের কথা মনে পড়ে : 'বেগ পাচ্ছ? শুনে খুব খুশী হয়েছি। এ-পথ খুব দুর্গম। পর্বতারোহণে দম বন্ধ হয়ে আসে। সমতল ভূমিতে চলাফেরা করলে বেদম হ'তে হয় না, কিন্তু উঠতে হ'লে শ্বাসকষ্ট হবে না?' ('Those who say : they find it easy are only free wheeling on a level road...') আমার বইয়ে উদ্ধৃতিটি দেখিস।

অথ, কঃ পন্থাঃ? মহাজনের পদানুসরণ। বাস্তবিক সাধুসন্ত ছাড়া কে আপ্তবাক্যকে প্রাণমন্ত্রের আলো দেবে? আমি ভেবে দেখি—এ যাবৎ যা পেয়েছি তার আনন্দেই মুখ্যতঃ সাধনার শুষ্কতা সঙ্কট কাটিয়ে এসেছি। ভাগবতে অকারণ সাধুদের গুণগান করেনি। তুইই ধন্য হয়েছিস বহু সাধুর চরণধূলার আশীর্বাদে।

কিন্তু ফের পদসংবাহন। বার্ধক্যের মাশুল। নিরুপায়।

* * *

ভজন হ'য়ে গেল পদ সংবাহনের পরেই। তারপরে কেন জানি না মনে পড়ল এক দানশীলার কাণ্ড। দেখতে তুচ্ছ, কিন্তু তাৎপর্য কম নয়। হ'ল কি, আমাদের বই এত বেড়েছে যে স্থান হচ্ছে না। এখানে সবকিছুই অগ্নিমূল্য (কোথায়ই বা নয়?) একটা চলনসৈ আলমারি কিনতেও অন্তত পাঁচশো। উপায়? ঠাশাঠাশি ক'রে বই রাখি— টেবিলেও স্তূপাকার (শ্রীগোপীনাথের টেবিলের ম'ত)। হঠাৎ এ-দানশীলা তাঁর সুরম্য নিলয় বেচে তাঁর একটি চমৎকার আলমারি আমাদের দিয়ে গেলেন। ইন্দিরা উঠতে বসতে বলে : 'দাদা, দেন সবই ঠাকুর, আমি মনে করি।' কত সত্যি কথা। আমরা কেউ এ-বান্ধবীকে বইয়ের কথা বলিনি। তিনি না চাইতে গিয়ে গেলেন এক চমৎকার আলমারি—বইয়ের ফাঁড়া কাটল বৈ কি। এবার রোগের উৎপাত দূর হবার পালা। জয় ঠাকুর। ইতি। ইতি।। ইতি।।

এই চিঠির প্রথম দু পাতা পাওয়া যায় নি। পুণা থেকে লেখা নয়।

পৃষ্ঠা ৩ :
কাছে সযত্নে রেখে দিস। পুণার দপ্তরে রইল—যা যা ছাপতে হবে।
১। স্মৃতিজোয়ারে দুকূল ছেয়ে (স্মৃতিচারণ শেষ খণ্ড)

২। গান প্রেম দেশ ভগবান

৩। পাখা ও বাঁধন (এর ছাপার কী হ'ল? ওরা ফাল্গুনের কথা লেখেনি)

৪। আলোছায়ায় আঁকা পাখী (এটা হয়ত শীঘ্রই ছাপা হবে, অনিশ্চিত)

৫। The Flame & the lute (novel)

৬। Isn't It strange? (novel)

৭। When the Flute Calls (ইন্দিরার শতাধিক গানের ইংরাজী অনুবাদ)

এগুলির মধ্যে হয়ত আলোছায়ায় আঁকা পাখী আমার জীবদ্দশায় ছাপা হবে। বাকিগুলি (৬টি বই) তুই শ্যামল ও মিলন ছাপবি। কেমন?

নীলরতন সেন আমার জীবনী লিখবে বলে কোমর বাঁধছে। কিন্তু আমার জীবনী সে লিখতে পারবে ব'লে মনে হয় না। তুই আর শ্যামল উঠে প'ড়ে লাগলে হয়ত কাজ হবে। তবে আমার জীবনী তো আমার লেখার মধ্যে ছড়িয়ে আছে বারো আনা। তাই আমার জীবনী লেখার দরকার আছে বলে মনে হয় না। আমার মন এখন উড়ুক্ষু। তাই এ চিঠি তোকে তোর দপ্তরে রাখতে বলছি। হ্যাঁ, 'শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ ও শরৎচন্দ্র' তর্পণটিও ছাপতে হবে। আমি এবার ছুটি নিয়ে কেবল অকূল বাঁশির ডাকে ডুববার চেষ্টায় আছি। তবে আমার যা চাই তা তো হয় না। ঠাকুর কী চান এখনও জানাননি।

পৃষ্ঠা ৪ :

এ ধরণের চিঠি আমি লিখি না—মানে আমার দেহদুঃখের কথা। কারণ আমার মনে হয়—আমি ঠাকুরের কাছে এত আশীর্বাদ পেয়েছি যে আমার পক্ষে শেষ জীবনের দুঃখের কথা ব'লে পাঁচজনের সহানুভূতি চাইলে সেটা হবে অকৃতজ্ঞতা। না, খেদ আমার নেই। তবে দুঃখ দুঃখই। মায়া ব'লে তাকে বাতিল করা যায় না, অন্তত আমি তো পারি না। পারতেও চাই না। ঠাকুর যে-প্রসাদ দিয়েছেন তাকেই বড় ক'রে দেখতে চাই। এই দেহদুঃখের দুর্লগ্নেও কত বন্ধুবান্ধবী নিত্য আসে হরিকথা শুনতে—সে-ই তো আসল। দুঃখ আমার কাছে অভিশাপ নয়। তবে দেহ মানে না। চলৎশক্তিহীন হ'তে চায় না অবুঝ মন, বোঝে না যে এরও দরকার ছিল। ইচ্ছা আছে পুণায় ফিরে যদি শক্তি থাকে তবে গাইব দিনান্তের আনন্দ-কাহিনীই, বিষাদ-গাথা নয়। মানুষ কত কি অকিঞ্চিৎকর খেলনা নিয়ে মাতে, আমি যে মাতিনি এও কি ঠাকুরের কৃপা নয়? তবে দুঃখ কি? ৭৯ বৎসর পর্যন্ত তো দিগ্বিজয়ী হয়েই গান গেয়েছি, ভাষণ দিয়েছি। শেষের দিনে যদি তাঁর দানের অঙ্গীকারে চোখের জল ফেলি তবে সেও তো একটি পরম সমাপ্তি।

কিন্তু উচ্ছ্বাস হয়ে গেল বা। আমার মতন স্বভাব-জিজ্ঞাসুর পক্ষে অশ্রু উচ্ছ্বাস মানায় না। আমাকে করতেই হবে তাঁকে প্রণাম দিনান্তে—যদি নিশান্ত আসে তবে তার মধ্যেও পাব নবোদয়ের আনন্দবাণী। এই উচ্ছ্বাসই যথার্থ উচ্ছ্বাস। এ-চিঠি কাউকে দেখাসনি—অন্ততঃ এই শেষ পাতাটি। বলা রইল।

[গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিগুলিতে তিনজন বিশেষ ব্যক্তির কয়েকবার উল্লেখ আছে। তাঁদের নাম: প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী, অনির্বাণ এবং কৃষ্ণপ্রেম। এঁদের পরিচয় দেওয়া হল নিচে। সম্পাদক।]

প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী (বিশিষ্ট মনীষী, সাধক ও দেশব্রতী)—পূর্বাশ্রমে অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, রিপন কলেজে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সহকর্মী ছিলেন, স্যার জন্ উড্‌রফের সহযোগী রূপে তন্ত্রের নানা গ্রন্থে তাঁর বিশিষ্ট অবদান। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। শ্রীগোপাল বসু মল্লিক লেকচারাররূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। নানা ইংরাজি, বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা।

অনির্বাণ (অসাধারণ জ্ঞানী পুরুষ, সাধক ও লেখক)—পূর্বশ্রমে নরেন্দ্রচন্দ্র ধর। কৈশোরেই স্বামী নিগমানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে সংস্কৃতে এম. এ পাশ করেন। আশুতোষ অধ্যাপক ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় তাঁর সহপাঠী ছিলেন। 'বেদ-মীমাংসা' গ্রন্থের জন্য তাঁকে রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও 'উপনিষৎ প্রসঙ্গ' 'গীতানুবচন' প্রভৃতি অজস্র গ্রন্থ লিখে গিয়েছেন।

কৃষ্ণপ্রেম (মরমিয়া সাধক ও জ্ঞানী) পূর্বাশ্রমে রোনাল্‌ড্ নিক্‌সন (Ronald Nixon)। Oxford থেকে Tripos নিয়ে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী-অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। পরে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। উপাচার্য জ্ঞানশরণ চক্রবর্তীর সহধর্মিণী যশোদা মা'র কাছে বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ ক'রে সন্ন্যাসী হয়ে যান ও কৃষ্ণপ্রেম নামে পরিচিত হ'ন। হিমালয়ে আলমোড়া অঞ্চলে রাধাকৃষ্ণের মন্দির স্থাপন ক'রে সেখানেই জীবন কাটান বিজন সাধনায়। তাঁর আশ্চর্য রচনা ও মনীষার পরিচয় পাওয়া যায় The Yoga of the Bhagavad Gita ও The Yoga of the Kathopanishad, Initiation into Yoga প্রভৃতি গ্রন্থে। দিলীপকুমার রায় রচিত ও ভারতীয় বিদ্যাভবন কর্তৃক প্রকাশিত Yogi Sri Krishna Prem গ্রন্থে তাঁর ব্যক্তিমানস চিত্রিত হয়েছে।

শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত-কে লেখা চিঠি

ওঁ

১৮.৪.৬৯

৫ বৈশাখ ১৩৭৬

শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত (Statesman)
প্রীতিভাজনেষু

দিন দশেক আগে আপনাকে আমার 'Mothers and Sons' পাঠিয়েছি। প্রকাশক (সিদ্ধি, India Book House) আমাকে কুড়ি কপি পাঠিয়েছিলেন নানা কাগজে সমালোচনা করাতে। তাই আপনাকে পাঠানো। শ্রীদীপঙ্কর ঘোষকে পাঠানো হয়েছিল দু কপি তিনি মাসিক ও সাপ্তাহিক বসুমতীতে সমালোচনা করিয়েছেন। আশা করি আপনি Statesman-এ বা অন্য কোনো কাগজে (বাংলায় বা ইংরাজীর) বইটির সমালোচনা করবেন। সমালোচনা মানে ওরা (সিদ্ধিরা) বোঝে বিজ্ঞাপন। ব্যবসাদার তো

ভাববে যেন সমালোচকের সত্যিই কোনো লেখা ভালো লাগে বলেই তিনি সমালোচনা করতে পারেন বাংলা দেশে?

বাংলাদেশে এখনো যে গুণীর গুণমর্যাদা দেওয়া হয় Statesman-এ আপনার সশ্রদ্ধ প্রশস্তিতে যেন নতুন ক'রে পরিচয় পেয়েছিলাম। 'নতুন ক'রে' বলছি এই জন্যে যে, আমার মনে হয় বাংলাদেশে বৃদ্ধ দিলীপকুমারের কণ্ঠে কীর্তন ভজন স্তোত্রাদি জনপ্রিয় হ'তে পারে না আর। মনে হয় এই জন্যে যে, যুগ বদলেছে তথা আমি এখন আর সব আগে গায়ক (বা সাহিত্যিক) নই। আজ আমি সব আগে ভক্ত সাধক জিজ্ঞাসু বলেই পরিচিত হ'তে যাই—যার কাছে গান (বা সাহিত্য) শুধু তার আত্মিক উপলব্ধির নানামুখী উচ্ছলন। তাই আমার ভক্তির গানে এ-যুগের 'নাস্তিকায়মান' বুদ্ধিবাদীর সাড়া দেবার কথা নয়—এইই আমার মনে হয়। সেই জন্যেই হঠাৎ আপনার লেখায় Still-delightful শীর্ষক প্রশস্তিতে শুধু খুশী না, ঈষৎ আশ্বস্তও হয়েছিলাম হয়ত আমি ভুল ভেবেছি মনে ক'রে।

আজ শেষ ডাকের অপেক্ষায় আছি শান্ত আনন্দে। আমার জীবন বহুকর্মসাধনায় লিপ্ত হয়ে কেটেছে চিরকাল—সাহিত্য, গান, কাব্য, ভ্রমণ....ইত্যাদি। কিন্তু তবু আমার কোনোদিনই এমন কথা মনে হয় নি যে, নিছক কর্মশীল উদ্যমেই মানবজীবনের সার্থকতা। তাই আমি চেয়েছিলাম ধর্মপন্থী সাধক হ'তে যে চায় সব আগে ভগবানকে তারপর আর সব। খৃষ্টের একটি মহাবাক্য আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল যৌবনেই: Find the Kingdom of Heaven within you, then all the other things will be added unto you. সামাজিক বা আর্ট বিজ্ঞান মনন ইত্যাদিতে রস পাওয়া অন্যায় বলি না—(সবই তো ভাগবতী লীলা)—কিন্তু তবুও আমার মন বলে যে, ভগবানকে পেলে তবেই এসবের কাজ থেকে পূর্ণ রস আদায় ক'রে নেওয়া সম্ভব, নৈলে নয়। অন্ততঃ এইই ছিল আমার নিজের জীবন-ভাষ্য খৃষ্টের অমূল্য বাণীর। তাই আমি আজো লোকজনের সঙ্গে অবাধে মিশি, অকুণ্ঠে হাসি, সবাইকেই কাছে ডাকি (মানে, যারা আমার কাছে আসতে চায়) গল্পালাপ করি, ভ্রাম্যমাণ হই নিত্যনবজিজ্ঞাসু রসগ্রাহীর খবর নিতে, কিন্তু আমার অন্তিম লক্ষ্য এসব নয়—অন্তিম আশ্রয় কেবল ভগবান্। তাঁর পায়ের কাছে পৌঁছেছি, কিন্তু পূর্ণ আশ্রয় পাই নি আজো। ভরসা পেয়েছি পাব এ জীবনেই, তবে যদি না পাই তাহ'লে দেহান্তের সময় দুঃখ থাকবেই থাকবে যে শেষরক্ষা হ'ল না।

মনে হয় শেষরক্ষা হবে। তবে দেহযন্ত্র আজকাল দুঃখ দেওয়া সুরু করেছে ব'লে ভাবনা হয় বৈ কি—হবে তো শেষরক্ষা?

না হ'লে ফের জন্মাতে হবে। তাতে আপত্তি নেই। কেবল প্রার্থনা—যেন ভগবানকে আরো একান্তী হ'য়ে আকুল হয়ে চাইতে পারি পর জন্মে। প্রহ্লাদের একটি প্রার্থনা মনে পড়ে:

নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং

তেষু তেষ্বচ্যুতা তত্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি
পশু হয়ে যদি জন্মি মর্ত্যে, তাহলেও খেদ নাই শ্রীনাথ,
যদি শুধু থাকে তোমার চরণে অচলা ভক্তি অপ্রমাদ।

আপনাকে হঠাৎ এত কথা লিখব ভাবি নি। তবে রবীন্দ্রনাথ আমাকে প্রায়ই বলতেন একটি অপ্রতিবাদ্য কথা: 'ঝোঁকানো মনের বালাই বিস্তর।'

ইতি। ভবদীয় শুভানুধ্যায়ী

শ্রীদিলীপকুমার রায

নীলরতন সেন-কে লেখা চিঠি

ওঁ

২রা মাঘ, ১৩৭৫

১৬.১.৯৬

নীলরতন স্নেহাস্পদেষু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। আজকাল আমাকে সাহেব ভূতে পেয়ে বসেছে তাই—ইংরাজীতে কবিতার পর কবিতা লিখে চলেছি—ভূত ঘাড় থেকে না নামলে তার হুকুমবরদার হওয়া ছাড়া উপায় নেই—নৈলে তোমাকে এমন দীর্ঘপত্র লিখতাম যে তুমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে। বড় বেঁচে গেছ। কারণ গত কদিন ধরে যা যা লিখব ভেবে ক্রমাগতই চঞ্চল হয়ে উঠেছি তার সিকি ভাগও লিখবার ফুরসৎ নেই আজ। তবে এ সিকিভাগেও যদি তুমি অতিষ্ঠ হও তাহলে নিরুপায়, কারণ সিকির সিকি লিখে আমি কিছুতেই স্বস্তি পাব না।

তুমি যে-দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিচার করেছ আমি সে দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধী। আমার মনে হয়—কোনো সত্যিকার বড় ব্যক্তিরূপকে (personality) এভাবে খণ্ড খণ্ড করে দেখলে তার যথার্থ মূল্যায়ন হতেই পারে না। কেন পারে না বলতে চেষ্টা করব সংক্ষেপে। অবহিত হও।

ধরো, যদি রবীন্দ্রনাথ গোরা চতুরঙ্গ ঘরে বাইরে চোখের বালি নষ্টনীড় গল্পগুচ্ছ প্রবন্ধাবলী না লিখে একের পর এক শুধু কবিতা লিখে মহাকবি উপাধি পেতেন, তাহলে কী হতো বলো, তিনি মহাকবি হতেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হতেন না। আমি বিস্মিত হই তাঁর কবিত্বে বটেই তো, কিন্তু তার চতুর্গুণ বিস্মিত হই ভাবতে তিনি কীভাবে নিজেকে নানা রঙে বিভাবে সুবাসে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর সুদূর তৃষিত বহুমুখী অভীপ্সার (aspiration) দাম দিয়ে মান রেখে। বিশেষ করেই মহাভাগ মহান আধারদের সম্বন্ধে একথা খাটে—ধরো, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'রামেন্দ্রসুন্দর, তোমার সকলই সুন্দর।' তাঁর প্রবন্ধ পড়ে আমি লাভবান হয়েছি। কিন্তু তাঁকে মহাভাগ মহান আধার বলব না। বড় আধার গড়ে ওঠে অনেকগুলি অভীপ্সার সমন্বয়ে। একমুখী একরোখা সাহিত্যিক বড় সাহিত্যস্রষ্টা হ'তে পারে তাঁর কাব্যে কি উপন্যাসে কি প্রবন্ধে। কিন্তু সবচেয়ে বড় হয় মানুষ এই নানামুখী বৃত্তির সমাহারে। যেমন ধরো গেটে বা টলস্টয়।

প্রথম গেটেকে নাও। তিনি ছিলেন অসামান্য কবি, দ্রষ্টা, দার্শনিক, অসামান্য চিন্তাবীর, অসামান্য আলাপী, অসামান্য প্রেমিক, অসামান্য কর্মী, এমনকি বৈজ্ঞানিক বৃত্তিতেও তাঁর স্বকীয়তা বিস্ময়কর। তাই তুমি যদি এসবই অবান্তর বলে বাদ দিয়ে গেটেকে শুধু তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য ফাউস্ট দিয়ে বিচার করো তাহলে আমি বলবই বলব—রাগ কোরো না—যে সে মূল্যায়ন হবে উপরভাসা (superficial)। আমি গেটের রচনা পড়তে পড়তে তাঁর আশ্চর্য ব্যক্তিরূপের কথা ভেবেই সবচেয়ে বেশী বিহ্বল হই। সম্প্রতি মূল জর্মনে তাঁর নানা কবিতার পাশাপাশি হঠাৎ তাঁর WERTHER উপন্যাসটি পড়তেই

চমকে উঠি। এ কী ব্যাপার? যুবক বয়সে কীভাবে তিনি প্রেমে সাড়া দিয়েছিলেন তার এ কী ব্যথাতুর ছবি। ইংরিজি বিশ্বকোষে লিখেছে ঠিকই যে এইটি লিখেই সর্বপ্রথম য়ুরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কেন তাঁর এ-কাঁচা লেখায়ও সমগ্র য়ুরোপ চমকে উঠেছিল? না, তিনি প্রেমের ছবি এঁকেছিলেন হৃদয়ের রক্ত দিয়ে শুধু সাহিত্যস্রষ্টা হ'তে না, প্রেমের গভীর বেদনার ব্যর্থতার রূপ ফুটিয়ে তুলে নিজের বেদনার আলোয়। গেটের ব্যক্তিরূপ শুধু কবি বা সাহিত্যিকের সার্থক মঞ্জরণমান নয়—গেটে সে-যুগে এসেছিলেন এক বিচিত্র সমৃদ্ধ সমন্বয়ের প্রতীকরূপে। বহু চিন্তাশীল লোক মনে করেন—আধুনিক সংস্কৃতির তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্রদূত। আমার মনে হয় তাঁর জীবন একটি 'আবির্ভাব'। এ হেন গেটের সমালোচক হতে চেয়ে যদি তুমি শুধু তাঁর কবি প্রতিভাকে ধ'রে তাঁর পূর্ণ মুল্যায়ন করার চেষ্টা করো তো আমি বলবই বলব সে মুল্যায়ন ভূয়োদর্শী হবে না, কেন না সে হবেই হবে একপেশে।

টলস্টয়ের জীবন বিচার করলে আমার বক্তব্যটি হয়ত আরও পরিষ্কার হবে। মনে পড়ে আমার যৌবনে আমি পরমানন্দে পড়তাম টলস্টয় ও টুর্গেনিভের উপন্যাস। বীরবল প্রমুখ আমার কোনো কোনো রসৈকান্ত বিজ্ঞ বন্ধু বলতেন—টুর্গেনিভ ঔপন্যাসিক হিসেবে টলস্টয়ের চেয়ে বড়—সত্যিকার শিল্পী। পরে রোলাঁ আমাকে লিখেছিলেন এ সম্পর্কে যে, টলস্টয়ের সঙ্গে টুর্গেনিভের এক নিঃশ্বাসে নাম করাও হবে হসনীয়, টলস্টয় ছিলেন প্রকৃতির মহাশক্তির মতনই দুর্বার বিশাল...ইত্যাদি। আমাকে রোলাঁই প্রথম বুঝিয়ে দেন কোথায় টলস্টয়ের মহত্ত্ব—বিশালতা* টলস্টয় সব জড়িয়ে ছিলেন। গেটের চেয়ে আরো আশ্চর্য-আবির্ভাব একাধারে ঔপন্যাসিক ব্যক্তিরূপ, বহুমুখী প্রতিভার সঙ্গে ধর্মতৃষ্ণার এহেন সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অতি বিরল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়—তিনি শিল্পী হয়ে আবালবৃদ্ধবণিতার মন কাড়লেন ধর্মের আলোকস্তম্ভ রূপে জ্বলে উঠে তবেই সমগ্র পাশ্চাত্য জগতের (এমনকি গান্ধিজিরও) ভক্তিভাজন হয়েছিলেন। তাই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিকে সর্বান্তকরণে অভিনন্দন করেও বলা যায় যে টলস্টয় বিশ্ববরেণ্য হয়েছিলেন ধর্মের এক অকল্পনীয় উদ্‌গাতারূপে। আইনস্টাইন বলতেন ডস্টয়ভস্কি ঔপন্যাসিক হিসেবে টলস্টয়ের চেয়ে বড়। এ কথা সত্য হোক বা না হোক টলস্টয়ে চারিত্র-গরিমা যে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর বিস্ময়কর ধর্মজীবনের বিকাশের প্রসাদেও এ কথা অকুণ্ঠেই বলা চলে। আমার শৈশবে মনে আছে—তাঁর নাম সবাই নিত ভক্তিভরে ঋষি টলস্টয় উপাধি দিয়ে। তাই ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি আর কারুর সমকক্ষ হোন বা না হোন তার পূর্ণ বিকাশে যে তিনি (বৈষ্ণব পারিভাষিকে) 'অসমোর্ধ্ব' হয়ে য়ুরোপে অনন্য মহাজন হয়ে দীপ্যমান হয়েছিলেন একথা বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না। ভাবো একবার কতবড় হৃদয়—যার প্রেরণায় তিনি বৃদ্ধবয়সে সব ছেড়ে কৃষাণ হয়ে কৃষকের কুটীরে দেহত্যাগ করেন প্রাসাদ ছেড়ে। এ হেন ধর্মবীরকে শুধু শিল্পীর মর্যাদা দিয়ে মান দিলে কি তাঁর অনন্য চরিত্রের অসম্মান হবে না!

এককথায় (পুনরুক্তি মার্জনীয়) কোনো মহৎ ব্যক্তিরূপকেই তার একটি দুটি শিল্প

---

* আমার Among the great-এ তাঁর-এ চিঠিটি পরো ছাপা হয়েছে

বিকাশের নিকষে কষে দাম ধরা সম্ভব নয়। খণ্ড বিকাশকে ঠিকমত দেখতে হলে চাই উদার দৃষ্টি। টলস্টয়ের সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলার ছিল কিন্তু সময় নেই আর—রাত প্রায় দুপুর বাজে। সারাদিন ইংরাজী কবিতা লিখে ক্লান্ত। তাই এখন যাই। যদি সময় পাই ও তুমি আগ্রহী হও (বিরক্ত না হ'য়ে) তবে টলস্টয়ের ধর্মজীবনের বিকাশের সম্বন্ধে আরো কিছু লিখতে পারি। তবে ধর্মের কথায় তোমার ঔৎসুক্য হবে কি? সন্দেহ। তাই ভয় করে পাছে উত্যক্ত ক'রে বসি তোমার স্বভাবসুকুমার মনকে। ইতি

নিত্যাশীর্বাদক দিলীপদা

পুঃ ১৭.১.৬৮

কাল থেমে যেতে হ'ল কারণ একটি সত্যিকার সাধু এসেছিলেন সন্ধ্যায় ভজন শুনতে। এঁর বম্বের কাছ একটি চমৎকার আশ্রম আছে। ইনি আমার 'বৃন্দাবনের লীলা' গান (হিন্দি ও বাংলায়) শুনে উচ্ছ্বসিত। সাধুজি জ্ঞানমার্গী কিন্তু দেখলাম 'বিরক্ত বৈরাগী' নন। জ্ঞানের তাপে তাঁর প্রেম শুকিয়ে যায় নি। (পরমহংসদেব বলতেন না—জ্ঞানযোগী স্বভাবতঃ একটু শুকনো হয়?) তাই গান শুনে শেষে তাঁর ভাষণে বললেন : 'সত্যি জ্ঞানের উদয় হয় হৃদয়ে ভক্তি জাগলে তবেই। দাদাজির গান শুনে এ কথার যেন একটা নতুন প্রমাণ পেলাম। তিনি সবাইকে টানছেন তাঁর ভক্তির চুম্বকে ঠাকুরের নামকীর্তনে। এই ভক্তি, পরা ভক্তিই হ'ল সর্বার্থসাধিকা। যাঁরা 'মানুষ মানুষ' করে হট্টগোল করেন তাঁদের কথা কেউ কান করেন না কেন? কারণ তাঁরা ভগবানকে ভালবাসতে পারেন নি। ভগবানকে ভালো না বাসলে মানুষকে—হিউম্যানিটিকে—ভালোবাসা যায় না। তাঁকে ভালবাসলে তবেই সত্যিকার সর্বজীবে প্রেম জেগে উঠতে পারে।....ইত্যাদি' কথাটা শুনে চমকে গিয়েছিলাম, মনে পড়ে গিয়েছিল যোগি কবি এ. ই.-র একটি অবিস্মরণীয় শ্লোক :

When the spirit wakens it will not hour less
Than the whole of life for its tenderness.

অন্তরে আলো যখন জাগে সে থাকে না তো আর আত্মসুখী,
গাঢ় কোমলতা টানে প্রাণ তার হয় আনন্দ বিশ্বমুখী।

কিন্তু এ আলো না জাগলে জগতে অজস্র দীপালি জ্বালিয়ে আমাদের চোখ ধাঁধালেও সে দীপ্তিতে অন্তর থেকে যায় যে তিমিরে সেই তিমিরে। এ যে কথার কথা নয় তার হাজারো প্রমাণ আছে। কে ছিলেন খৃস্ট? এক ছুতোরের ছেলে। অথচ তাঁর প্রেমের বাণীবাহ হ'য়ে যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ সব ছেড়ে হ'ল রুগ্নের ভিষক, আর্তের সেবক, নিরক্ষরের শিক্ষক।

বুদ্ধ যদি রাজপদে কায়েমী থাকতেন তাহলে কে তাঁর নাম জানত আজ? কিন্তু মানুষের দুঃখে কষ্টে উদভ্রান্ত হয়ে তিনি ভাগবত করুণার আলো পেয়ে সারা জগতে ছড়িয়ে ছিলেন তাঁর মৈত্রীবাণী, নিষ্কামতার মুক্তিকিরণ। শ্রীচৈতন্য হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে শ্রীক্ষেত্রে চণ্ডালকেও কোল দিয়ে বসালেন প্রেমের হাট, নামের জয়জয়াকার। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ শ্রীঅরবিন্দ হাজার হাজার জিজ্ঞাসুর মনে জাগিয়ে দিলেন ভগবৎ প্রেমের সঙ্গে জ্ঞানের আলো। অশান্তের সেবা তৃষ্ণা। কিন্তু দ্রষ্টব্য এই যে ভগবৎ প্রেম

না জাগলে কিছুতেই বিশ্বপ্রেম জাগতে পারে না। তাই এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক টয়েনবি ভগবৎ প্রেমের পুরোহিতকেই সর্বোচ্চ মান দিয়েছেন এবং খুব জোরালো সুরেই লিখেছেন : The works of artists and men of letters outline the deeds of businessmen, soldiers and statesmen. The poets and philosophers outrange the historians, while Prophets and Saints outlast them all.'

এই জন্যই তিনি ইতিহাসের অজস্র সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে এই অকাট্য সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে আমাদের জীবনকে সব আগে সেকুলার ভিৎ থেকে তুলে এনে বসাতে হবে ধর্মের ভিৎ-এ : In the seculer life of the spirit, put the secular superstructure back on to religious foundatios ভাবুক সবশেষে লিখছেন—যে কথা আজ জগতের আরো অনেক চিন্তানায়কই স্বীকার করবার কিনারায় এসেছেন—(যাঁরা এক সময়ে কখন বিজ্ঞানচর্যায়ই মুক্তি মিলবে ঘোষণা করতেন গদগদ কণ্ঠে) : 'মানুষ বুদ্ধি ও বস্তুবিশ্বে যে কীর্তি লাভ করেছে তাতে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হায়রে, আত্মিক জগতে সে রয়ে গেল অবোধ অকর্মা। হওয়া উচিত ছিল উল্টো : আত্মিক জগতেই সব আগে সর্বেসর্বা হওয়া, তারপরে অন্যসব কীর্তি। একথা বলা চলে এইজন্যে যে, আত্মিক জগতে সাফল্য লাভ করার দাম বাহ্য জগতে কর্তৃত্ব লাভ করার চেয়ে হাজার গুণ বেশী।'

মূল ইংরাজী উদ্ধৃতি দিলাম না চিঠি বড় হয়ে যাচ্ছে বলে। টয়েনবির বইটির শেষ অধ্যায়ে এ উদ্ধৃতিটি পাবে।—The Meaning of History for the soul অধ্যায়ে।

চিঠিটা আর চিঠি রইল না। দুঃখিত। কিন্তু উপায় কি? ঠাকুরের কথা ভাবতে ভাবতে আজকাল প্রায়ই ধান ভান্‌তে শিবের গীত সুরু করি। আমার আগেকার বন্ধুবান্ধবেরা আমার ছায়া মাড়ান না কি সাধে। তাঁরা যে আজও বিশ্বাস করেন সুপারসনিক বায়ুযানের কল্যাণেই মানুষের চতুর্বর্গ লাভ হবে। গতিবাদেই মিলবে স্বর্গরাজ্য। 'চলো চলো চলো—কোথায় যাচ্ছ ভেবো না কেবল চলো উড়ে আকাশ জুড়ে!' আমার মধুমুরলীতে 'কালোর চোখে আলোই কালো' কাব্যকথিকাটি পোড়ো। যারা ধার্মিক তারাই আজ পাগল বলে গণ্য যারা দিশাহারা তারাই বরেণ্য। হায় হায় এ-মূল্যায়নে মুক্তি মিলবে কি?

ওঁ
৭ অগ্রহায়ণ
১৩৭১

হরিকৃষ্ণ মন্দির
পুণা—১৬

শ্রীমান্ নীলরতন সেন

স্নেহাস্পদেষু

তোমার চিঠি পেলাম। আমার সাহিত্যিক বনাম সাঙ্গীতিক বিকাশ সম্বন্ধে পরে লিখবার ইচ্ছা রইল। না লিখলেও চলে কারণ এ অতি ব্যক্তিগত আলোচনা, যার কোনো স্থায়ী মূল্যই নেই। তাই শুধু বলি আমি নিজে কোনো মানুষকে খণ্ড খণ্ড করে বিচার

করার প্রয়াসী নই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি পত্রে আমাকে লিখেছিলেন তিনি সব আগে কবি। চিঠিটি আমার 'অনামী' ও 'তীর্থঙ্কর', উভয়ত্রই ছাপা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর সামগ্রিক বিকাশ ধরলে তবেই তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন হতে পারে নৈলে নয়। আমার বন্ধুরা প্রায় সবাই একমত যে আমি সুগায়ক। বলেই তাঁরা খুশী। যা বলার বলা হয়ে গেছে ভেবে। কিন্তু আমি যখন নিজের পানে তাকিয়ে দেখি তখন একটি সত্য বারবারই আমার চোখে পড়ে : যে আমার যোগোত্তর জীবনে সাহিত্য শুধু যে আমার সঙ্গীতের চেয়ে ঢের বেশি আকর্ষণ করেছে তাই নয়, আমার সাহিত্যিক বিকাশের সঙ্গে আমার সাঙ্গীতিক বিকাশের কোনো স্বতোবিরোধই নেই। না, আরো বেশী বলা যায়— এ ওকে পূর্ণই করেছ। অপিচ, আমার ধর্মীয় বিকাশকে বাদ দিয়েও আমার সাহিত্যিক বা সাঙ্গীতিক বিকাশের মূল্যায়ন আমি সম্ভব মনে করি না। তবে এ হল মতবাদের কোটা তথা রুচিভেদের ক্ষেত্র, এখানে তর্কাতর্কি নিষ্ফল। যার যা ভালো লাগে সে তাতেই সাড়া দেয়, যা বোঝে না বা যার খবর রাখে না তার সম্বন্ধে কীই বা বলবে যা বলার মত? তাই মরুক গে ও বৃথা বিতণ্ডা।

আমার বইগুলির মধ্যে সম্প্রতি লেখা তিনখানি বই তোমাকে পাঠাতে পারি যদি চাও। অবশ্য উপহার—তোমাকে স্নেহ করেও বই-এর দাম নেব এ তো হতেই পারে না। বই তিনটির নাম : ১) অঘটন আজো ঘটে, ২) দেশে দেশে চলি উড়ে ও ৩) ভাবি এক হয় আর। এ বইগুলি যদি পড়ে না থাকো ও পড়তে চাও সত্যিই তবে অকুণ্ঠে লিখো। আমার নিজের পাঠাতে কুণ্ঠা হওয়ার প্রধান কারণ—১) ও ২) ধর্মকেন্দ্রিক লেখা কেবল ৩) শিল্পকেন্দ্রিক। 'অঘটন আজো ঘটে' আমার মতে আমার শ্রেষ্ঠ বই। এর সম্পর্কে অন্ততঃ দু'তিন শো চিঠি পেয়েছি নানা ধর্মার্থীর কাছ থেকে। তবে ধর্মোপন্যাসে কি তোমার মন সাড়া দেয়? নিঃসঙ্কোচে জানিও, কারণ সাড়া না দেবার সম্ভাবনাই যে বেশী এ আমি জানি বৈকি। তবে ঐ দেখ ফের এসে গেল ধান ভানতে সত্যিই শিবের বা কৃষ্ণের গীত : আমি যে ভাই ধর্মের বন্দরেই নৌকো ভিড়োতে চাই, শিল্প সঙ্গীত কাব্য এ সবই যে আজ আমার কাছে অবান্তর। আমার চেতনার এ রূপান্তরে তোমাদের মন খুশী হবার কথা নয়। কেন নয় ব্যাখ্যার্থে একটি চিঠি পাঠালাম—পত্রে এহেন খেদের পুনরুক্তি করে কী হবে? এ যুগ তো ধর্মেরও নয় শিল্পেরও নয় বিজ্ঞানের ও ভোগবাদের।

আমার স্নেহাশিস নিও। ইতি—

তোমার নিত্যশুভার্থী দিলীপদা

ওঁ

১০ চৈত্র ১৩৭৪ ২৪.৩.৬৮

স্নেহাস্পদেষু

চোখে ছানি সত্ত্বেও তোমাকে কেন লিখি কষ্ট ক'রে? উত্তর : স্বভাব ভাই, স্বভাব। কর্মের নাগপাশ 'কমলীর' মতন ছোড়তি নহি। কত ভাবি—এবার জপতপে মন দেব—

এত বেশী কর্মযোগ ক'রেই হয়ত কর্মভোগে পড়েছি, কিন্তু দুর্ভোগের দুর্যোগ না কাটলে কি সুদিন সুযোগ ঋতুরাজের মতন আসে? ফুল ফোটবার পথে বাধা কি কম? মাটির রস কম হলে, সূর্যের তাপ বেশি হ'লে, ঝড়বাদলের রাগ হ'লে—এমন কি হঠাৎ বেড়া ভেঙ্গে গোমাতা হানা দিলেও সব ফর্সা—চারাগাছের কান্নাকাটিই সার। তাই ভাবি মাঝে মাঝে কী হবে শেষে—এত বেশী কর্ম করে শেষটায় দয়ে মজব না তো? তাই একবার একটি গানের শেষে লিখেছিলাম :

কেন করো এ ছলনা বন্ধু বলোনা
মায়ার খেলায় ভুলায়ে—
মিছে কাজে রেখে জড়ায়ে?

কাজেই দেখব—অভিযোগ অনুযোগ গোলযোগে আমরাও কম যাই না। কেবল শেষটায় জলযোগ হ'য়ে শেষরক্ষা হয় যেন বলি 'সর্বনাশী'-কে।

তোমার পাঠানো ঐ গানটা ঠিক সময়েই এসেছ। ইন্দিরা তো উজ্জিয়ে উঠল—তাকে যেই শোনালাম তোমার চিঠির সঙ্গে ঐ দুটি অপরূপ চরণ (নরচন্দ্র রায়ের)

মা বলে ডাকিস না রে মন, মাকে কোথায় পাবি ভাই?
থাকলে এসে দেখা দিত সর্বনাশী বেঁচে নাই।

জগন্মাতাকে 'সর্বনাশী' বলতে পারে কে? কেবল যে সত্যি ভক্ত—সর্বহারা—সে। য়ুরোপে কিন্তু ভক্তির এহেন দ্রোহী ভাব ও অভিমানের ভাষা ব্লাসফেমি ব'লে শোরগোল তুলত—হয়ত নরচন্দ্র রায়কে শূলেই দিত। কিন্তু আমাদের বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধকেরা নিষ্পরোয়া—তাই ইষ্টকে মা-কে দেবদেবীকে কোনোদিনই যা মুখে আসে বলতে ভয় পান নি, কারণ তাঁরা যে ভালোবেসেছিলেন। আমি জানতে চাই এই নরচন্দ্র রায়ের কথা। এ-গানটির বাকি পদগুলি পাঠাবে? অবিশ্যি আমি জানি—আগের যুগের সাধকেরা প্রায়ই টাল সামলাতে পারতেন না—কবিত্বে একটু আধটু উঠেই একেবারে ভূমিশয্যা—পপাত চ মমার চ। তবু তাঁদের মনের একটু ছবি ..তা পাব.

কিন্তু শুধু এই প্রশ্ন করতেই তোমাকে এ-চিঠি . ·খতে বসি নি। বসেছি—জানাতে যে, এই সূত্রে তুমি আমার একটি সত্যিকার ভালো গানের জনক না হলেও উদ্দীপক হয়েছ বৈ কি। তাই ইন্দিরা যেই বলল, পরশু রাত দশটায় : 'যে ভালো করেছ শ্যামা'-র মতন এ দুটি চরণেরও পাদপূরণ করলেই বা'—সেই মন আমার লাফিয়ে উঠল যেন। নানাকাজে দেহ ছিল ক্লান্ত, চোখে ঘুমের ঘোর,—কিন্তু সব তামসিকতা মুহূর্তে গেল কেটে, উপরে এসেই তরতর করে লিখে ফেললাম গানটি—দেখ দেখি কেমন হ'ল?

মা বলে ডাকিস না রে মন,
মাকে কোথায় পাবি ভাই?
থাকলে এসে দেখা দিত
সর্বনাশী বেঁচে নাই।

ঘনালে রাত আমরা জপি :
ভয় কি? কালই উঠবে রবি!
দেয় যে আলো বেসে ভালো
চায় তো তারি প্রেম সবাই :
রং যার আঁধার নেই স্নেহ যার
কে চায় তার কোলে ঠাঁই?'

কাঁদে শিশু : 'হায়, মা বিনা
আমি যে কিছুই জানি না,
মার বুকে ভাই জাগি ঘুমাই
হাসি কাঁদি নাচি গাই।
মা ছাড়া যার নেই কেউ-তার
গায় না কি প্রাণ : মাকেই চাই?'

মা বলে হাত বাড়িয়ে হেসে :
'কাঁদাই আমি ভালোবেসে
অশ্রু-মেঘে সদাই জেগে
রামধনু হাসিরে রাঙাই :
বিধুর নিশার ব্যাকুলতার
ডাকেই উষার সুর সাধাই।'

গানের প্রথম চারপংক্তি কুমার নরচন্দ্র রায়ের রচনা। পরবর্তী অংশ কুমার দিলীপের।

দিলীপকুমার রায়ের জীবনপঞ্জি

২২ জানুয়ারি, ১৮৯৭	: কলিকাতায় জন্ম।
২৯ নভেম্বর ১৯০৩	: জননী সুরবালা দেবীর মৃত্যু।
১৯১০	: কলিকাতার মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশনে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ ও শিক্ষার সূচনা।
১৯১৩	: মেধাবৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৭ মে ১৯১৩	: পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যু।
১৯১৩	: প্রেসিডেন্সি কলেজে আই.এসসি ক্লাসে পঠন সুরু।
১৯১৫	: আই. এসসি পরীক্ষায় চব্বিশতম স্থান লাভ।
১৯১৮	: প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গণিতে প্রথম শ্রেণীর স্নাতক।
১৯১৯	: ইংলণ্ড প্রবাস ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত শাস্ত্রে পাঠের সূচনা। সহপাঠী সুভাষচন্দ্র বসু।
১৯২০-২১	: কেম্ব্রিজে অঙ্কে পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ট্রাইপস এবং মিউজিক পার্ট ওয়ান উত্তীর্ণ।
১৯২১-২২	: বার্লিনে সংগীতিক ভ্রমণ, জার্মান ও ইটালিয়ান সংগীতশিক্ষা ও পাশ্চাত্য রীতিতে কণ্ঠ চর্চা। পিয়ানো শিক্ষা এবং জার্মান ও ইটালিয়ান ভাষা চর্চা। রোমা রলাঁ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, হেরমান হেসের সান্নিধ্য লাভ। রলাঁর প্রয়াসে ইন্টার-ন্যাশনাল পিস অ্যাণ্ড ফ্রিডম সোসাইটির আমন্ত্রণে সুইজারল্যাণ্ডের লুগানোতে ভারতীয় সংগীত বিষয়ে ভাষণ।
১৯২২	: স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্য ও পরম্পরার খোঁজে ভারতভ্রমণ। আবদুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, চন্দন চৌবে, হাফিজ আলি খাঁ প্রভৃতি সংগীতগুণীদের সান্নিধ্য অর্জন।
১৯২৭	: দ্বিতীয়বার বিদেশভ্রমণ
১৯২৮	: পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ আশ্রণে বসবাসের সূচনা এবং যোগজীবনের ব্রতী।

১৯৩৭-৪২	: কলিকাতা প্রত্যাবর্তন, রেকর্ড সংগীতের ধারাবারিক প্রকাশ, উমা বসুকে দিয়ে সংগীত প্রচার, অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের গানের প্রচার, নানাবর্গের গান রচনা, গানের আসর ও সাংগীতিক পরিমণ্ডল রচনা।
১৯৪২	: উমা বসুর অকালমৃত্যু ও পণ্ডিচেরিতে প্রত্যাবর্তন।
১৯৫০	: শ্রীঅরবিন্দের প্রয়াণ ও সর্বত্যাগী দিলীপ কুমারের সংকট।
৪ জানুয়ারি-২৭ আগস্ট ১৯৫৩	: প্রধানমন্ত্রী নেহরুর আগ্রহে ও শিক্ষামন্ত্রী আজাদের আনুকূল্যে ভারতের সাংস্কৃতিক দূতরূপে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ এবং দেশে দেশে সংগীত পরিবেশন।
১৯৫৯	: প্রথমে বন্ধু জি. ডি. মেহতার আমন্ত্রণে তাঁর পুণের গৃহে বসবাস এবং পরে হরিকৃষ্ণ মন্দির স্থাপন।
১৯৮০	: পুণের হরিকৃষ্ণ মন্দিরে প্রয়াণ।

দিলীপকুমার রায়ের বংশলতিকা

পুনর্মুদ্রণ

পত্র-প্রবন্ধ

ওঁ

১১ আশ্বিন ১৩৭৩

হরিকৃষ্ণ মন্দির
পুণা-১৬

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

পরম প্রীতি শ্রদ্ধাভাজনেষু

আপনার ২৮-এ ভাদ্র-র চিঠিটি পড়ে উৎফুল্ল হ'লেও মনের খট্‌কা সম্পূর্ণ ঘোচেনি : আমি কি আগে আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম, না এখন নতুন ক'রে ভুল বুঝছি? আপনার সঙ্গে আজ ত্রিশবৎসর ব্যাপী পত্রালাপে কই কোনো পত্রেই তো আপনি লঘুগুরু ছন্দের সপক্ষে একটি কথাও বলেছিলেন বলে মনে পড়ছেনা? আপনার সে পত্রগুলি হারিয়ে না গেলে হয়তো দপ্তর খুঁজে প্রমাণ দাখিল করতে পারতাম আমার এ ধারণার স্বপক্ষে যে, আপনি এ যাবৎ লঘুগুরু ছন্দকে নেকনজরে দেখতে পারেননি—যে কারণেই হোক। তবে যখন আমার সংশয়ের সপক্ষে ওকালতি করবার সে-নজিরগুলি হাতের কাছে নেই, তখন আপনাকেই benefit of doubt দিতে হবে, মন খুঁত খুঁত করা সত্ত্বেও। বলতে হবে যে, যদি আপনাকে এ-যাত্রা আমি ঠিক বুঝে থাকি, তাহলে আপনাকে 'লঘুগুরু ছন্দের বেদরদী ক্রিটিক' অভিধা দিয়ে (আপনার ভাষায়) 'আসামী' দাঁড় করিয়ে তর্জনগর্জন করাটা অনুচিত হবে। মনে পড়ছে কিন্তু (স্বভাব সন্দিহানের ত্রুটি ক্ষমনীয়) সেদিনও নীলরতন আমাকে বলেছিল যে আমার একটি সদ্যোজাত লঘুগুরু ছন্দের বাঁধা গান প'ড়ে আপনি বলেছিলেন বেশ একটু শুষ্কভাবেই যে, আপনার মত পরিবর্তন করার কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। নীলরতনের মুখে আপনার এ-শুষ্ক মন্তব্য শুনে আমার মনে হয়েছিল যে আমার (লঘুগুরু) সপ্তমাত্রিক গানটিকেও আপনি ছন্দের দিক দিয়ে অচল মনে করেছিলেন।

এলো গগনগঙ্গা খরতরঙ্গা ছন্দসুন্দর গানে
মাগো, মূর্ছনে তব উছলিয়া নব রাগমালা তানে।

মরুক গে। দূরে থেকে পত্রালাপে যে অনেক সময় ভুল ধারণা জমে ওঠে এ সত্য আমার আগোচর নেই। তাই আমি আপনার এ-পত্রটি মূল্যবান বলে গণ্য করব। আপনার সুচিন্তিত মতামতের অন্তিম (final) সুচিহ্নিত রায় বলে। যথা যখন আপনি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের

নীলসিন্ধুজল-ধৌত চরণতল
অনিলবিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল

শিল্পী : নিশিকান্ত

১৩৪১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত দিলীপকুমারের
'আপদ' বইয়ের প্রচ্ছদ চিত্র।

ইত্যাদি রচনায় যে উদাত্ত গাম্ভীর্য ধ্বনিত হয়েছে অন্য কোনো ছন্দে কি সে গাম্ভীর্যের একাংশও আনা যেত? বা দ্বিজেন্দ্রলালের 'পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে' স্তব গানটির দুটি পংক্তি উদ্ধৃত করে সোচ্ছ্বাসেই লিখেছেন : —এ থেকে বোঝা যাচ্ছে জয়দেব আজও বেঁচেই আছেন। তিনি চিরজীবী হোন। আমি তার জয়ধ্বনি করি।

ব্যাসদেব মহাভারতে এজাহার দিয়েছেন যে, অর্জুনের গাণ্ডীবের প্রসাদে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনেও গঙ্গা উচ্ছলিত হয়েছিলেন ভীষ্মদেবের তৃষ্ণা মেটাতে। মাদৃশ অকিঞ্চন গাণ্ডীবের মহাবর না পাওয়া সত্ত্বেও আমার হাহাকারী তীরন্দাজিতে যে আপনার ছান্দসিক মর্মকোষ থেকে এমন প্রচ্ছন্ন 'লঘুগুরু' প্রশস্তির গঙ্গাবারি উৎসারিত হ'ল এ অভিজ্ঞতাটি আমার ধূসর বার্ধক্যে একটি রঙিন সম্পদ হ'য়েই বিরাজ করবে স্মৃতির মণিকোঠায়। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস—বাংলা লঘুগুরু ছন্দ সম্বন্ধে আপনার এ-আনন্দোচ্ছ্বাস অপ্রকাশই থেকে যেত—অন্তঃসলিলা গঙ্গাধারার মতন—যদি হঠাৎ আমার প্রতি সদয় হ'য়ে আপনি বাংলা ছন্দরসিকদের এ-প্রশস্তিপ্রসাদ না বিতরণ করতেন। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরে আমি ছন্দ সম্বন্ধে আপনার প্রশস্তির সবচেয়ে বেশী দাম দিয়ে থাকি একথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। তাই আসুন হাত মেলানো যাক। কারণ এ পত্রে আপনি যা লিখেছেন তাতে আস্বস্ত হওয়া চলে। কেবল আপনার একটি নামকরণে আমার আপত্তি আছে। আপত্তি জানানোর সূত্রে অনেক কিছু বলার সুযোগ পাব— বিশেষ করে পত্রালাপে যেসব কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে, তাই বলি।

প্রথম কথা, আমার মনে হয় যে, বাংলা লঘুগুরু ছন্দের আদি-প্রেরণা এসেছে মুখ্যতঃ সংস্কৃত কাব্যের সনাতন অক্ষরবৃত্ত ছন্দ থেকে ও গৌণতঃ জাতি (ওরফে মাত্রাবৃত্ত) ছন্দ থেকে। জয়দেবের গীতগোবিন্দে নানা নব ছন্দোবন্ধ থাকলেও নব ছন্দরীতির প্রবর্তন করেছেন তিনি কেবল পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্তে। ছন্দের আর কোনো নন্দনে, তিনি নব ছন্দের পথিকৃত হননি— তিনের ছন্দে একটিও গান বাঁধেননি, সপ্তমাত্রিক ছন্দের মাত্র একটি কবিতা রচনা করেছিলেন : 'মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূনিচয়েন...'

কিন্তু ত্রিমাত্রিক তথা সপ্তমাত্রিক লঘুগুরু ছন্দে বৈষ্ণব কবিরা ও রবীন্দ্রনাথ তো গান বেঁধেছেনই, আমরাও (দিলীপ-নিশিকান্ত এণ্ড কোং) নানা গান বেঁধেছি এবং বাঁধবার সময় এ-ছন্দে প্রেরণা পেয়েছি কুলীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দ থেকেই। তাই একথা বললে হয়তো ভুল বলা হবে না যে, বাঙালী কবিরা এ যাবৎ লঘুগুরু ছন্দের প্রেরণা আহরণ ক'রে এসেছেন সংস্কৃত মুক্তদল গুরু স্বরের কল্লোলের কাছে হাত পেতেই—জয়দেবের ছন্দে বিমুগ্ধ হওয়ার দরুণ নয়। একথা আমার আরো মনে হয় এই জন্যে (একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি বাহুল্য ভয়ে) যে, আমি খাস সংস্কৃতেও গান বেঁধেছি জয়দেবের সপ্তমাত্রিক ছন্দের টানে নয়, মন্দাক্রান্তার দ্বিতীয় তৃতীয় পর্বের মনোহারিত্বে আকৃষ্ট হ'য়ে। আমার গানটি গুরুবন্দনা—'মধুমুরলী'র প্রথম গান :

প্রেমরচিতা তনুর্যস্য প্রেমরচিতং মানসম্
প্রেম রচিতং চিত্তমমলং ক্ষরতি নিত্য সুধারসম্......ইত্যাদি
কিম্বা বাংলায় ধরুন গঙ্গাস্তব যার প্রথম দুচরণ উদ্ধৃত করেছি, অতঃপর :
যা) ধূলিধূসর মলিনতা হর' অমল তব বরদানে

এসো) পতিত পাবনি! ললিত লাবণি : মধুরিমা অভিযানে
কিম্বা জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণ-আবাহন :
এস সুন্দর বন্ধু, বাঁশরি তানে
ক্লান্ত অন্তর শিহরি নন্দন গানে।
জানিনা কিছু আমি
ভজন সাধন স্বামী :
প্রার্থি শুধু—তুমি এস হে ভব
প্রীতি পরশে কুসুমি' নিতি নব গীতি কঙ্কর-প্রাণে।
নিঝরি' করুণা অমরতা-বরদানে।।
বিধুর তিমিরে মধুর জনম বিহানে
এসে অচিরে কান্ত হে, বরদানে
এস প্রেমল, জ্বালো
নৃত্য, কোমল আলো।
বরষি' ভুবনে রাগমালা
পুণ্য কিরণে করি' উজালা শূন্য হৃদি তব টানে
এস উন্মুখ কর' সখা তব পানে।

শুধু আমি (বা নিশিকান্ত) নই, দ্বিজেন্দ্রলালও নানা লঘুগুরু ছন্দে গান বাঁধার সময়েও জয়দেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করেননি—সংস্কৃত গুরুস্বর তিনি প্রবর্তন করেছিলেন কৈশোরেই ত্রিমাত্রিক ছন্দে : নীলগগন চন্দ্রকিরণ তারকগণ রে!

হের নয়ন হর্ষ মগন চারু ভুবন রে! ....ইত্যাদি (আর্যগাথা ১ম ভাগ)

কিম্বা তাঁর অনবদ্য যাম্মাত্রিক লঘুগুরু :

নিখিল জগত সুন্দর সব পুলকিত তব দরশে
অলস হৃদয় শিহরে তব কোমল কর পরশে
বা
একি মধুর ছন্দ মধুর গন্ধ পবন মন্দ মন্থর
কভু কোকিল মৃদু গীতে
উঠে জাগি শব্দ বিনিস্তব্ধ স্বপ্নময় নিশীথে.....ইত্যাদি

নিশিকান্তের লঘুগুরু ছন্দে রচিত (ত্রিমাত্রিক)

আনো শুভ আলো	আনো তব ধারা
হে প্রোজ্জ্বল আশা	মম দুর্দম প্রাণে
তব মণ্ডন ঢালো	জ্বালো তব তারা
তব দীপন ভাষা।	মম ঝঙ্কৃত তানে
মম জীবন বীণা	গহন অন্ধকারে
কর তব করলীনা	উজ্জ্বল অভিসারে
বহ্নি-মধুর ধারে	মম চেতন রাখো
সিক্ত কর পিপাসা	সব তামস নাশা

(এ-গানটির ছন্দ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য হয়তো কচায়ন না শোনাতেও পারে—তাছাড়া

ছন্দবিতর্ক কিছুটা টেকনিকাল কচকচি হবেই) কথাটা এই যে, এ ছন্দটিকে ষান্মাত্রিক ছন্দ বলা চললেও আমি এটি সুরফাঁকতালের ছন্দ-প্রেরণায়ই বেঁধেছিলাম—জয়দেবের নয়। সুরফাঁকতালের ভঙ্গি জানেন নিশ্চয়ই— চার + দুই + চার এর কদম, অর্থাৎ দশমাত্রিক অথচ দুইয়ের চাল। আমার গানটি ছিল :

ঢালো মধু ঢালো　　　　বাসিব বঁধু ভালো
সুর-নূপুর আলো　　　　অমৃত অভয় ঢালো
যাচিব চিরচুম্বন　　　　... ইত্যাদি

[গীতশ্রী ৫৪ পৃ. দ্রষ্টব্য]

প্রতিভাময়ী কবি জোতির্মালা আমার কাছে ছন্দ শিখতেন। তিনি লঘুগুরু ছন্দ সত্যি ভালবেসে এ ছন্দে বেঁধেছিলেন,

এনো বঁধু রাতে　　　　তারি অমিয় তালে
নীল উজলি এনো　　　　ছন্দিত অযুত তারা
গন্ধ গীত সাথে　　　　ঝলি' হীরক ঢালে
তিমির বিদলি' এনো　　　　নত, আপন হারা

অনিলবরণ সাহানা দেবী ও নীরদবরণও আমার লঘুগুরু ছন্দে বাঁধা গানের প্রেরণায় এ-ছন্দে কয়েকটি সুন্দর গান বাঁধেন। আমার 'গীতশ্রী' গ্রন্থে পাবেন গানগুলি। গীতশ্রীতে আমারই অনুরোধে আরও একটি চমৎকার সুদীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন প্রতিভাধর কবি নিশিকান্ত, জয়দেবের লঘুগুরু ছন্দের অনুভাবে: নাম 'রাজহংস'। তার মাত্র প্রথম স্তবকটি উদ্ধৃত করি : (জয়দেবের মূল গান : দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন মুনিমানস চরণ হংস)

হে সিতচন্দনগঞ্জিত তনুরঞ্জিত, সঞ্চিত তুষার-স্বর্ণ!
তব পরশন বিধু লাবণি দিল প্লাবনি অমরাবতীর স্বর্গ।
তব মুখচুম্বন লাগে
মম উৎপলবন জাগে
লভি নন্দন মধুভাষা
এ-ভূতল সরসীজল করি শীতল সুন্দর! কী তব আশা?

এ কবিতাটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ আমাকে লিখেছিলেন (জুলাই ১৯৩৬ তীর্থংকর ২০১ পৃ) 'এ পরিণত লেখনীর রচনা—ছন্দের তরঙ্গভঙ্গের উপর দিয়ে ভাবে ভরা ভাষা পাল তুলে চলেছে নিরাপদে। প্রথম থেকেই নিশিকান্তের প্রতিভার যে-পরিচয় পেয়েছি নিশ্চয় জানতুম তার সম্বন্ধে প্রত্যাশা পূর্ণ হবে—আজ আনন্দ লাভ করলুম।'

দ্রষ্টব্য— নিশিকান্ত জয়দেবের মূলগানটির ছন্দোবন্ধের অবিকল নকল করেননি। তবু এটি জয়দেবীয় প্রভাবেই রচিত মানতে বাধা নেই। কিন্তু তবু দেখবেন যে সংস্কৃত চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে কোনো পর্বে 'মধ্যগুরুগণ' লঘু-গুরু-লঘু পর্ব (v–v) শুদ্ধ বলে গণ্য হয় না, কিন্তু আমরা বাংলায় তা মানতে বাধ্য নই। তাই আমি নিশিকান্তের মধ্যগুরুগণ তুষার বা বতীর গ্রন্থনের সমর্থন করি। রবীন্দ্রনাথও এতে দোষ দেখতেন না (যদিও নীলরতন এতে আপত্তি করেছেন)—কেন জানিনা—আমরা সংস্কৃত ছন্দ থেকে প্রেরণা পেতে পারি ব'লে যে সে-ছন্দের মাছিমারা নকল করতে বাধ্য একি একটা কথা হল? আমার সংস্কৃত গানেও আমি এই গ্রন্থন বরণ করেছি অকুতোভয়েই, যথা (সুরবিহার ১ম ভাগ ৮৭ পৃঃ)

অমরবামাসীনা ভবাম মুঞ্চং স্বার্থং মুক্তা
জপাম যুগর্ষি মন্ত্রবরণ ভয়মিহ চিরতরণং বুদ্ধা

এখানে ভবাম, জপাম তথা যুগর্ষি-তে (v–v) গ্রন্থনে আমি মধ্যগুরুগণকে অকুণ্ঠেই বরণ করেছি—গাইতেও বাধেনা—যদি আপনাকে শোনাতে পারতাম তাহলে ছন্দের দিক দিয়ে অন্ততঃ আপনাকে তুষ্ট করতে পারতাম একথা জোর করেই বলতে পারি।

এত কথা বলছি শুধু এই নিবেদনটি পেশ করতে যে, স্রষ্টা কবিরা অনুকরণ করেন না অতীতের প্রভাব মেনেও। তাই আমার নানা লঘুগুরু ছন্দে মোটেই জয়দেবের অনুকরণ করিনি। আপনি হয়তো বলবেন : 'কিন্তু প্রভাব?' উত্তরে আমি বলব করজোড়ে যে আমরা সর্বত্র জয়দেবের প্রভাবও মেনে নিইনি, যথা সুরফাঁকতাল ছন্দের গান গুলিতে বা (v–v) পর্বগ্রন্থনে বা নানা নব ছন্দোবন্ধে। উদাহরণতঃ নিশিকান্তের (আমার নিজের রচনার বেশি উদ্ধৃতি দেওয়া অশোভন হবে ব'লেই নিশিকান্তকে সামনে ধরছি—গীতশ্রী ১০৩ পৃষ্ঠা)

জলধর আসিল ঐ.....	তড়িৎ বিকশিত ঐ
দিগন্ত ভাসিল ঐ.....	ঘনবরষণ প্লাবনে
অম্বর বাজিল ঐ.....	ময়ূর নাচিল ঐ
হৃদয় বিরাজিল ঐ.....	ভয় দুরু দুরু কাঁপনে
শ্যামল রঞ্জিল ঐ.....	ঝিল্লী ঝংকৃল ঐ...
রাত্রি অতন্দ্রিল ঐ.....	বিরহী-চিত ভাবনে...
লগ্ন বিভাতিল ঐ.....	মন্মথ মাতিল ঐ
চাতক সাধিল ঐ.....	আগত নব শ্রাবণে

এখানে চার এর কদমের সঙ্গে তিনের কদম মিশিয়েছেন নিশিকান্ত—(মডেল দিয়েছিলাম আমিই)—ঘন বরষণ.....ভয়দুরুদুরু.... বিরহী চিত.... আগত নব এ-পদগুলির ত্রিমাত্রিক কদম। এ-ছন্দেও জয়দেবের ছন্দ কেনো প্রেরণা দেয়নি।

দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত লঘুগুরু

ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয়গাথা
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা .

লঘুগুরু পজ্ঝটিকায় বাঁধা গানটির প্রেরণাও তিনি জয়দেবের কাছ থেকে পাননি।

আনো আনো অনল প্রাণে—আনো চিত্তে জ্যোতির্বাণী :
মর্ত্যে কর উদ্দীপিত আজি—হে প্রলয়ঙ্কর, হে রুদ্রানী।

[গীতশ্রী, ২০৪ পৃ: দ্রষ্টব্য]

বলতে কি (ভয়ে ভয়েই বলছি এবার) দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের মতন জয়দেবের ভক্ত ছিলেন না। আমার 'মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল' ভাষণে আমি বলেছি দ্বিজেন্দ্রলাল ভালবাসতেন বেশি যাকে আমাদের আলঙ্কারিকেরা বলেন 'ভাবধ্বনি'—কিনা ওজস্—austerity, সমুদ্রকল্লোল। 'রসধ্বনি' অর্থাৎ অতিলালিত্য কলধ্বনি তাঁর মন তেমন টানত না। এখানে আমি তার ওকালতি করতে চাইছি না, চাইছি শুধু এই কথাটি পেশ করতে যে, তাঁর লঘুগুরু ছন্দের গতিভঙ্গি বা ভাবধ্বনি কিছুই তিনি জয়দেবের কাছ থেকে ধার করেননি।

রবীন্দ্রনাথেরও ত্রিমাত্রিক লঘুগুরু 'দেশ দেশ নন্দিত করি' বা সপ্তমাত্রিক 'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন'' বা ষাণ্মাত্রিক

মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে
জগতে তব কি মহোৎসব বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ, ভূমাস্পদ নির্ভয় শরণে

বা ষাণ্মাত্রিক লঘুগুরু

পূর্বগগন ভাগে
দীপ্ত হইল সুপ্রভাত তরুণারুণ রাগে.....
অমৃত পুণ্যভাগী কে জাগে কে জাগে

জাতীয় নানা গানের রসধ্বনি বা ভাবধ্বনির প্রেরণাও তিনি জয়দেবের কাছ থেকে পাননি, নিজের প্রতিভার উদ্ভাবনী যাদুশক্তির কাছ থেকেই পেয়েছিলেন।

আমাকে ভুল বুঝবেন না, বাংলা ছন্দে জয়দেবের প্রভাবকে স্বীকার করতে আমি কুণ্ঠিত নই। বিশেষ করে পঞ্চমাত্রিক ছন্দে জয়দেবের প্রবর্তনাই আমাদের আরও নানা বিচিত্র পঞ্চমাত্রিক ছন্দোবন্ধের প্রেরণা দিয়েছে। যথা নিশিকান্তের অনবদ্য—

তব প্রণয়পুলক ধরি' শিরে লভি প্রাণ ভরি'
লভিনু পথ সফল অভিযানে।
রূপ তব মন হরিল দূর শশি অবতরিল
ধূলিমলমলিন তব দানে।

জয়দেবের ভাবপ্রেরণা বহিঃসৌন্দর্যমুগ্ধ দেহতৃষ্ণামূল (দন্ত পর্যন্ত) জাহির ক'রে

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিতবিকারম্।

নিশিকান্তের প্রেমকীর্তন উচ্চতর ভাবের ভাবুক

বহুজনম আবরিত চেতন অজাগরিত
জাগিল বিভাসিত বিতানে
মুকুলসম মঞ্জরিল মলয়সব সঞ্চরিল
ভ্রমরসম গুঞ্জরিল গানে (গীতশ্রী ১২৩ পৃঃ)

এ-পুরো গানটি গীতশ্রীতে পাবেন। কিন্তু এ গানটিও তো আপনাকে গেয়ে শোনাতে পারলাম না। যদি পুণায় আসতেন তাহ'লে হয়তো এ অধীনকে 'জীবন্মৃত' গণ্য করে লিখতেন না ললাটে করাঘাত ক'রে : 'কিন্তু হায় আমাদের দেশে এখন সুরসাধক কবিরা গেলেন কোথায়? ...রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-প্রমুখ কবিদের কণ্ঠ নীরব হওয়ার পরে আর তো কোনো কবির কণ্ঠই সুরে বিলম্বিত হয়না।'

আমার বিপদ হয়েছে কি জানেন? কুলীন সমাজে কেউ নিজের দৃষ্টান্ত যথেচ্ছ পেশ করতে পারে না, আত্মকথন অশোভন বলে। কিন্তু আইনে মানে যে প্রাণরক্ষার্থে আততায়ীকে প্রত্যাঘাত করলেও দোষ হয় না। তাই আপনি আমাকে জীবদ্দশায়ই হত্যা করতে উদ্যত দেখে ভীত হ'য়ে সঘনে প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি : 'এখনো আমি গান গেয়ে থাকি এবং অন্ততঃ গায়ক হিসেবে আমাকে—' কিন্তু না, আর রটানো চলবে না

এ পাপ মুখে যে আমি গায়ক তথা কবি তথা সুরকার। কেবল বলি—যদি একবার আপনাকে হাতের কাছে পেতাম তাহ'লে হয়ত লঘুগুরু ছন্দে আমাদের বাঁধা নানা গান তারস্বরে গেয়ে আপনার মন ভিজোতে পারতাম যার ফলে আপনার হয়ত মনে হ'তেও পারত যে, আমাকে জীবন্মৃত মনে ক'রে একটু চুক হয়েছে আপনার। বিশ্বাস না হয় তো নীলরতনকে শুধাবেন সেদিনও দিল্লীতে প্রায় আড়াই ঘন্টা ভাষণের সঙ্গে গানের জুড়িগাড়ি চালিয়েছিলাম কিনা যাকে দেখে শুনে তার মনে হয়নি যে এ-গরুর গাড়ির 'বেসুরে বিলম্বিত আর্তনাদ' আর অতি সলজ্জে বলছি—দুবৎসর আগে কলকাতায় 'মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল' ভাষণে শেষদিন দুঘন্টা কুড়ি মিনিট বক্তৃতা করার সঙ্গে অন্ততঃ ডজনখানেক গান গেয়েছিলাম যার মধ্যে একটি লঘু গুরু ছন্দে বাঁধা শিবস্তোত্র (জর্মন সুরে গীত) শুনে হাজার বারোশো ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক অধ্যাপিকা এমন মুখের ভাব দেখিয়েছিলেন যাতে অনেকেরই মনে হয়েছিল যে, আমার কণ্ঠ ঠিক 'বেসুরে বিলসিত' হয় নি।

কিন্তু আত্মশ্লাঘা (self preservation-এর জন্যে হলেও) আর সইবেনা— শুধু ধর্মভ্রষ্ট না যোগভ্রষ্ট হ'য়ে ফের জন্মাতে হবে 'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে' কে জানে হয়ত আপনারই প্রদৌহিত্রদের বা প্রপৌত্রদের গেহে। তখন হয়ত আপনিও ফের ঐ একই কুলে জন্মিয়ে আমার সব সুলক্ষণকেই অলক্ষণ ব'লে প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগবেন— এ জন্মের বিতণ্ডার জের টানতে বা শোধ তুলতে।

ঠাট্টা রেখে ফের গম্ভীর হই শুনুন। বলেছি—জয়দেবের প্রভাব মানতে আমার বাধেনা। বলতে কি, প্রতি ঋণই আমি সানন্দে স্বীকার করি। আপনার কাছে ঋণও কি স্বীকার করিনি মুক্ত কণ্ঠে? (যার জন্যে একদা রবীন্দ্রনাথেরও বিরাগভাজন হয়েছিলাম) তিনি আপনাকে ও আমাকে উদ্দেশ ক'রে নালিশ করেছিলেন (তীর্থঙ্কর ১৯৪ পৃঃ) :

'ছান্দসিকের সাক্ষ্যসাবুদ নিয়ে রায় দেবার কাজ অন্ততঃ আমার নয়। আজ প্রায় ষাট বছর ধরে ময়রার কাজ করে এসেছি, শেষ বয়সে সন্দেশের তার যাচাই করবার জন্যে ল্যাবরেটরির দোহাই পাড়তে যাব না, যে-রসায়নে সন্দেশের বিচার হয় সে আমার মনের মধ্যেই থাক, কলেজের ক্লাসের কাঠগড়ায় তার সন্ধানে যাবনা।'

এতক্ষণে হয়তো আন্দাজ করতে পেরেছেন যে, আমার নালিশ এই যে, সংস্কৃত ছন্দের প্রেরণায় যে সব কবিতার ছন্দ আমাদের আধুনিক মনে গুঞ্জন তুলেছে তার মধ্যে যদি জয়দেবীয় সুর খুঁজে না পাই তা'হলেও কেমন করে মেনে নেব যে এসবই তাঁর কাছে ধার-করা ছন্দ বা যেখানেই এ-ছন্দ রসোত্তীর্ণ হয়েছে সেখানেই বলব আপনার সুরে: 'জয়দেব আজো বেঁচে আছেন, জয় জয় জয়।'

জয়দেবের ছন্দের দুটি দিক আছে। একটি তার ভাবলালিত্য অন্যটি ছন্দমাধুর্য। কিন্তু তাঁর ছন্দে ভাবধ্বনি আদৌ নেই, কেবলই রসধ্বনি। পিতৃদেব তাই জয়দেবের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ভালবাসতেন ব্যাস, ভবভূতি, শেক্সপীয়র, মিলটন, ওয়ার্ডসওয়র্থ, শেলি, মধুসূদন বর্গীয় ভাবধ্বনি-সমৃদ্ধ কবির ওজস্বী কবিতা। তাঁর নিজের কাব্যে রসধ্বনিও আছে বটে, কিন্তু তার কবিশক্তির সর্বোত্তম বিকাশ ভাবধ্বনিতেই বলব— রসধ্বনিতে নয়। একথা আমি বলেছি আমার 'মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল' ভাষণে। আমি কবিতার রুচির দিক দিয়ে পিতৃবৎসল পুত্র, তাই রবীন্দ্রনাথের জয়দেবীয় উচ্ছ্বাসে সাড়া দিতে পারিনি কোনোদিনই। জয়দেব আমার কানকে খুশী করলেও মন টানেননি কোনদিনই। তাঁর

'প্রলয়পয়োধি জলে' স্তবটি ছাড়া আর কোনো গান গাইতেই আমি তেমন প্রেরণা পাইনা যেমন পাই শঙ্করাচার্য বা গীতার স্তোত্র গাইতে। তাই জন্যেই বলি : দোহাই আপনার, আমাদের সবাইকেও জোর ক'রে জয়দেবীয় ছন্দের গোয়ালে ঢুকিয়ে মাথা ঘুড়িয়ে দেবেন না। আমরা চাই নিজের পথেই চলতে—যতটা পারি ছন্দে সুরে কাব্যে স্রষ্টা হয়ে—জয়দেবের ছন্দের কাছে ধর্ণা দিয়ে 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' এ-নীতি মানতে অন্ততঃ আমার মন নারাজ।

আপনি হয়তো বলবেন এ নাম নিয়ে তর্ক। কিন্তু আমি তা মানব না। যে ছন্দের উদ্ভব তথা বিকাশের ইতিহাস প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে আছে তার প্রেরণার জন্যে জয়দেবের অতিললিত ছন্দের কাছে হাত পাতব কেন? জয়দেবের অষ্টপদী

ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন—কোমল মলয়সমীরে
মধুকর-নিকর-করম্বিত কোকিলকূজিত কুঞ্জকুটিরে

আর দ্বিজেন্দ্রলালের চতুর্মাত্রিক লঘুগুরু—

নারদকীর্ত্তনপুলকিত মাধব বিগলিত করুণা ক্ষরিয়া
ব্রহ্মকমণ্ডলু উচ্ছলি ধূর্জটি জটিল জটা পর ঝরিয়া
অম্বর হইতে সম শতধারা জ্যোতিপ্রপাত তিমিরে
নামি ধরায় হিমাচলমূলে মিশিলে সাগর সঙ্গে

এ-দুই ছন্দের আন্তর সুর ও ভাবধ্বনি কি এক? না, বাইরের কাঠামো সদৃশ হ'লেই কি মধ্যকার ছবিরও একাত্মতা প্রমাণ হয়? আমার নিজের লঘুগুরু ছন্দে রচিত কবিতা উদ্ধৃত করতে বাধে, কিন্তু বলবেন কি আমার সূর্যস্তবটির গাম্ভীর্যও জয়দেবের কাছ থেকে ধার করা (মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল ৯৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)?

বন্ধন নাশো মন্ত্রবরে
নিত্য নিরঞ্জন জ্যোতিশরে
শান্ত শুভঙ্কর এস চিতে
কৃষ্ণ দিগন্তর উজ্জ্বলিতে
আকুল হৃদি তব দান তরে।

একলাই বা হায় হায় করবেন কেন? আমিও যে সে হায় হায়-এর দোয়ার দিতে পারি এই ব'লে যে আপনি একবারও আমার গান শোনেননি—(এ দুঃখ আমি রাখি কোথায়?) —কিন্তু যদি শুনতেন তাহ'লে হয়ত বুঝতেন গানের কথায় বা সুরে ওজস বলতে দ্বিজেন্দ্রলাল কি মনে করতেন—সঙ্গীতে যাঁর উত্তরসাধক ব'লেই আমি নিজেকে মনে করে এসেছি আশৈশব। এই ওজস রবীন্দ্রনাথেরও নানা অনুপম কবিতায় আছে—আর আছে তাঁর নানা লঘুগুরু ছন্দের গানে। কিন্তু জয়দেবে শুধুই অতিলালিত্য রসধ্বনি— euphony, melody র প্রাচুর্য। ভাবধ্বনি বা মেঘমন্দ্র কোথায়? মানি, এ-ভাবধ্বনি জয়দেবের স্বধর্ম নয় ব'লে তাঁর কাছে ভবভূতি কালিদাস বা ব্যাসের ধ্বনিকল্লোল চাওয়াই ভুল। কিন্তু আমাদের মাথাব্যথা তো জয়দেবকে নিয়ে নয়—বাংলা কাব্যের সমৃদ্ধি বিকাশ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের ষান্মাত্রিক লঘুগুরু—

প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে
জাগ্রত ভগবান্ হে জাগ্রত ভগবান্....

বা

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ
নূতন তব জন্ম লাগি' কাতর যত প্রাণী
কর' ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃত বাণী.....

কিম্বা দ্বিজেন্দ্রলালের চতুর্মাত্রিক লঘুগুরু—

আনন্দময়ী বসুন্ধরা
চির-অভিরামা তরুণী শ্যামা সুহাসিনী পিককলস্বরা....
তরুণ উষায় অরুণ মৃদুরক্তিম তরুণী প্রণয়স্মিতাধরা
ভানুনিলীন নয়ননলিনী কি প্রেমবিমুগ্ধ কি ভক্তিভরা!

বা

সাজ সাজ সকলে রণসাজে—শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে
চল সমরে দিব জীবন ঢালি'—জয় মা ভারত! জয় মা কালী!

এ-ভাবধ্বনির সঙ্গে জয়দেবের অতিললিত অনুপ্রাস বহুল ছন্দের তুলনা হয়কি?

গোপকদম্বনিতম্ববতীমুখচুম্বন লম্ভিতলোভং
বন্ধুজীব মধুরাধরপল্লব মুল্লসিতস্মিত শোভম্।...
জলদ পটল বলদিন্দুবিনন্দক-চন্দনতিলকললাটং
পীনপয়োধর পরিসর মর্দন- নির্দয় হৃদয়কবাটম্।

এর সস্তা শ্রুতিমাধুর্য বা আদিরস প্রথমেই জনগণমনকে আবিষ্ট করে না এমন কথা বলব না—সব সস্তা জিনিষেরই নগদবিদায় বেশি সহজে মেলে কে না জানে? কিন্তু ছন্দের বহির্লালিত্যকে পাশ কাটিয়ে যাঁরাই তার অন্তরে পৌঁছেছেন তাঁরাই জানেন গভীর রসস্পন্দ কী বস্তু। জয়দেবে এই গভীর কল্লোল বাজেনি যেমন বেজেছে ধরুন কালিদাসে বা (আরো) ভরভূতিতে শঙ্করাচার্যে। বেদব্যাসে।

জয়দেব অবশ্য বাংলা কবিদের কানকে মুগ্ধ করেছিলেন প্রথম দিকে। আমি ভবাদৃশ ঐতিহাসিক নই। তাই বলতে পারবনা কাকে তিনি কতখানি প্রেরণা দিয়েছিলেন।- বিশেষ ক'রেই রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে বলা কঠিন কে কার কাছ থেকে কী পেয়েছে ও কতটা তার পরে খাটিয়ে লাভ করেছে। কিন্তু একথা বলতে পারি খানিকটা ভরসা ক'রেই যে বৈষ্ণব কবিরা তাঁদের নানা পদাবলীর নানা চরণে গুরু স্বরের বিন্যাসের মূল প্রেরণা পেয়েছিলেন মুখ্যতঃ সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত এবং গৌণতঃ জাতি বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ থেকে। চতুর্মাত্রিক ছন্দের—সম্ভবতঃ তোটক, মদিরা, পজ্ঝটিকা বর্গীয় ছন্দ থেকে। পঞ্চমাত্রিক—এইখানেই মনে হয় জয়দেবের বিশিষ্টতম দান — যদিও এ ছন্দের প্রেরণারও কিছুটা এসে থাকতে পারে ভুজঙ্গপ্রয়াতের পঞ্চমাত্রিক থেকে। তবে মনে হয় ভুজঙ্গপ্রয়াতের চলন একটু বেশী কড়া—বার বার লঘু-গুরু-গুরু এ-গ্রন্থনে বাংলা লঘুগুরু ছন্দ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারত না।

কিন্তু সপ্তমাত্রিক ছন্দে আমরা প্রেরণা পেয়ে থাকব সম্ভবতঃ গৌণতঃ অক্ষরবৃত্ত গীতিকা ছন্দ থেকে - (যার কথা পরে বলছি) এবং মুখ্যতঃ মন্দাক্রান্তার দ্বিতীয় তৃতীয় পর্ব থেকে। কারণ মন্দাক্রান্তার প্রথম পর্বে চারটি গুরুস্বর (রুদ্ধদল) থাকলেও এর পরের

তিনটি পর্বই সপ্তমাত্রিক—শেষেরটি পাঁচের সঙ্গে দুমাত্রা বিরতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে ব'লে, যথা—

কশ্চিৎকান্তা। বিরহগুরুণা। স্বাধিকার। প্রমত্তঃ

মনাক্রান্তার আদর সংস্কৃতে খুবই বেশি। তাই মনে হয় বৈষ্ণব কবিরা এই ছন্দটি থেকেই তাঁদের লঘুগুরু সপ্তমাত্রিকের প্রেরণা পেয়েছিলেন। জয়দেবের একটি মাত্র সপ্তমাত্রিক কবিতা থেকে নয়।

বাংলা লঘুগরুতে বৈষ্ণব কবিরা তিন বার পাঁচ ও সাত এই চারটি প্রধান কদমেই বহু মঞ্জু পদাবলী রচনা করেছেন। সর্বত্র গুরু স্বর দুমাত্রার মর্যাদা পায়নি বটে (সুরেই সে খুঁৎ নিরাকৃত হ'ত) কিন্তু মুক্তদল গুরুস্বরের প্রসাদেই এসব চরণে এসেছে খানিকটা সংস্কৃত কল্লোল। আপনার কাছে এসব চরণের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হবে যাকে সাহেব পুরাণে বলে carrying coals to newcastle, তবু লঘুগুরু ছন্দের মনোহারিত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত অন্ততঃ দেওয়াই চাই নৈলে মান থাকবে কেন বলুন? কেবল মনে রাখবেন দয়া ক'রে যে, আমার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে এই যে, এ-সব ছন্দেরই আদিম প্রেরণা বৈষ্ণব কবিরা পেয়েছিলেন প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে এসব ছন্দেরই আভাষ (indication) তথা অনুমোদন (sanction) ছিল ব'লে। (কেবল, বলেছি—হয়ত পঞ্চমাত্রিক ছন্দের প্রেরণা জয়দেব দিয়ে থাকতে পারেন। সংস্কৃত অক্ষরবৃত্তে সপ্তমাত্রিক ছন্দের নজির মেলে গীতিকা ছন্দে :

কর-। তাল চঞ্চল। কঙ্কণস্বন- । মিশ্রণেন ম- । নোরমা

জয়দেব শুধু 'কর' এই অতিপর্বিক শব্দটি বাদ দিয়ে তাঁর একমাত্র সপ্তমাত্রিক ছন্দের প্রবর্তন করেছেন। তাই তার কিং করিষ্যতি। কিং বদিষ্যতি। সাচিরং বির। হেন মূলতঃ এই ছন্দই বটে এমনকি লঘুগুরু ধ্বনি বিন্যাসেও।)

এবার উদাহরণের পালা :

ত্রিমাত্রিক ওরফে ষন্মাত্রপর্বিব লঘুগুরু ছন্দ :

দেখ রি সখি। শ্যামচন্দ। ইন্দুবদনি। রাধিকা।...
মদনরাজ। নবসমাজ। ভ্রমত ভ্রমর। চাতুরী। (জ্ঞানদাস)
অতি শীতল। মলয়ানিল। মন্দ মন্দ। বহনা।.... (শশিশেখর)
হেরি যুগল। রসবিলাস। কমল কুমুদ। সব বিকাশ।
নন্দদাস। নিজহি আশ। পূরত কত। রঙ্গে। (নন্দদাস)

চতুর্মাত্রিক লঘুগুরু—এ ছন্দের দৃষ্টান্তও অজস্র মিলবে :

কুসুমিত। কুঞ্জে। অলিকুল। গুঞ্জে। ... রসবতি। সঙ্গে। রসময়। রঙ্গে।
দুহুঁ মুখ। চাঁদে। ধোই সু। ছাঁদে।
হাসি টাঁট হরি। ধনি করি। কোর
পীবই। অধর সু-। ধারস। ভোর..... (শশিশেখর)

অঞ্জন গঞ্জন জগজনরঞ্জন জলদপুঞ্জ জিনি বরণা
তরুণারুণ থলকমল দলারুণ মঞ্জিররঞ্জিত রচনা... (গোবিন্দদাস)

পঞ্চমাত্রিক লঘুগুরু :

চির দিবস। ভেল হরি। রহল মথু। রা পুরী। অবহুঁ সখি। বুঝহ অনু। মানে

সোই সখি। তেজল কি। কাজ ইহ। জীবনে। আন সখি। গরল করি। গ্রাস

(শশিশেখর)

গন্ধ সহ। গন্ধ বহ। মন্দগতি। ভেল

ইহ সুখদ। বিপিন-দ্রুম-। দাম দুখ। দেল (কমলাকান্ত)

সংস্কৃত অক্ষরবৃত্তে পঞ্চমাত্রিক ছন্দ মেলে ভুজঙ্গপ্রয়াতে কিন্তু তার 'য-গণ' এর অর্থাৎ লঘু-গুরু-গুরু (v--) পর্ব-পরপর বিন্যাস বজায় রেখে রসোত্তীর্ণ বাংলা কবিতা রচনা করা খুব সহজ নয়। সে কালের কবিতাবলীর মধ্যে এ-ছন্দে ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত কবিতাটিই একমাত্র উল্লেখযোগ্য কবিতা মনে হয়—

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙা ঘোর বাজে

কিন্তু সমগ্র কবিতাটিতে ছন্দ বজায় রাখতে গিয়ে শব্দচয়ন সর্বত্র সুষ্ঠু হয়নি। এ-যুগে একমাত্র কবি নিশিকান্ত এ-ছন্দে অনবদ্য শিবস্তোত্র রচনা করেছেন সর্বত্র আমাদের বাংলা হসন্ত উচ্চারণ বজায় রেখে :

প্রশান্তির দিশাতে নিজেরে দিশাবো
নিমেষে নিমেষে গভীরে মিশাবো
অপারে অনন্তে স্বরাজে স্বছন্দে
তরঙ্গেরি রঙ্গে গভীরে দুলাবো।
সনাতন সখা হে অতল্ হে অপারী!
সুগোপন হিয়াতে চিরন্তন দিশারি!
সুগোপন নিবাসী শুনালে কি বাঁশি!
বিভোলা বিমন্ত্রে নিজেরে ভুলাবো।
অচল হে অবারণ অলোকী অকালী!
অসংখ্যেরি শব্দে নিরব হে নিরালী।
সুদূরে সমীপে শশাঙ্কে প্রদীপে
সহস্রেরি রূপে অরূপে জ্বলাবো।

কিন্তু এ বিশ্বাস বজায় রেখে বেশিক্ষণ টাল সামলানো কঠিন বৈকি। তাই বৈষ্ণব কবিরা ভুজঙ্গপ্রয়াতের দিকে না ঘেঁষে মুক্তগতি পঞ্চমাত্রিকের প্রেরণা জয়দেবের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন মনে হয়। কিন্তু এবার সপ্তমাত্রিক লঘুগুরু ছন্দের কয়েকটি নমুনা দিই :

এছন্দে ভারতচন্দ্র নিখুঁত 'হরিনামাবলী' স্তোত্র রচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত অন্নদামঙ্গলে :

সপ্তমাত্রিক লঘুগুরু :

জয় কৃষ্ণকেশব রামরাঘব কংসদানব-ঘাতন
জয় পদ্মলোচন নন্দনন্দন কুঞ্জকানন রঞ্জন .... ইত্যাদি

বৈষ্ণব কবিদেরও অনেক সুন্দর গান আছে এ ছন্দে :

নন্দনন্দন চন্দচন্দন গন্ধনিন্দিত অঙ্গ...
কঞ্জলোচন কলুষমোচন শ্রবণ-রোচন হাস... (গোবিন্দদাস)
জয় নন্দনন্দন চন্দ
অঙ্গ দীপতি নিন্দি নীরদ নীল নীরজকন্দ ....

নন্দ নন্দন নীকে নাগর নবীন ঘন রসমেহ
নীল উতপল নবীন নীরদ নিন্দি নিরুপম দেহ (কমলাকান্ত)

বৈষ্ণব কবিরা এই চারটি মূল ছন্দে— তিন চার পাঁচ ও সাত মাত্রার ছন্দে—বহু মুক্তগতি লঘুগুরু পদ রচনা করেছেন। কেবল একটা কথা মনে রাখতে হবে : তাঁরা এ-গানগুলি গাইতেন, তাই সুরের দোলায় নানা গুরুস্বরকে ছোট করে একমাত্রা ধরে তালসাম্য করতেন—যেমন কীর্তন গাইবার সময় আমরা আজও করি। কিন্তু আবৃত্তি করতে গেলে তাঁদের কান এ-সব গানের অনেক পদেই ব্যাহত হবে যাঁরা গুরুস্বরকে সর্বত্রই দ্বিমাত্রিক উদাহরণ করতে যান। কিন্তু একটু অনুশীলন করলেই আর কানের কোনো খট্‌কা থাকে না। কারণ মন দুলে ওঠে যথাযথ আবৃত্তি ক'রে (গুরুস্বরকে ঠিকমতন বিকল্পে একমাত্রিক ধরে) নানা চিরস্মরণীয় চরণ :

জনম অবধি হাঁম রূপ নিহারলুঁ নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

এখানে বলাবাহুল্য লাখ, রাখ, হার, ভেল বর্গীয় গুরুস্বরের উদাত্ত কল্লোলই প্রেমোচ্ছ্বাসকে মর্মস্পর্শী করেছে।

অথবা বিদ্যাপতির অপরূপ ভক্তিবৈরাগ্য উচ্ছ্বাস :

তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম সুতমিত রমণি সমাজে
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিলু অব মঝু হব কোন কাজে
কত চতুরানন মরি মরি জাওত ন তুআ আদি অবসানা
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত সাগর লহর সমানা

এ-পদগুলি আবৃত্তি করলেও কান ও মন মুগ্ধ হয় যদি যে-গুরু স্বরগুলির মাথায় (-) চিহ্ন দিয়েছি তাদের যথাবিধি গুরু উচ্চারণ করা যায়। বস্তুতঃ এ গুরু উচ্চারণ বাদ দিলে পদগুলি ছন্দপতনের দরুণ পঙ্গু হয়ে পড়েই পড়ে। আরো এইজন্যে যে এদের প্রাণপুরুষ নিহিত ঐ গুরুস্বরের কল্লোলে। সংস্কৃতভাষাকে দেবভাষা বলা চলত কি যদি তার গুরুস্বরকেও লঘুস্বরে পাংক্তেয় ক'রে একই মর্যাদা দিতাম এক মাত্রা ধ'রে? তাই আমরা চাইছি আর কিছুই নয়—সংস্কৃত গুরুস্বরের কিছুটা রসবিলাস বাংলা গানে আমদানী করতে—যে রস স্থান পেয়ে এসেছে বহুদিন ধরে বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, চণ্ডিদাস, কবিশেখর, গোবিন্দদাস, শশিশেখর, বলরামদাস প্রমুখ বহু কবির পদাবলীতে। যেমন মাত্রাবৃত্তেরও অনুমোদন ও ইঙ্গিত ছিল প্রাক্ রবীন্দ্র কাব্যে, রবীন্দ্রনাথ শুধু তাকে নিয়মিত করেছেন প্রতি রুদ্ধদলকে 'সর্বত্র' দুইমাত্রা ধরে, তেমনি বাংলা লঘুগুরু ছন্দে বাঁধা স্তব বা গানে আমরা চাইছি গুরুস্বরকে সর্বত্র দুমাত্রা ধরতে— যেমন ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল ধরেছিলেন। কিন্তু এজন্যে জয়দেবের কাছে ঋণ স্বীকার করার কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। আমরা চাইছি ছন্দে প্রেরণাদেবীর (Muse) প্রসাদার্থী হ'য়েই রসসৃষ্টি করতে। এজন্যে নজিরকেও দাম দিতে আমরা অসম্মত নই- বস্তুতঃ নজিরই তো ট্রাডিশন—ঐতিহ্য। ঐতিহ্যকে বাদ দিলে সংস্কৃতি দাঁড়াবে কোন ভিতে? কিন্তু ঐতিহ্য—tradition—আমাদের নবসৃষ্টির প্রেরণা দিক—পুনর্ণবের মধ্যেই যে যুগে যুগে সনাতনের নবজন্ম হয় এই প্রত্যক্ষ ও আশাপ্রদ সত্যের এজাহার দিয়ে আমাদের সবল ও শক্তিমান করতে। লঘুগুরু ছন্দে এ নীতির প্রয়োগ আমরা কীভাবে করতে চাই তার কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছি। কিন্তু শুধু ব্যাখ্যায় আমরা বক্তব্যকে পুরোপুরি পরিস্ফুট করা সম্ভব নয়। গেয়ে

শোনাতে পারলে বোঝাতে পারতাম লঘুগুরু ছন্দে কী অপূর্ব ওজঃশক্তির আমদানি করা যায় গানে তথা আবৃত্তিতে। কিন্তু এ-দুঃসাধ্যসাধন করতে হ'লে সব আগে চাই লঘুগুরু ছন্দে শ্রদ্ধা। রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে লঘুগুরু ছন্দের পরে ঘোর অবিচার করেছিলেন ইঙ্গিত ক'রে যে, এ-ছন্দে হাস্যোদ্রেক করা চলে কিন্তু রসসৃষ্টি করা চলে না (তীর্থংকরে ১৯৮ পৃষ্ঠায় তাঁর পত্র দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই কথাই কি সত্যি? লঘুগুরু ছন্দে রবীন্দ্রনাথ নিজেই কি (তাঁর নানা গানে তথা ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে) সত্য রসসৃষ্টি করেননি? দ্বিজেন্দ্রলালের নানা অনবদ্য লঘুগুরু গান গেয়ে কি আমরা আনন্দ পাই না বা পরিবেশন করতে পারি না? রবীন্দ্রনাথের শ্রীমুখে একটি কথা বারবার শুনতে শুনতে আমার মনে গেঁথে গেছে। কথাটি এই যে, 'কলাকারুতে সবচেয়ে বড় কথা হ'ল "হয়ে ওঠা"— অর্থাৎ সৃষ্টির রসোত্তীর্ণ হওয়া। যে মাটিতেই হোক না কেন বীজ্ ফুলটি হ'য়ে ফুটে উঠলে আর কথা নেই, তাকে ফুলের প্রণামী দিতেই হবে।' ঘরোয়া ভাষায়, সৃষ্টি আমাদের মনে রসের আনন্দ দিলেই ব্যস্—কেল্লা ফতে, আর কথাটি নয়। ব্যাকরণ প্রেজুডিস সংস্কার থিওরি (a priori) সবাইকেই বলতে হবে—রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায়— 'মেনেছি হার মেনেছি।"

মনে পড়ে আর একটি উপমা যদিও গদ্যময় ভূমিকায়। ওয়াট্ (James Watts) যখন বাষ্পযোগে এঞ্জিন চালানো যায় ব'লে ঘোষণা করেন তখন গাণিতিকেরা বলেন ব্যঙ্গ হেসে: 'পাগল না ক্ষেপা! গণিত দিয়ে যে প্রমাণ করা যায়—এ অসম্ভব।' ওয়াট্ সাহেব আর বাক্য ব্যয় না ক'রে স্টীম এঞ্জিন উদ্ভাবন ক'রে গাড়ী চালিয়ে পাল্টা হেসে বললেন: 'দেখুন গণিতকে নামঞ্জুর ক'রেও গাড়ী কেমন চলল অকুতোভয়ে!'

লঘুগুরু ছন্দের রস আমাদের মনের ময়ূরকে আনন্দ নৃত্যের দীক্ষা দিয়ে সচল করেছে নানা বাংলা গাণিতিক থিওরিকে নামঞ্জুর ক'রে। এ-কথার একটি মহৎ প্রমাণ— আমাদের উদাত্ত ঝঙ্কারে জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন' লঘুগুরু ছন্দেই রচিত। তাই আসুন এ-ছন্দের বিরুদ্ধে অনর্থক গাণিতিক বৈয়াকরণিক আপত্তিকে গ্রাহ্য না ক'রে রসিক উচ্ছলতার এ ছন্দরমাকে অভিনন্দন করি:

মা এস চিরগুণি! ছন্দরমা! অবসন্ত ক্ষণে অরবিন্দদলে।
কর' ম্লান নিশা কলঝংকৃত প্রেমলশঙ্খরবে প্রতি মর্মতলে।
ঝর অন্তর-তামস উজ্জ্বলিয়া
সুর-নৃত্যরসে মরু মঞ্জরিয়া,
জিনি' কণ্টক এস প্রফুল্ল ফুলে মধুহাস্য সমুচ্ছলি' অশ্রুজলে।

ইতি ভবৎপ্রতিভামুগ্ধ কিন্তু হায়! ভবদত্ত
'জীবন্মৃত'- নামা ঈষৎদ্বিষণ্ন
তবু মরিয়া-না-মরে রাম
শ্রীদিলীপকুমার রায়

১১ আশ্বিন
১৩৭৩

কান্তকবি ও ভক্তিসাধক

দিলীপকুমার রায়

একশো বৎসর আগে শ্রাবণ মাসে কান্তকবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলাদেশে। সে-মাসে আরো কত মানুষই কালস্রোতে ভেসে এসেছিল কোন্ অচিন লোক থেকে—যারা কবে ভেসে উধাও হয়ে গেছে সেই একই স্রোতে!—যে ক্ষুদ্র চিহ্ন বয়ে এনেছিল কালের জোয়ার, ভাঁটায় সে-চিহ্ন মুছে গেছে, তারা ফিরে গেছে সেই অচিন লোকেই, কিম্বা হয়ত মোড় নিয়ে লুপ্ত হয়ে গেছে আর কোনো এক অজানা লোকে।

কিন্তু এক একজন মানুষ আসে তাদের কীর্তি মুছেও মোছে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন প্রায়ই তাঁর শিষ্যদের : 'ওরে এসেছিস যদি, একটা দাগ রেখে যা।' কান্ত কবি—রজনীকান্ত—এমনই একটা ধন্য দাগ রেখে গেছেন তাঁর গানে, কবিতায়, ছড়ায়, নক্সায়—সর্বোপরি তাঁর ভক্তজীবনের। এ-দাগ রেখে যেতে পারেন কেবল তাঁরাই যাঁদের স্বধর্ম ভক্তি, বা বলা যেতে পারে—যাঁদের ভগবান বরণ করে কাছে ডেকে নিয়েছেন ভক্তের টিকা ললাটে পরিয়ে।

রজনীকান্তকে তাঁর জীবদ্দশায় অনেকেই ভালোবেসেছিলেন। একই মানুষের নানা রূপ থাকতে বাধ্য—বিশেষ করে মহৎ মানুষের। মহাজন রজনীকান্তের চরিত্রেরও ছিল নানা বিভাগ : নীতিবাদী, দেশভক্ত, হাস্যরসিক, সাহিত্যিক, সামাজিক......ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় উপাধি ছিল—ভগবদ্ভক্ত। আমি বলতে চাই কেবল তাঁর 'ভক্ত'-রূপের কথা যার সঙ্গে আমার নিকট-পরিচয় হয়েছিল আমার সুদূর শৈশবেই বলব। কী ভাবে—বলি।

খুব স্পষ্ট মনে আছে—আমাদের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে তাঁর দিনের পর দিন এসে পিতৃদেবের রকমারি গল্পগাছা, হাসির গান, স্বদেশী সঙ্গীত ও ভক্তিকীর্তন শোনা এবং আমাদের তাঁর স্বরচিত নানা গান শোনানো। পিতৃদেবকে (দ্বিজেন্দ্রলাল) তিনি 'গুরুদেব' বলতেন। বিশেষ ক'রে পিতৃদেবের হাসির গান তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল হাসির গান রচনায়। আরো অনেককেই দিয়েছিল কিন্তু তাঁদের কীর্তি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে প্রতিভার অভাবে। সদানন্দ রজনীকান্তের গীতি প্রতিভা ছিল সত্য। আবাল্য তিনি গভীরভাবেই সাহিত্য ও কবিতা ভালোবেসে এসেছিলেন। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসরে তাঁর মৃত্যু হয়। আর কয়েক বৎসর বেঁচে থাকলেও তাঁর গীতিপ্রতিভা আরো উজ্জ্বল পরিণতি লাভ করত সন্দেহ নেই। সাহিত্যে কীর্তির ছাপ রেখে যেতে হ'লে কিছুটা সময় লাগে, কেননা সুদীর্ঘ সাধনা বিনা শিল্পে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। রজনীকান্ত নানা কারণে—বিশেষ করে অর্থাভাবে পড়ার দরুণ—তাঁর সহজাত শক্তিকে আবাদ করতে পারেন নি আরো নিখাদ সোনা ফলাতে। কিন্তু তবু তিনি দাগ রেখে গেছেন আমাদের সাহিত্যে অল্প বয়সেই বৈকি। এ-কৃতিত্ব সামান্য নয়। তাঁর কবিতার ভাষা ছন্দ ভঙ্গি আরো শুদ্ধ হ'য়ে

উঠতই উঠত যদি তাঁর অকালমৃত্যু না হ'ত। একথা বলছি তাঁর প্রতিভাকে ছোট করতে নয়, তাঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার 'পরে জোর দিয়ে তাঁর প্রতিভার স্বকীয়তার গুণগান করতেই। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি মাত্র তিনটি কাব্যগ্রন্থ লিখে প্রকাশ করেছিলেন : বাণী, কল্যাণী ও অমৃত। এর মধ্যে প্রথম দুটিতেই তাঁর নানামুখী স্বকীয়তার পরিচয় মেলে, প্রতিভারও স্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়—যদিও সে-প্রতিভার আরো নিখুঁত বিকাশ হতে পারত যদি তিনি আর দশ পনেরো বৎসরও সাহিত্য সাধনা করতে পারতেন ভক্তির মন্ত্রদীক্ষায়। কিন্তু না-পারা সত্ত্বেও তিনি ভক্ত সাধক তথা সাহিত্যিকদের অনেক কিছুই দিয়ে গেছেন যা মহনীয়, বরণীয়, উপভোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ কবি সত্যেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুর পরে তাঁর কীর্তি সম্বন্ধে যে-তর্পণ করেছিলেন সে-তর্পণ কান্তকবির সম্বন্ধেও অঙ্গীকার করা চলে :

তুমি বঙ্গ ভারতীর তন্ত্রী 'পরে একটি অপূর্ব
তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে। সে তন্ত্র
হয়েছে বাঁধা। আজ হ'তে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে।

মনে পড়ে কান্তকবির উদাত্ত স্তোত্র :

সেথা আমি কি গাহিব গান?
যেথা গভীর ওঙ্কারে সাম-ঝঙ্কারে কাঁপিত দূর বিমান।....
আর কি ভারতে আছে সে-যন্ত্র,
আর কি আছে সে-মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ, আর কি আছে সে-প্রাণ?

মানুষ কোনো সৃষ্টিই করতে পারে না যার সুরে তার প্রাণের তন্ত্রী উচ্ছলসুরে সাড়া না দেয়। কান্তকবির ছিল সরল, মহৎ প্রাণ। স্বভাবে ছিলেন তিনি উদার, নম্র, শ্রদ্ধাবান্, ভক্তিমান্। তাই তাঁর নানা গানের নানা চরণেই ঝংকৃত হ'য়ে উঠেছে তাঁর এই মধুর স্বভাব, অটল বিশ্বাস, উজ্জ্বল আদর্শবাদ—যেমন এই গানটির ছত্রে ছত্রে।

সুন্দরের ভক্ত ছিলেন তিনি মনে প্রাণে, তাই এমন মধুর 'গুঞ্জরণ' তাঁর গানে শুনতে পাই—এ গানটি তিনি যে কী সুন্দর গাইতেন—আজো কানে বাজে :

তব চরণনিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা
ঊর্ধ্বে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত-নভো-নীলাঞ্চলা
সৌম্য মধুর দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা।
দূরে হের চন্দ্রকিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গা
নৃত্য-পুলক-গীতিমুখর-কলুষহর-তরঙ্গা;
ধায় মত্ত হরষে সাগরপদপরশে,
কূলে কূলে করি' পরিবেশন মঙ্গলময় বরষা
ফিরে দিশি দিশি মলয় মন্দ, কুসুমগন্ধ বহিয়া,

হাসিছে দিগ্‌বালিকা কণ্ঠে বিজয়মালিকা
নবজীবন-পুষ্পবৃষ্টি করিছে পুণ্য-হরষা।

আধুনিক কবিরা এ-গানটির ছন্দপতন হয়েছে বলবেন হয়ত, কারণ তাঁরা সংস্কৃত গুরুস্বরের উদাত্ত ধ্বনি প্রায়ই যথাযথ পড়তে পারেন না। কিন্তু রজনীকান্ত যখন এ-গানটি গাইতেন তখন শ্যা, নী, দূ, হে, ন্তা, গী, ধা, সা, বে, হা, বা এবং মা টেনে দুমাত্রা ধরে সুরে এমন সুন্দর ফুটিয়ে তুলতেন যে কান মন উভয়ই মুগ্ধ হ'ত। এ-মুক্তদলগুলিকে একমাত্রা করলে সুর কিছুতেই সেভাবে ছাড়া পেতে পারত না যেভাবে এখানে পেয়েছে—তাছাড়া ছন্দপতন তো হ'তই।

এ-বৈয়াকরণিক প্রসঙ্গ তুললাম—সংস্কৃত গুরুস্বরের তিনি অনুরাগী ছিলেন বলেই তার সুপ্রয়োগ করতে পেরেছিলেন এই কথাটি পেশ করতে। তাঁর আরো নানা অনবদ্য গানেই এই দ্বিমাত্রিক গুরু-স্বরের সুপ্রয়োগ পাই। কিন্তু সে অন্য কথা।

কান্তকবি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে এসে গাইতেন তাঁর একটি অপূর্ব গান যা পরে প্রখ্যাত হ'য়ে ওঠে নানা গুণী তথা ভক্তের কণ্ঠে :

তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর মোহকালিমা ঘুচায়ে।

এ গানটি শুনে পিতৃদেব এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে আমি তাঁকে শোনাতাম প্রায়ই, আজও গাই মাঝে মাঝেই—এ যে বিশুদ্ধ সাধনার গান, অনবদ্য বিনতির আত্মনিবেদনে মহিমময়। পরের অন্তরা আভোগগুলি উপমায় আন্তরিকতায় ছবিখানি হয়ে ফুটে উঠেছে :

লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে,
আমি জানিনা কখন ডুবে যাব কোন্ অকূল গরল পাথারে!
প্রভু বিশ্ববিপদহন্তা! তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এসো মোর মত্ত বাসনা গুছায়ে।

মানুষ যখন প্রলোভনে পড়ে দোলে পতনের মুখে, তখন সে এমনি আকুল হ'য়েই ডাকে বিশ্ববিপদ-হন্তাকে—পতনের পথ রোধ করে দাঁড়াতে। আর ডাকলে তিনি সাড়াও দেন যদি ডাকার ম'ত ডাকা যায়—যেমন ডাকতেন কান্তকবি তাঁর সরল ভক্তির আকুল উচ্ছ্বাসে।

আরো আছে। বলি নি এ সাধনার গান? যখন মানুষ কোনোমতেই তার আত্মাভিমানের হাত থেকে নিষ্কৃতি না পেয়ে দেখে চোখের সামনে আলোও কালো হ'য়ে আসছে, বিশ্বাস টলমল ক'রে উঠছে—'তুমি আছ কি ভগবান্' জিজ্ঞাসায়, তখন অন্তর গহনে এক গভীর প্রত্যয় ব'লে ওঠে আমরা দেখতে চাই না ব'লেই অন্ধভাবে বরণ করি :

আছ অনলে অনিলে চিরনভোনীলে ভূধরে সলিলে গহনে,
আছ বিটপিলতায় জলদের গায় শশিতারকায় তপনে;
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া ব'সে আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া,

আমি দেখি নাই কিছু বুঝি নাই কিছু দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।

এ-গানটি শুধু আমার নয়, বহু ভক্ত তথা সাধকেরই অতি প্রিয় গান। এর মধ্যে যে রয়েছে একটি গভীর ইঙ্গিত—পরম প্রাপ্তির। যখন সংশয়ে মন আঁধার হ'য়ে এসেছে, কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা চিনতে ভুল হয়ে প্রাণ পড়েছে অকূল পাথারে, তখন সংশয়ী মানুষ ডাকবে কাকে? না, তাঁকেই যিনি সর্বত্র আছেন ও আমাদের ডাকছেন তাঁর চরণছায়ায়। কিন্তু হায়রে, আমরা যে আমাদের অবোধ অভিমানের ঠুলিতে চোখ বেঁধে আছি, তাই তো তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি না। তখন একটি মাত্র পথ আছে চোখের ঠুলি খসাবার ; আত্মাভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে চোখের জলে ঠাকুরকে ডাকা ; 'আমি দেখি নাই কিছু বুঝি নাই কিছু দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে—মলিন মর্ম মুছায়ে।' শুধু বরণ করা, শরণ চাওয়া—তাহলেই চরণ পাওয়া যায়, মোহের পর্দা খসে পড়ে, আর অমনি দেখতে পাওয়া যায় : আছ অনলে অনিলে চির নভোনীলে ভূধরে সলিলে গহনে....... এ-গানের কি তুলনা আছে? কান্তকবি এমন নিখুঁত গান বেশি রচনা করেননি বটে—সবশুদ্ধ দশ বারোটি হবে। কিন্তু এই কয়টি গানের সুর ভক্তপ্রাণ ভুলতে পারবে না—নানা পরীক্ষায়ই এদের উদাত্ত 'মন্ত্রবরে' ভরসা পাবে যে তিনি জীবনে দেখা না দিলেও মরণের পর পায়ে ঠাঁই দেবেনই দেবেন। তাই তাঁকে যে সত্যি চায় সে বঞ্চিত হ'তেই পারে না—গীতার ভাষায়—'নহি কল্যাণকৃত কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'—

কেন বঞ্চিত হবে চরণে?
আমি কত আশা করে বসে আছি পাব জীবনে না হয় মরণে।
আহা, তাই যদি নাহি হবে গো
পাতকি-তারণ-তরীতে তাপিত আতুরে না তুলে লবে গো,
হ'য়ে পথের ধূলায় অন্ধ এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ?
তবে পারে বসে 'পার করো' ব'লে পাপী কেন ডাকে দীনশরণে?

কী মধুর! প্রাণ জুড়িয়ে যায়। এরই তো নাম আকুল জিজ্ঞাসা, পরম আত্মনিবেদন, তাঁর করুণার অঙ্গীকার চোখের জলে। এ-গান কথা গেঁথে গেঁথে লেখা যায় না—অন্তর যখন আঁধারে তাঁর পায়ে মাথা ঠোকে পথ খুঁজে না পেয়ে—তখনই 'তিমির-দুয়ার খোলে', তিনি বলেন : প্রশ্নের উত্তর তো প্রশ্নেরই বেদনায় দিয়েছি আমি যখন তুমি বলছ :

আমি শুনেছি হে তৃষাহারী
তুমি এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত তৃষিত যে চাহে বারি।
তুমি আপনা হইতে হও আপনার,
যার কেহ নাই তুমি আছ তার—
একি সব মিছে কথা? ভাবিতে যে ব্যথা
বড় বাজে প্রভু মরমে!

'বাজে'—কেন না শূন্যবাদী কুতার্কিত সংশয় স্বভাব—আস্তিকের কানে কানে নানা কুযুক্তি দিয়ে তাকে নাস্তিক্যে দীক্ষা দিতে চেষ্টা করে। তাই সংশয় হয়ে দাঁড়ালো

আসুরিক বৃত্তির প্রধান অমাত্য। সে বলে মুচকি হেসে : কেন মিথ্যে নাস্তি-র কাছে হাতজোড় করছ ভাই? যা হবার নয় তা কি কখনো হয়? ভগবানের করুণা যদি থাকত তাহ'লে কি যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ এত দুঃখ পেত? তিনি যদি সত্যি 'তৃষাহারী' হ'তেন তাহ'লে কি কোটি কোটি অসহায় দুর্ভাগা অমৃততৃষ্ণা জপ ক'রে পেত বড় জোর এক আধ বিন্দু জল—যাতে তৃষ্ণা মেটে না? 'দীনশরণ' যদি থাকতেন তো এত নিঃস্বের কি বারবারই অনাহারে মরা হ'ত?......ইত্যাদি। কিন্তু অন্যদিকে অন্তরাত্মার মাঝে বন্দী দেবতা বলেন : 'তাঁর লীলা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির কাছে দুর্বোধ্য, কিন্তু তবু আমি জানি যে বিশ্বাসকে বরণ করলে আমার তৃষ্ণা তিনি মিটিয়ে দেবেনই দেবেন, শরণ চাইলে তিনি দীনশরণ হ'য়ে দীনের কাছে ধরা দেবেনই দেবেন।' (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাই বলেছিলেন হৃদয়কে 'ওরে হৃদয় যার কেউ নেই, সেই ভাগ্যবান, কারণ তিনি তারই।')

এই গানটির বরেণ্য প্রেরণায়ই একদা আমি আলো পেয়েছিলাম, তাই দেখতে পেয়েছিলাম যে আমি সুধা চাই তিনি সুধার ক্ষুধা হ'য়ে আমার অন্তরে নিজেকে জানান দিচ্ছেন ব'লেই। লিখেছিলাম গভীর আনন্দে যে তাঁর বাঁশি গায় সে :

যে অকূল পাথারে ঝাঁপ দেয় স্মরি' কাণ্ডারী
না জেনেও জানে সে আঁধারে 'সুধাও ক্ষুধার অভিসারী'।

তারপরে এই শাশ্বত সত্যটিকে আরো ফলিয়ে তুলতে চেয়ে আনন্দঝংকৃত বিরহবেদনার প্রশ্নের মধ্যে দিয়েই (কান্তকবির মতন) পেয়েছিলাম সেই পরম কারুণিক চিরসাথীর উহ্য সাড়ার আরো স্পষ্ট অঙ্গীকার :

তোমার পানে কি শুধু আমরাই ধাই পথহারা পান্থ,
চঞ্চল উদ্‌ভ্রান্ত?
তুমিও কি ভালোবাসো না?
নিতি বিচায়ে স্নিগ্ধ ছায়াখানি তব তুমিও কি কাছে আসো না—
যবে আমরা আতপ ক্লান্ত?
তুমি যদি উদাসীন,
তবে বাহুবন্ধনে বেঁধে করো কোন্ প্রেমলীলা প্রেমহীন—
ওগো নিঠুর যুগযুগান্ত?
কত অতৃপ্ত বাসনা,
কত সোনার-হরিণ-মরীচিকা, কত মরুবুকে তৃষাদাহনা
হয় পরশে তোমার শান্ত!
নদী যবে ধায় উছলি
তার বাজে নাকি বুকে যুগে যুগে তব সিন্ধুর নীলমুরলী,
ওগো সুন্দর, নীলকান্ত?
মিছে কাজে রেখে জড়ায়ে
কেন করো এ ছলনা বন্ধু, বলো না মায়ার খেলায় ভুলায়ে?
নয় বিরহ কি মিলনান্ত?

প্রাণের অধীর প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে গানে গভীর সাড়ার ইঙ্গিত দেওয়া—এ-ভঙ্গি ভক্তি-

সাধকদের কাব্যে প্রায়ই পাওয়া যায়। কান্তকবিরও নানা কবিতায় আছে। একটি গান বড় মর্মস্পর্শী, গাইতে গাইতে মন ভ'রে যায়, আভাস মেলে এক অপরূপ নিশ্চিন্তির, মনে হয়—প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ভরসার বান ডেকে গেল সংশয়মরুকে নিশ্চিহ্ন ক'রে। পরা ভক্তির এ একটি বড় মধুর আত্মপ্রকাশের ভঙ্গি। কান্তকবি যখন গাইতেন, তাঁর চোখে জল ভ'রে উঠত, কণ্ঠে বেজে উঠত এক গভীর স্পন্দন—পরম নৈশ্চিত্যের :

যদি মরমে লুকায়ে রবে, হৃদয় শুকায়ে যাবে
কেন প্রাণভরা আশা দিলে গো?
তব চরণশরণ তরে এত ব্যাকুলতা ভরে
কেন ঠাঁই যদি নাহি মিলে গো?
পাপী তাপী কেন সবে তোমারে ডাকিয়া কবে
মনোব্যথা তুমি না শুনিলে গো?
যদি মধুর সান্ত্বনাভরে তুমি না মুছাবে করে
কেন ভাসি নয়ন সলিলে গো?
সকল কি অর্থহীন! শূন্য, শূন্যে হবে লীন?
তবে কেন সে-গীতি সৃজিলে গো?
এতই আবেগ প্রভু, ব্যর্থ কি হইবে কভু
একান্ত ও চরণে সঁপিলে গো?
যদি পাতকী না পায় গতি, কেন, ত্রিভুবনপতি
পতিতপাবন নাম নিলে গো?

প্রতি যুগেই একটা না একটা স্রোত আসে যাকে বলা যায় নতুন। পুরাতনের মধ্যেকার নিত্যসুর এ নব-আগমনীর সুরে ঢাকা পড়ে না, কিন্তু নূতন ভঙ্গির অভ্যাগমে এক অভিনব স্বাদ মেলে দেশকালপাত্র ভেদে। একই ঋতু বার বার আসে বটে, কিন্তু তবু আসে প্রতিবারই নব নব ছন্দে। ভক্তিসাধনার নানা ঋতুর পর্যাবর্তন সম্বন্ধেও এই কথা। ভক্ত সব দেশেই আবহমানকাল চেয়ে এসেছেন ভগবানের সান্নিধ্যের আদরের সাড়া, কিন্তু তার ডাকের সুর নিজেকে জানান দিয়েছে প্রতি যুগেই এমন একটা নতুন মিড়ে যে-মিড় তার পূর্বসূরীদের ভক্তিকীর্তনে বাজে নি। বেদে একেই বলেছে ভগবানের একাধারে 'সনাতন পুনর্ণব' রূপ। তাঁর লীলা চিরপরিচিত অথবা নিত্যনূতন। হাফেজের একটি গজলে আছে (গজল উভধর্মী, মানবপ্রণয়ী ও দেবসুন্দর দুই বন্ধুকেই সম্ভাষণ করতেন পারসিক ভক্তেরা) :

তোমার কলকণ্ঠে গুণী, যেন শুনি নিতুই নব গান
ঢালো তোমার নিতুই নব রঙিন সুধা, উছল করো প্রাণ

ভক্ত ও ভগবানকে এই ভাবেই ডাকেন নিতুই নব রঙিন ভাবে তাঁর কাছ থেকেও নিতুই নব রঙের সাড়া পেতে। এ না হয়েই পারে না। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একবার লিখেছিলেন : 'উপনিষদেও এই কথাই আছে : যা এখানে—তাই সেখানে। মানুষ কি কোনদিনও নিত্যনব সৃষ্টির এই মহাব্রত অঙ্গীকার করতে পারত—যদি ভগবান্ নিজে সে ব্রত উদ্‌যাপনের ভার না নিতেন তাঁর করুণার ধূপ দীপ ফুল সুর রং রেখা ছন্দ

জুগিয়ে? কান্তকবির ভক্তিসঙ্গীতে তাই পদে পদেই পাই এ যুগের নানা স্বকীয় আত্মপ্রকাশের ভঙ্গিমা পুরাতনের মর্যাদা রেখেও নূতন সুরে তালে ছন্দে।

এর মধ্যে একটি সুর—কৃতজ্ঞতা। একটি গানে তিনি এমন প্রাণকাড়া সুরে গেয়েছেন কৃতজ্ঞতার অঙ্গীকার—যে অঙ্গীকার আমাদের আগের যুগের ভক্তদের গানে ফুটে ওঠে নি এমন নিটোল হ'য়ে। আমরা বার বার পাই কত কী, কিন্তু বার বারই পাওয়ার দাম না দিয়ে তার দানের অমর্যাদা করি। কিন্তু তিনি যে ক্ষমাসুন্দর, তাই বার বারই প্রতিহত হ'য়েও পিছু নিতে ছাড়েন না। ভাবরূপটি অনবদ্য। যতবারই কান্তকবির এ-গানটি গাই, মনে জেগে ওঠে ঠাকুরের অহেতুক করুণার কথা, মধুর লাবণ্যরসে নিষিক্ত হ'য়ে মনে কৃতজ্ঞতার সৌরভ ছেয়ে যায় :

আমি অকৃতী অধম ব'লে তো আমায় কম ক'রে কিছু দাও নি!
পরে যা দিয়েছ তার অযোগ্য ভাবিয়া কেড়েও তো কিছু নাও নি!
তব আশীষ-কুসুম ধরি নাই শিরে,
পায়ে দ'লে গেছি চাহি নাই ফিরে,
তবু দয়া ক'রে কেবলি দিয়েছ, প্রতিদান কিছু চাও নি।
আমি ছুটিয়া বেড়াই না জানি কী আশে,
সুধাপান ক'রে মরি যে পিয়াসে,
তবু যাহা চাই সকলি পেয়েছি তুমি তো কিছুই পাও নি।
আমারে রাখিতে চাও গো, বাঁধনে আঁটিয়া,
শতবার যাই বাঁধন কাটিয়া
ভাবি ছেড়ে গেছ, ফিরে চেয়ে দেখি—এক পাও ছেড়ে যাও নি।

এই কৃতজ্ঞতা কান্তকবির ভক্ত চরিত্রের একটি বাদী সুর ছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না। কত গানে ও কবিতাই যে তাঁর সরল (অথচ তেজস্বী) হৃদয়ের এই সজল অথচ সবল কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছে :

আমি তো তোমারে চাহি নি জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছ।
আমি না ডাকিতে হৃদয়মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ।
চির-আদরের বিনিময়ে সখা, চির-অবহেলা পেয়েছ
(আমি) দূরে ছুটে যেতে দুহাত পসারি' টেনে কোলে তুলে নিয়েছ।
'ওপথে যেও না, ফিরে এস' ব'লে কানে কানে কত কয়েছ!
(আমি) তবু চলে গেছি, ফিরায়ে আনিতে পারে পারে ছুটে গিয়েছ।
(এই) চির-অপরাধী পাতকীর বোঝা হাসিমুখে তুমি বয়েছ।
(আমার) নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে বুকে করে নিয়ে রয়েছ।

কী সুন্দর সরলতা! অথচ এ-সরলতা অজ্ঞান নয়, পূর্ব সচেতন। আমি না চেয়ে পেয়েছি— তার দাম দিই নি ব'লে অপরাধী হ'য়ে যেন আরো গভীর বেদনায় দাম দিতে শিখেছি তোমার অপার করুণার। মানুষ ঘা খেলে মান করে, রাগ করে, অনুযোগ করে। কান্তকবিও করবেন নিশ্চয়ই—কিন্তু প্রথমটায়, যখন তিনি সংসারী মানুষ।

তারপরই সচেতন হ'তেন সাধকের জাগৃতিতে—অমনি তাঁর ভক্তি এসে নামঞ্জুর ক'রে দিত সব খেদ ক্ষোভ অনুযোগ অভিযোগ, তিনি গেয়ে উঠতেন পরম অনুতাপে—গভীর অঙ্গীকারে :

ওমা, কোন্ ছেলে তোর আমার মতন কাটায় জীবন ছেলেবেলায়?
খেলায় বিভোর হ'য়ে কে আর পরশরতন হারায় হেলায়?
আমার মতন কে অবাধ্য?
যার সংশোধন মা তোর অসাধ্য—
তুই 'আয়' ব'লে যাস কোলে নিতে 'দূর হ' ব'লে ঠেলে পালায়!
তোর বুকের দুধ যে খেয়ে বাঁচি,
আমি কেমন ক'রে ভুলে আছি
আমি এমন তো ছিলাম না আগে (বড়) সরল ছিলাম ছেলেবেলায়।

এ-গানটির সঙ্গে আমার নিজের ভক্তিসাধনার নানাস্মৃতি জড়িত। তাই বলি—অবান্তর হবে না যখন।

ছেলেবেলায় কে না সরল থাকে? সংসারের নানা পাকে প'ড়ে নানা আশা পূর্ণ হবার আগে, নানা স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার আগে, বিশ্বাস করে বারবার প্রবঞ্চিত হয়ে দুঃখ পাওয়ার আগে, বিশেষ করে নিয়তির নানা অপ্রত্যাশিত নিষ্করুণতার চাপে দিশাহারা হ'য়ে খানিকটা 'সিনিক' মতন হ'য়ে দাঁড়াবার আগে মানুষ সরলই থাকে। কিন্তু তবু দেখা যায়—নানা মহৎ মানুষ বহু ঘা খেয়েও তাঁদের সরলতা হারান না। পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন এই জাতের মানুষ। (তাই হয়ত কান্তকবির সঙ্গে তাঁর গভীর স্নেহবন্ধন গ'ড়ে উঠেছিল, তিনি তাঁকে 'গুরুদেব' সম্বোধন করতেন ও ঐ একই কারণে—ভক্তির ক্ষেত্রে উভয়েই ছিলেন সমানধর্মী ব'লে)। 'শ্রীম'-কে দেখেছিলাম—তিনিও ছিলেন কী যে সরল! আরো কয়েকজনকে দেখেছি—যদিও বেশী নয়—যাঁরা মনে ধীর প্রবীণ হয়ে ওঠা সত্ত্বেও প্রাণে চির-নবীন ওরফে সরল ভক্তি বজায় রাখতে পেরেছেন। কিন্তু এঁদের মধ্যেও রজনীকান্ত ছিলেন দেখবার মত সরল। শ একবার আইনস্টাইনের অভ্যর্থনা সভায় বলেছিলেন : 'There are great men who are great among small men. There are great men who are great among great men, and that is the sort of man we are honouring tonight.' কান্তকবির এ-গানটি গাইতে গাইতে আমার মনে হ'ত বারবারই যে, কান্তকবি শুধু যে অভক্তদের মধ্যেই ভক্ত ব'লে চিহ্নিত হ'তে পারতেন তা নয়, ভক্তদের মধ্যেও বিশিষ্ট ভক্ত, সরলদের মধ্যেও বরেণ্য সরল ব'লে গণ্য হবার দাবি করতে পারতেন। হাসপাতালে ক্যান্সারে রুদ্ধবাক্ হ'য়ে ১৩১৭ সালে তিনি গভীর রাতে একটি গান লিখেছিলেন—উদ্ধৃত করি একবার ভাষ্যরূপে :

কত বন্ধু, কত মিত্র, হিতাকাঙ্ক্ষী কত শত
পাঠায়ে দিতেছ হরি মোর কুটীরে নিয়ত।
মোর দশা দেখি তারা
ফেলিয়াছে অশ্রুধারা

(তারা) যত মোরে বড় করে,   আমি তত হই নত।
(তারা) একান্ত তোমার পায়
এ জীবন ভিক্ষা চায়,
বলে : 'প্রভু ভালো করে দাও তীব্র গলক্ষত।'
শুনিয়া আমার হরি,
চক্ষু আসে জলে ভরি',
কত রূপে দয়া তব হেরিতেছি অবিরত!
তুমি জানো অন্তর্যামী,
কত যে মলিন আমি,
রাখো ভালো, মারো ভালো চরণে শরণাগত।

এ তো শুধু গান নয়—এ যে সাধনা, ভক্তিসাধনা, শরণাগতির মন্ত্রদীক্ষা! অনবদ্য ছন্দে ভগবানের স্তব লিখতে পারেন এমন কবি দেখা যায় (যদিও খুব বেশি নয়) কিন্তু সরলতা ও ভক্তি এ দুয়ের মণিকাঞ্চন যোগ না হ'লে তীব্র যন্ত্রণায়ও মন মুখ এক ক'রে এমন প্রার্থনার সুর বেজে উঠতে পারে না (বাণী) :

সম্পদের কোলে বসাইয়ে হরি সুখ দিয়ে কর এ-পরীক্ষে!
(আমি) সুখের মাঝে তোমায় ভুলে যাব, (অমনি) দুখ দিয়ে দাও শিক্ষে।

তাই মনে হ'ত আমার বারবারই তাঁর নানা ভক্তি-উচ্ছল গান গাইতে গাইতে যে, কান্তকবি শেষ পর্যন্ত ছিলেন সরল। পেশায় উকীল হলেও নেশা ছিল তাঁর গান যার শেষ লক্ষ্য ছিল সরল একমুখী ভক্তি। তাই সংসারে এসেও তিনি শেষ পর্যন্ত রয়ে গিয়েছিলেন অসংসারী, সমাজে থেকেও ভক্ত, সুখের কোলে মানুষ হ'য়েও চিরবৈরাগী। নইলে কি তিনি বাঁধতে পারতেন এমন ঐকান্তিক অমৃততৃষ্ণার গান :

কবে তৃষিত এ-মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল নন্দনে?
কবে তাপিত এ-চিত করিব শীতল তোমারি করুণা-চন্দনে?
কবে তোমাতে হয়ে যাব আমার আমি-হারা?
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা?
এ-দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ বিপুল পুলক-স্পন্দনে?
কবে ভবের সুখ দুখ চরণে দলিয়া
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না কাহারো আকুল ক্রন্দনে।

যত দিন যায় ততই তাঁর মন বৈরাগ্যকেই বরণ করে, কিন্তু সে নির্ভেজাল বৈরাগ্য—শুধু সংসারে বিতৃষ্ণা নয়—সেই সঙ্গে ঈশ্বরে অনুরাগ। (পরমহংসদেব বলতেন এরই নাম সত্যিকার বৈরাগ্য—ঈশ্বরে অনুরাগ না থাকলে সাময়িক বিতৃষ্ণার নাম দিতেন তিনি মর্কট বৈরাগ্য) তাই গেয়েছিলেন :

আমায় পাগল করবি কবে?
(কবে) মা মা বলতে অবিরত ধারে দুনয়নে ধারা ব'বে?

(আমার) পাগল মনের যত কথা মা তোরি সঙ্গে হবে
(আমার) প্রাণ রবে তোর চরণতলায় দেহ রবে ভবে।

কিন্তু বড় আধারের পরীক্ষাও বড়। ভাগবতে ভগবান বলিকে বলেছিলেন : যাকে আমি কৃপা করি তাকে আগে নিঃস্ব করি। নৈলে কি ভক্তরাজ রামপ্রসাদকেও অভিমান করতে হ'ত :

মায়ের এমনি বিচার বটে,
যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে, তার কপালেই বিপদ ঘটে!

কান্তকবি ছি[illegible] [illegible] ভক্ত তাই ঠাকুর তাঁকে এমন নিদারুণ পরীক্ষায় ফেললেন—যে-পরীক্ষায় পাশ করা চাট্টিখানি কথা নয়। অত্যধিক গান করার ফলে তাঁর কণ্ঠে হ'ল দারুণ ব্যাধি—কর্কটরোগ—ক্যান্সার। আমার পিতৃদেব তাঁকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন। দেখে এসে চোখের জল ফেলেছিলেন আজও মনে আছে। বলেছিলেন : 'ওরে! এ-ঘোর কলিতেও ভক্ত জন্মায় রে জন্মায়!— দেখে এলাম যা দেখবার ম'ত, যা কালে ভদ্রে চোখে পড়ে : ঐ দারুণ রোগ, কিন্তু মুখে কী নির্মল হাসি রে! কথা বলার শক্তি নেই, কিন্তু প্রণাম করল আমাকে তেমনই প্রসন্ন মুখে! করুণা যার কাছে সত্য নয় সে এ পারে না রে পারে না।'

এই ধরণের উচ্ছ্বাস সত্যিই করেছিলেন পিতৃদেব। বলেছি, কান্তকবি তাঁকে 'গুরুদেব' সম্বোধন করতেন। শিষ্যকে মৃত্যুশয্যায় দেখে এসে পিতৃদেব বলেছিলেন : 'এমন ভক্তের গুরু হওয়াও ভাগ্যের কথা রে!'

কে অস্বীকার করবে? যে গুণী অসহ্য যন্ত্রণায় নির্বাক হ'য়েও গান বাঁধে :

আমার সকল রকমে কাঙাল করেছ গর্ব করিতে চূর........
যত বাধা ছিল সরায়ে দয়াল করেছ দীন আতুর।

জীবনের পথচলার শোকে তাপে দুঃখে সুখে নানা ওঠাপড়ার মধ্যে ভক্তির সুর থেকে থেকে বেজে ওঠে অনেকেরই প্রাণে—কিন্তু ভক্তিকে সত্যি সাধনা হিসেবে নিতে পারে কজন? কজনের গানে জগন্মাতার ডাক বেজে ওঠে এমন প্রাণকাড়া সুরে :

কোলের ছেলে, ধুলো ঝেড়ে, টেনে নে কোলে,
ফেলিস নে মা, ধুলো কাদা মেখেছি ব'লে।
সারা দিনটা ক'রে খেলা, ফিরেছি মা সাঁঝের বেলা,
(তখন) মনে হ'ল মায়ের কথা নয়নের জলে।

এ-পারা সহজ পারা নয়। গড়পড়তা মানুষও ভগবানকে চায়। স্কটের অবিস্মরণীয় কবিতাটিকে একটু বদলে লেখা যায় :

Breathes there the man with soul so dead
Who never to himself hath said :
The Lord's my Home, my Native Land?

না, প্রতি হৃদয়েই ঠাকুর আছেন—তাঁকে হাজার চেপে রাখলেও তাঁর প্রেম অনির্বাণ স্ফুলিঙ্গের মত থেকে থেকে ঝিকমিকিয়ে ওঠেই ওঠে, মন না ডেকেই পারে না (কান্ত

কবির সুরে) : 'আমি জানি তুমি আমারি দেবতা, তাই আমি হৃদে বরি হে।' মানি। কিন্তু সাধারণত : এ-বরণ পূর্ণ বরণ নয়। কারণ সাধারণতঃ. মানুষ 'দেবতা'-কে চায় আর পাঁচটার সঙ্গে জুড়ে তবে। অর্থাৎ এ ও তা চাই, তার মধ্যে ভগবানও একটা এর নাম ভক্তিসাধনা নয়। ভক্তিকে বহুলালন করলে তবেই হৃদয়ের অতলে অনাদৃত প্রেমের স্ফুলিঙ্গ গনগনে আগুন হয়ে উঠে অহংকে পুড়িয়ে ফেলতে পারে, আর তখনই কেবল মানুষ বলতে পারে : 'আমি দেখি বা না দেখি বুঝি বা না বুঝি—সতত শিয়রে জাগো' (কান্তকবি—কল্যাণী)

ভগবানকে এই যে চাওয়ার ম'ত চাওয়া—আর পাঁচটার মধ্যে নয়, সব বজায় রেখে নয়, সব ছেড়ে, সব ছাপিয়ে—কিনা শুধু তাঁকে চাওয়া নয়—আর কিছুই না পাওয়া—এরই নাম ভক্তিসাধনা। এই সাধনাকেই বরণ করেছিলেন কান্তকবি—যে ভক্তির কথা বলেছিলেন নারায়ণকে সমুদ্রে-মজ্জমান প্রহ্লাদ (কান্তকবির আসন্ন-মৃত্যুলগ্নে বাঁধা গানের সঙ্গে এ-প্রার্থনার আদল আছে) :

ধর্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি।।

ধর্ম-অর্থ-কাম-সিদ্ধি-বর নাথ সে কি চায়?
মুক্তি চির-আজ্ঞাধীন তার
নিখিল বিশ্বের নিত্যনিধান তোমার পায়
বিরাজে অচলা ভক্তি যার?